শ্রীগোপাল বসুমল্লিক-

ফেলোশিপ-প্রবন্ধ

প্রথম খণ্ড।

(ব্রহ্মবিদ্যা)

মহামহোপাধ্যায় —

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-

প্রণীত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

৭৯।১ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর,

কলিকাতা।

১৩২৯ সন—চৈত্র

মূল্য ১।০

সূচীপত্র।

পত্রাঙ্ক

—:০:—

ভূমিকা

স্বর্গীয় শ্রীগোপাল বসু-মল্লিক মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের তত্বাবধানে যে,বেদান্ত-ফেলোশিপ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এবং এখনও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয় যাহার সংরক্ষণ কল্পে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন। অদ্য তাহার প্রথমবার্ষিক প্রবন্ধ সমূহ একত্রিত করিয়া প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ফেলোশিপের নিয়মানুসারে প্রথম বর্ষে যতগুলি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল,সমস্তগুলিই এই খণ্ডমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে; তবে ব্যয়সংকোচের প্রত্যাশায় কোন কোন প্রবন্ধের অংশবিশেষ যে, পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহা নহে; কিন্তু কোন প্রবন্ধই আমুলতঃ পরিত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হয় নাই; সুতরাং তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই খণ্ডটি প্রধানতঃ ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনাতেই পরিসমাপ্ত হই-য়াছে। এখানে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, হিন্দুর ছোট বড় যত কিছু ধর্ম্মানুশাসন বা ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রচলৎ আছে, ব্রহ্মবিদ্যাই সে সমুদয়ের একমাত্র লক্ষ্য। পৃথিবী যেমন সূর্য্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া তাহারই চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, তেমনই হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্র ও সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম সেই ব্রহ্মবিদ্যাকেই কেন্দ্রস্থান করিয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতেছে। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রনিচয় এই ব্রহ্মবিদ্যা পরিজ্ঞাপনের উদ্দে-

শ্যেই নানাভাবে ও নানাকারে বিবিধ বিজ্ঞেয় বিষয়ের অবতারণা করিয়াছে, এবং হিন্দুর ছোট বড় সমস্ত কর্ম্মপদ্ধতিও সেই একই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপে নানা ভাগে ও নানাপ্রকারে বিভক্ত হইয়া ভোগাসক্ত জীবকে ব্রহ্মবিদ্যার দিকে অগ্রসর করিতেছে।

শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া সাম্প্রদায়িক ভাবে যথেষ্ট বিরোধ ও বিসংবাদ বিদ্যমান থাকিলেও প্রধান লক্ষ্য ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে বিশেষ কোনও মতান্তর দেখা যায় না। প্রায় সকল সম্প্রদায়ই কোন না কোন রকমে ব্রহ্মবিদ্যার উৎকর্ষ ও উপাদেয়তা অঙ্গীকার করিয়াছেন। এবিষয়ে শাস্ত্রসম্মতি প্রদর্শনের জন্য বেদ, বেদবিভাগ, তাহার পরিচয়, উপনিষদ্ ও তাহার বিভাগাদি এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য শাস্ত্রকথাও যথাসম্ভব আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যাহা কিছু বলিবার আছে, সংক্ষেপতঃ তাহার সমস্তই ইহাতে বলা হইয়াছে। এখন সুধী পাঠকবর্গ ইহা দ্বারা কিঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিলেও পরিশ্রম সফল মনে করিব। অতঃপর দ্বিতীয় খণ্ডে হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। ইতি—

ভবানীপুর
ভাগবত-চতুষ্পাঠী, কলিকাতা।
২৮শে চৈত্র, ১৩২৯ সাল।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা

ফেলোশিপ প্রবন্ধ।

অবতরণিকা।

(ব্রহ্মবিদ্যা)

পরমমঙ্গলময় ভগবানের লীলানিকেতন অনন্তবৈচিত্র্যময় দৃশ্যমান বিশ্বচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চিন্তাশীল মানবমাত্রই যুগপৎ হর্ষ বিষাদ ও বিস্ময়ের সমবায়সম্ভূত এক অপূর্ব্ব রস আস্বাদন করিয়া থাকে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানব জগতের জটিল রহস্য-জাল ভেদ করিতে যতই উৎসুক হয়,—জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও পরিণতিবিষয়ক চিন্তায় যতই অগ্রসর হইতে থাকে, তাহার ক্ষুদ্রতর বুদ্ধিশক্তি যেন ততই আপনার অনুপযুক্ততা বুঝিতে পারিয়া বিস্ময়ের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত করিয়া তোলে। জগতে এরূপ সৌভাগ্যশালী লোক অতি বিরল বা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যিনি স্বীয় প্রজ্ঞালোকের সাহায্যে এই নিবিড় তমোরাশি নিরসনপূর্ব্বক জগচ্চিত্রের প্রকৃত তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি-গোচর করিতে সমর্থ হইয়াছেন, বরং এই বিশাল বিশ্বযন্ত্রের পরি-চালনাপ্রণালী বা কার্য্য-কারণভাব নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া প্রায়

সকলেই নিজ-নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানগরিমার ব্যামোহ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। বস্তুতই সৃষ্টিরহস্য এরূপ দুর্ভেদ্য অন্ধকারজালে সমাচ্ছন্ন যে, সাধারণ জ্ঞানালোক সে অন্ধকার অপনয়ন করিতে সমর্থ হয় না। এইকারণেই মার্জ্জিত-মতি মনীষিগণ সৃষ্টি ছাড়িয়া স্রষ্টার অনুসন্ধানে সমধিক যত্নপর হইয়াছেন।

জগতের স্রষ্টা যদিও দুর্ব্বিজ্ঞেয়, বাক্য মনের অগোচর হউন, তথাপি জগতে অহরহঃ যে সমস্ত ঘটনানিচয় জ্ঞানপথে পতিত হইয়া থাকে, তদ্দর্শনে স্বতঃই মনে হয় যে, এই জগৎ-চক্রটা যেন কোন এক অচিন্ত্যমহিমা মহাশক্তির প্রভাবে পরিচালিত হইতেছে; যেন তাঁহারই ঈঙ্গিতক্রমে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতনিচয় নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে এবং স্ব স্ব গন্তব্য পথে যথানিয়মে অগ্রসর হইতেছে। অথচ বিশ্ব-জীবের কেহই তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব ও মহিমা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছে না। তাই উপনিষদ্ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে,

"আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চন।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪।৩।১৪)

অর্থাৎ সকলেই তাঁহার লীলামাত্র দর্শন করিতেছে, কিন্তু কেহই তাঁহাকে—সেই লীলাময়কে দেখিতেছে না, বা দেখিবার জন্য যত্ন করিতেছে না। এইপ্রকার দুর্ব্বিজ্ঞেয়তা জ্ঞাপনাভি-প্রায়ে শ্রুতি নিজেই জনপ্রতিনিধি-স্বরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে,

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ,
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি,
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ?"
(কেনোপনিষদ্ ১।১)

মন, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় কোন্ মহাশক্তির প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া এবং কাহার শাসনে পরিচালিত হইয়া অবহিতভাবে নিজ নিজ কার্য্যাভিমুখে ধাবিত হইতেছে ? সেই মহাশক্তিটী কে ?

কেবল উপনিষদেই যে, পরমেশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন আছে, তাহা নহে ; বেদের সংহিতাভাগেও এতদনুরূপ বহু প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায়,—

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ, কুত আ বভূব
কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।" (ঋগ্‌বেদ সংহিতা ১।৩০।৬

তাঁহাকে (বিশ্বস্রষ্টাকে) যথাযথরূপে কে জানে, এবং কেই বা স্পষ্টকথায় প্রকাশ করিতে পারে। এই বিশ্বসৃষ্টি যে, কোথা হইতে কি প্রকারে সংঘটিত হইয়াছে, তাহাইবা কে বলিতে পারে ?

বস্তুতই কথাগুলি শাস্ত্রীয় হইলেও বড়ই প্রাণস্পর্শী এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কারণ, আমরা আজীবন মনের সাহায্যে

ভালমন্দ চিন্তা করিয়া থাকি, প্রাণের কৃপায় জীবন ধারণ করি, বাগিন্দ্রিয়ের সহায়তায় মনোগত ভাব অভিব্যক্ত করি, এবং চক্ষুদ্বারা রূপদর্শন ও শ্রোত্রদ্বারা শব্দগ্রহণ করিয়া থাকি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই মন প্রাণ চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি যে, কাহার বলে, কি প্রকারে, আমাদের ইচ্ছামাত্রে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহা তো আমরা কিছুই বুঝি না, বুঝিতেও পারি না। আমরা বুঝিবার জন্য যতই যত্নবান্ হই, মন যেন ততই কাতর হইয়া পড়ে এবং দর্পণগত ছবির ন্যায়, একটা অস্ফুট ভাবচ্ছায়া দেখিতে পায় মাত্র, কিন্তু ধরিতে সমর্থ হয় না। সেই কারণেই শ্রুতি নিজেও তাঁহার পরিচয় দিতে যাইয়া এইমাত্র বলিয়াছেন যে,

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যৎ,
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।"
"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ॥"
"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।" (কেনোপনিষদ্ ২,৩,৫)
"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥"
(তৈত্তিরীয় ২।৪।১)

এই কারণেই মহর্ষিগণ বিশ্বসৃষ্টির ভিতর দিয়া বিশ্বস্রষ্টার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অনন্ত রহস্যপূর্ণ দৃশ্যমান বিশ্বযন্ত্রই মানবহৃদয়ে সর্ব্বপ্রথম পরমেশ্বর-চিন্তা আনয়ন করিয়া

থাকে। এইজন্য মনীষিগণ সমস্ত জগৎটাকেই প্রকৃত শিক্ষাপ্রদ গুরু বা আচার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অবধূতের আখ্যায়িকা হইতে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ যদু মহারাজ একদা একজন অবধূত সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ভগবন্, আপনি যে, সর্ব্বপ্রকার আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সদানন্দরসে নিমগ্ন আছেন, এ শিক্ষা কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন? তদুত্তরে অবধূত সন্ন্যাসী নিজের শিক্ষাপ্রদ গুরুগণের নামোল্লেখপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—

"সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।
যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্ শৃণু॥
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্ গজঃ॥
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প ঊর্ণনাভঃ সুপেশকৃৎ॥
এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্ব্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ॥" (১)

[ভাগবত ১১।৭।৩২—৩৫]

---

(১) তাৎপর্য্য —পৃথিবী প্রভৃতি হইতে শিক্ষণীয় বিষয়—
পৃথিবী যেমন অচঞ্চলভাবে সর্ব্বপ্রকার উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও অপকারীকে ক্ষমা করে, এবং পৃথিবী-পরিণাম বৃক্ষ ও পর্ব্বত যেমন নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করে,

এখানে অবধূত সন্ন্যাসী পৃথিবী বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি চব্বিশটী মাত্র গুরুর উল্লেখ করিয়াছেন; প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিমানের পক্ষে সমস্ত জগৎটাই অল্লাধিক পরিমাণে শিক্ষাপ্রদ গুরুরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। অবশ্য, এরূপ গুরুকরণ কোনও নিয়মের অধীন নহে, কেবল নিজ নিজ বুদ্ধিশক্তির উপর সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।

উক্ত অবধূতের ন্যায় প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ লোকই প্রত্যেক

বুদ্ধিমান্ লোকও তেমনি পড়পীড়ন সহ্য করিয়াও ক্ষমা করিবেন, এবং নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করিবেন।

বায়ু যেমন ভালমন্দ সকল বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়াও সে সকলের দোষগুণে আসক্ত বা সংসৃষ্ট হয় না, তেমনি বিদ্বান্ পুরুষও ভালমন্দ সকলের সেবা করিয়াও সে সকলের দোষগুণে লিপ্ত হইবে না। পৃথিবী ও বায়ু হইতে এই দুইটী উপদেশ গ্রহণ করিবে।

এই প্রকার, আকাশ হইতে নির্লিপ্ত ভাব, জল হইতে স্বচ্ছশীতলতা ও তৃপ্তিদায়কতা, অগ্নি হইতে যথোপপন্ন-ভোজিতা ও নিষ্পাপভাব, চন্দ্র হইতে কলাক্ষয়ের দৃষ্টান্তে অনাত্ম দেহের ক্ষয়বৃদ্ধিজ্ঞান, রবি হইতে আত্মার একত্ব ও ঔপাধিক নানাত্ব, কপোত হইতে অতি স্নেহের দোষ, সর্প হইতে দীর্ঘকাল অনাহারেও জীবনধারণে সামর্থ্য, সমুদ্র হইতে গাম্ভীর্য্য ও অক্ষুব্ধভাব, পতঙ্গ হইতে অতি লোভের অপকারিতা, মধুকর হইতে সারগ্রাহিতা, মক্ষিকা হইতে সঞ্চয়বিমুখতা, গজ হইতে স্ত্রীসঙ্গের দূষণীয়তা, মধুসংগ্রাহক হইতে দান-ভোগহীন ধনের পরভোগ্যতা, হরিণ হইতে নৃত্যগীতাদি অনুরাগের অনিষ্টকারিতা, মৎস্য হইতে জিহ্বালৌল্যের অনিষ্টতা, পিঙ্গলা নাম্নী বারবনিতা হইতে নৈরাশ্যে সুখ ও বৈরাগ্য; বালক হইতে সদা প্রফুল্লতা, কুরর পক্ষী হইতে সঞ্চয়ীর বিপদ্; কুমারী হইতে বহুসঙ্গে কলহাদি দোষ, শরনির্ম্মাতা হইতে একাগ্রতা, সর্প হইতে গৃহ-নির্ম্মাণে আসক্তিদোষ, ঊর্ণনাভ হইতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সৃষ্টি সংহারসামর্থ্য, এবং কাচ পোকা হইতে লোকের চিন্তানুযায়ী গতি লাভ শিক্ষা করিতে হয়। প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ লোকেরই উক্ত পৃথিবী হইতে কাচপোকাপর্য্যন্ত সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষাপ্রদ গুরুস্থানীয়।

বস্তু হইতে কিছু না কিছু সারসংগ্রহ করিতে পারে, এবং আরও বুঝিতে পারে যে, দৃশ্যমান বিশ্বরাজ্যের পশ্চাতে এমনই একটা অসীম শক্তি বিদ্যমান আছে, যাঁহার ঈঙ্গিত মাত্রে এই বিশাল বিশ্বরাজ্য যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় নিত্য নিয়মিতভাবে পরিচালিত ও স্ব স্ব অধিকার-সংরক্ষণে সতত তৎপর রহিয়াছে। উপনিষৎ শাস্ত্র সেই মহাশক্তির মহিমা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" (তৈত্তিরীয় ২।৮।১)

অর্থাৎ ইঁহারই ভয়ে বায়ু সতত সঞ্চরণ করিতেছে; ইঁহারই ভয়ে সূর্য্য প্রত্যহ উদিত হইতেছে; ইঁহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও সর্ব্বসংহারক মৃত্যু স্ব স্ব কর্ত্তব্য-সম্পাদনে ধাবিত হইতেছে; এবং স্ব স্ব কর্ত্তব্য-সম্পাদন দ্বারা যেন পরমমঙ্গলময় সেই পরমেশ্বরেরই করুণা ভিক্ষা করিতেছে।

যিনি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান থাকিয়া বিশ্বজীবের জীবনাধান করিতেছেন, আবার কালরূপে ধ্বংস সাধন করিতেছেন, তাঁহার সেই বিশ্ববিমোহন স্বরূপ জানিবার জন্য এবং তাঁহার পবিত্র মহিমা হৃদয়ে ধারণ করিবার নিমিত্ত, সংযমপরায়ণ প্রশান্ত-হৃদয় পুরাতন ঋষিগণ যুগান্তব্যাপী কত কঠোর সাধনা করিতেন এবং চিরনির্ব্বাণ লাভের আশায় আপাত রমণীয় বিষয়ভোগ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাতেই মনঃ প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক তদুদ্দেশ্যে আপনার জীবন সমর্পণকেও পরমানন্দে

অভিনন্দিত করিতেন, এবং তাঁহার চিদানন্দঘন স্বরূপ ও মহিমা হৃদয়ে উপলব্ধি করতঃ চিরনির্ব্বাণময় পরম শান্তি লাভে কৃতার্থ হইতেন।

মনের যে, ব্রহ্মাভিমুখে ঐরূপ গতি বা ঐকান্তিক আগ্রহ, ইহা কোনও সমাজ বা দেশকালে সীমাবদ্ধ নহে। প্রকৃতপক্ষে নিখিল মানবাত্মাই যেন সেই একই দিকে একই উদ্দেশ্যে ব্যাকুলহৃদয়ে ছুটিয়া চলিতেছে।

খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদীর জলরাশি যেরূপ কঠিন পাষাণময় পর্ব্বতবক্ষঃ বিদারণপূর্ব্বক জীবনসর্ব্বস্ব সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, কাহারও দিকে দৃক্‌পাত করে না; তীরবর্ত্তী গ্রাম, নগর, বন বা উপবনের বিচিত্র শোভা ও মাধুরীদর্শনেও তাহার সে গতি প্রতিহত হয় না। প্রতিকূল পবনে প্রতিহত হইলে, সে যেমন বিশাল তরঙ্গ-বাহু প্রসারণপূর্ব্বক জয়োন্মত্ত সেনানীর ন্যায় দ্রুত-বেগে অগ্রসর হইতে থাকে, কিছুতেই আপনার লক্ষ্য পথ পরি-ত্যাগ করে না, তেমন মানবহৃদয়ও যেন চিরপরিচিত কোন এক হারানিধির অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়া নিয়ত তদভিমুখে ধাবিত হইতেছে; কোন বাধাই যেন তাহার সে গতির প্রতিরোধে সমর্থ হইতেছে না, এবং প্রবল সংশয়-সমীরের প্রতিকূলতাও তাহাকে ক্ষণকালের জন্যও লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারিতেছে না, বরং উজ্জ্বল সাধনালোকের সাহায্যে জাগতিক, জটিল রহস্যময় অন্ধকারজাল ভেদ করিয়া নিজের গন্তব্য পথটী সমধিক সুগম ও সুপ্রশস্ত করিয়া লইতেছে।

নদীর চরম লক্ষ্য—অনন্ত রত্নাকর জলনিধি, আর মানবাত্মার একমাত্র লক্ষ্য অনন্ত জ্ঞানানন্দনিধি সেই পরমেশ্বর। নদী যেরূপ প্রশান্ত জলধিমধ্যে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক নিজ নাম-রূপ বিসর্জ্জন দিয়া চিরনির্ব্বাণ লাভ করে, তেমনি প্রত্যেক মানবাত্মাও সেই অনাদি অনন্ত সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় আত্মসমর্পণপূর্ব্বক অজ্ঞান-জনিত কৃত্রিম নাম-রূপভেদ পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় শান্তিসুধা সেবন করে (বিমুক্ত হয়)।

উক্ত নদী যতদিন আপনার প্রিয় বস্তু সাগর সঙ্গ লাভে বঞ্চিত থাকে, তত দিনই তাহার ত্বরাগতি, তত দিনই তাহার পার্থক্য-পরিচয় এবং তত দিনই তাহার চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ, তেমনি মানবাত্মাও যতদিন প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর, সর্ব্বশান্তিময় সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত না হয়, তত দিনই তাহার ব্যাকুলতা, তত দিনই তাহার দুর্গতি ও দুর্নিবার অশান্তির জ্বালা ভোগ; একমাত্র সর্ব্বমঙ্গলময় পরমাত্মলাভেই তাহার বিশ্রান্তি ও শান্তিময় সুধারসাস্বাদে পরিতৃপ্তি হয়।

স্বয়ং উপনিষদ্‌ও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ,
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥" (মুণ্ডক ৩।২।৮)

ইহাই জগৎপ্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ সনাতন নিয়ম। এই

নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই বিশ্বমানব সেই চিদানন্দ-সুধাস্বাদের আশায় অহরহঃ ধাবিত হইতেছে; কিন্তু ঘনতিমিরাবৃত নিবিড় অরণ্যমধ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন নিজ নিবাসে যাইবার প্রকৃত পথ নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে, তেমনি মোহান্ধ মানবও আপনার একমাত্র লক্ষ্য শান্তিধাম সেই পরমাত্মাকে পাইবার প্রকৃত সাধনমার্গ নিরূপণে অসমর্থ হইয়া এই সংসারারণ্যমধ্যে চিরজীবন ঘুরিয়া বেড়ায় এবং 'অন্ধগোলাঙ্গূল'(*) ন্যায়ে সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই আপনার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় মনে করিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকে। কখনও অতুল ঐশ্বর্য্যে, কখনও স্বজনগণের স্নেহে ও ভক্তিপূর্ণ প্রিয় ব্যবহারে, কখনও বা আপাতমধুর অপরাপর প্রিয় পদার্থাভিমুখে ধাবিত

(*) অন্ধ-গোলাঙ্গূল-ন্যায়টী এই প্রকার- দস্যুগণ এক গৃহস্থের বাড়ী লুণ্ঠন করে। লুণ্ঠিত দ্রব্যের সঙ্গে কৌতূহল বশে এক অন্ধকেও তাহারা লইয়া যায়, এবং ঘোরতর অরণ্যমধ্যে তাহাকে রাখিয়া প্রস্থান করে। সেই অন্ধ অরণ্যমধ্যে যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই নিজের গন্তব্য স্থানে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করে। কিছুকাল পর, এক ধূর্ত্ত তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল 'তুমি আমার সঙ্গে এস; আমি তোমাকে এমন উপায় করিয়া দিব, যাহাতে তুমি অনায়াসে বাড়ী যাইতে পার।' অন্ধ তাহার কথায় বিশ্বস্ত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ঐ ধূর্ত্ত লোকটা সম্মুখে এক ভীমকায় বন্য বৃষকে শয়ান দেখিয়া অন্ধকে বলিল--'তুমি এই ষাঁড়ের লাঙ্গূলটী খুব শক্ত করিয়া ধর; কখনও ত্যাগ করিও না; ইহার সাহায্যেই তুমি বাড়ী যাইতে পারিবে।' অন্ধ তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া ষাঁড়ের ল্যাজ ধরিল। ল্যাজ ধরিবা মাত্র ষাঁড়টী ভয়ে ব্যাকুল হইয়া দৌড়িতে লাগিল। অন্ধও দৃঢ় বিশ্বাসে ল্যাজ ধরিয়া রহিল। বহুক্ষণ অশেষ ক্লেশ ভোগের পর অন্ধ অবসন্ন হইয়া ল্যাজ ত্যাগ করিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিল, তাহার আর গন্তব্য স্থলে যাওয়া হইল না।

হয়। দুঃখের বিষয় কোথাও আপনার অভিমত নিরাবিল আনন্দময় সুধাস্বাদে সমর্থ হয় না।

আপনার নাভিমধ্যগত কস্তুরীর মনোহর গন্ধে মুগ্ধ কস্তুরী-মৃগ যেরূপ তাহার আকরান্বেষণে ব্যাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, অথচ সে জানে না যে, যাহার জন্য তাহার এত ব্যাকুলতা, সেই গন্ধের আকর বাহিরে নাই, স্বশরীরেই বিদ্যমান রহিয়াছে; কেবল অজ্ঞানের বশে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বেড়াইতেছে। ইহার ফলে, সে অবশেষে অবসন্ন হইয়া নৈরাশ্যের তীব্র তাপ ভোগ করিয়া ক্লান্ত হইয়া থাকে।

সংসারাসক্ত জীবও ঠিক তেমনই আপনার অন্তরে অবস্থিত অন্তর্য্যামী আনন্দময় আত্মার আনন্দরসের আভাস মাত্র উপলব্ধি করিয়া, তাহারই মূলান্বেষণে—পরমানন্দের অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়া বিষয়সেবায় প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু সে স্বপ্নেও মনে করে না যে, সে যাহার অনুসন্ধান করিতেছে, যাহার জন্য এত ব্যাকুল হইতেছে, সেই হারানিধি আনন্দের আকর বাহিরে নাই, নিজের ভিতরেই বিদ্যমান আছে; কেবল অজ্ঞতাই তাহাকে পথিভ্রষ্ট করিয়া নিরানন্দ পার্থিব পদার্থের দিকে লইয়া যাইতেছে। অথচ আকাঙ্ক্ষিত শান্তিময় আনন্দ ভোগ তাহার ভাগ্যে কোথাও ঘটিতেছে না; অথবা কদাচিৎ ঘটিলেও কালচক্রের অমোঘ নিষ্পেশনে, ভোগশেষের পূর্ব্বেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে একটী গল্পের অবতারণা করা যাইতেছে; বোধ হয়, তাহা নিতান্ত অনুপযোগী হইবে না।

সাধুপ্রকৃতি এক রাজা এক দিন একটী সন্ন্যাসীকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এবং প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত সন্ন্যাসী যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া আহার সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভো, আহারে তৃপ্তি হইয়াছে ত?' তদুত্তরে সন্ন্যাসী বলিলেন, 'মহারাজ, তৃপ্তি দূরের কথা, এজীবনে আহার করিয়া কখনও এমন সন্তাপ ভোগ করি নাই।'

রাজা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কারণ?' সন্ন্যাসী বলিলেন, 'মহারাজ, প্রত্যেক খাদ্য দ্রব্যই অতি উত্তম, অতি মধুর হইয়াছিল। ইচ্ছা ছিল, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করি; কিন্তু একটী খাদ্যদ্রব্য অধিক ভোজন করিলে অপরাপর খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার শক্তি থাকিবে না, মনে করিয়া, আপনার সুচতুর পাচকগণ—একটির ভোজন শেষ করিবার পূর্ব্বেই সেইটি সরাইয়া লইয়াছে, এবং অপর একটি আনয়ন করিয়াছে; সুতরাং আমি বহুবিধ খাদ্য দ্রব্য ভোজন করিয়াও প্রকৃত তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। যেখানে ইচ্ছামত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করিতে পারা যায় না, সেখানে তৃপ্তি কোথায়? সন্ন্যাসীর কথায় রাজার চমক ভাঙ্গিল। তিনি বুঝিলেন—প্রত্যেক সংসারী লোকের অবস্থাইত এইরূপ। আমরা ভোগলোলুপ হইয়াও ইচ্ছামত ভোগ করিতে পারি কৈ? একটি প্রিয় বস্তুর ভোগ শেষ করিবার পূর্ব্বেই তাহা কালগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে সকলকেই অল্পাধিক পরিমাণে

কামনার অপূরণজনিত যাতনা ভোগ করিতে হয়; অথচ কেহই মনেকরে না যে, এই নশ্বর জড় জগতে সেই চিন্ময় সুধাস্বাদ কখনও সম্ভবে না। পক্ষান্তরে আনন্দের আকর সেই নিত্য সত্য চিন্ময়কে উপলব্ধি করাও এই সাধারণ চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত নহে। তাহাকে পাইতে হইলে, জানিতে হইলে, কঠোর সাধনার সহায়তা লইতে হয়। শ্রুতি বলিতেছেন—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ,
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ,
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥" (কঠোপনিষদ্ ২।১।১)

স্বয়ং ভগবান্ই জীবগণের ইন্দ্রিয়নিচয়কে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; তাই তাহারা বাহ্য পদার্থই দেখিয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী পরমাত্মাকে দেখিতে পায় না। তাহাকে দেখিতে হইলে সর্ব্বাদৌ ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে অন্তর্মুখী করিতে হয়। তজ্জন্য কঠোর তপস্যা এবং যথেষ্ট ধৈর্য্য ও প্রভূত সংযমের প্রয়োজন। যাহাদের হৃদয়ে তাদৃশ সাধনসামগ্রী প্রভূত পরিমাণে সংগৃহীত আছে, এবং অমৃতত্ব লাভের আশা নিতান্ত বলবতী, কেবল তাহারাই সেই আনন্দঘন আত্ম-দর্শনে সমর্থ হয়; কিন্তু সেরূপ লোক অতি বিরল। কারণ, তজ্জন্য ত্যাগী হওয়া আবশ্যক।

ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস গ্রহণের সময় নিজ

পত্নী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি * * * নবা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" ইত্যাদি।

'দেখ মৈত্রেয়ি, জগতে আত্মাই একমাত্র যথার্থ প্রিয়—পরম প্রেমাস্পদ। ক্ষুদ্র লৌহ খণ্ডের আঘাতে চকমকি পাথরে (আগ্নেয় প্রস্তরে) যেরূপ অগ্নিস্ফুরণ হয়, তেমনি বাহ্য পদার্থের সংযোগে আনন্দঘন আত্মা হইতেও আনন্দবিন্দু অভিব্যক্ত হয়; এই কারণে, অবোধ লোক বাহ্য পদার্থকেই আনন্দপ্রদ মনে করিয়া ভালবাসে এবং প্রিয় বলিয়া আদর করে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সকলেই আত্ম-প্রীতির জন্য ব্যাকুল। কোন পত্নীই পতির প্রীতির জন্য পতিকে ভাল বাসে না, পরন্তু আত্ম-প্রীতির জন্যই পতিকে ভালবাসে। ফলকথা, আত্ম-প্রীতির জন্যই একে অপরকে ভাল বাসে, কিন্তু কেহই অপরের প্রীতির জন্য অপরকে ভাল বাসে না। এইরূপ ধন, জন, পতি, পত্নী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই আত্মতৃপ্তির সহায়তা করে বলিয়াই প্রিয়, আত্মা কিন্তু সেরূপ প্রিয় নহে; আত্মা স্বতই প্রিয়; সুতরাং তাহাকেই কেবল পরম প্রিয় বা পরমপ্রেমাস্পদ বলিতে পারা যায়। এরূপ বিপর্য্যয়-সংঘটন যে, কেন হয়, মহামতি শিহ্লন মিশ্র তাহার অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন,—

"পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ।"

তাঁহার মতে সমস্ত জগৎটাই যেন মোহময় মদিরা পানে

উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে; উন্মত্তের কার্য্যে বিপর্য্যয়-সংঘটনই স্বাভাবিক; সুতরাং এ ক্ষেত্রে অনুযোগের যোগ্য কিছুই হইতে পারে না।

বিশ্বজননীন শ্রুতি মর্ত্ত্য মানবমণ্ডলীর এই অভাব—এই দুঃখ-দুর্দ্দশা দর্শনে কাতর হইয়াই যেন সন্তান-বৎসলা জননীর ন্যায় বিশ্বমানবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।" (বৃহদারণ্যক, ৪।৫।৬।)

হে মৈত্রেয়ি, যদি সাংসারিক দুঃখদুর্দ্দশার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, যদি অশান্তির বিনিময়ে শান্তিময় বিমল সুধাস্বাদে চিরসন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিতে চাও, তাহা হইলে পার্থিব পদার্থে মুগ্ধ হইও না, বিষয়ের চাক্‌চিক্যে ভুলিও না, কাঞ্চন ফেলিয়া কাচে আদর করিও না। অগ্রে আত্মা কি তাহা শ্রবণ কর; শ্রবণের পর বিচার করিয়া বুঝ; বুঝিয়া শুনিয়া—সংশয়-বিপর্য্যয়শূন্য হইয়া তদ্‌বিষয়ে নিদিধ্যাসন কর। আত্মার দর্শনে শ্রবণে মননে ও নিদিধ্যাসনেই এই বিশ্বরাজ্য তোমার করামলকবৎ বিজ্ঞাত হইবে। তখন দেখিবে যে, তোমার চিরবাঞ্ছিত চিদানন্দময় সুধাকর তোমার বাহিরে নাই; তোমার অন্তরেই হৃদয়াকাশে থাকিয়া অমৃত-ধারা সেচন করিতেছেন। জীব যত দিন এ তত্ত্ব জানিতে না পারে, প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি

করিতে সমর্থ না হয়, ততদিনই পরমাত্মরূপী চিন্ময় ব্রহ্ম তাহার "দূরাৎ স দূরে," দূরে—অতিদূরে থাকিবেই থাকিবে। আর যখন তীব্র বিবেকবৈরাগ্যাদি সাধন প্রভাবে চিরতিমিরাবৃত হৃদয়-কন্দর বিমল প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত হয়, তখন আবার "তদিহান্তিকে চ", সেই ব্রহ্মই তাহার নিকটে, অতি নিকটে—আত্মস্বরূপে প্রকাশিত হয়।

এই পরমপ্রিয় পরমাত্মার এবম্বিধ দূরত্ব দূর করিয়া—জীবের অব্রহ্মভাব অপনীত করিয়া ব্রহ্মভাব জাগরণ করিয়া দেওয়াই হিন্দুধর্ম্মের এবং তন্মূলীভূত বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য। সসাগরা ধরামণ্ডল যেরূপ সূর্য্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া তাহারই চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, হিন্দুর সমস্ত ধর্ম্ম এবং সমস্ত শাস্ত্রও তেমনই এই মহাসত্যকে কেন্দ্র করিয়া—স্থির লক্ষ্য রাখিয়া আপন আপন পথে চলিতেছে। হিন্দুধর্ম্মের এমন একটীও অনুষ্ঠান বা কার্য্য নাই, যাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা পরোক্ষভাবেও উক্ত মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা না করে, এবং এরূপ একটীও শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহার উপদেশে ব্রহ্মলাভের স্বল্পমাত্রও উপকার সাধিত হয় না। অধিক কি, ঐ যে যোগী পুরুষ ভীষণ শ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্য মধ্যে বা দুর্গম পর্ব্বতকন্দরে একাকী অনশনে বিবসনে বসিয়া আছেন, এবং বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ সংসারের লোভনীয় রমণীয়তা বিস্মৃতি-সাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া নিমীলিতনেত্রে ধ্যান-নিমগ্ন রহিয়াছেন; আর এই যে, পল্লীপ্রান্তস্থ জীর্ণ-কুটীরবাসিনী সরলা কুল-ললনাগণ মহোৎ-

দাহে ইষ্টু-পূজার শঙ্খধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেছেন, এই উভয়েরই উদ্দেশ্য বা চরম লক্ষ্য এক—সেই চিদানন্দ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, জীবের দুঃখবিমোচন ও অনাবিল আনন্দ লাভের জন্যই শ্রুতি আত্মদর্শনের উপদেশ দিয়াছেন; এবং আত্মদর্শনের উপায়রূপে শ্রব মনন ও নিদিধ্যাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন যে, কি উপায়েও কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে, আর্য্য ঋষিগণ তাহাও বলিয়া দিয়াছেন,—

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥"

বেদবাক্য হইতে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, দর্শন-শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে শ্রুতার্থের মনন এবং যোগশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি ক্রমে নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করিতে হইবে। এই ত্রিবিধ উপায়ে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এখানে দেখিতেছি—সাধনরাজ্যের মধ্যে বেদই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান; এবং বেদান্ত বা অপরাপর শাস্ত্রও এই বেদরূপ দৃঢ়ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত; এই জন্য সর্ব্বাদৌ বেদের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া, পরে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বেদবিদ্যা ও অধ্যাত্মশাস্ত্র যে ভাবে ও যে প্রকারে পঠিত ও আলোচিত হইতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে

সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এখন আমাদের দেশে বেদবিদ্যার উপর দিয়া যেন একটা প্রকাণ্ড বিপ্লবের বন্যা বহিতেছে। সভ্য-জগতের আদি আদর্শভূমি এই ভারতে, এরূপ বন্যা যে, কতবার উঠিয়াছে, কতবার বিলীন হইয়াছে, এবং অবশেষে বেদবিদ্যার প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার প্রভাবে শাণোল্লেখিত মণির ন্যায়, তাহারই নবোন্মেষিত বিমল প্রভায় দিগ্ দিগন্ত উদ্ভাসিত ও বিজয়বার্ত্তায় মুখরিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। উভয় নদীর সঙ্গমস্থলে যেরূপ প্রতিকূল স্রোতের প্রতিঘাতে প্রবল তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, এবং তাহার ফলে উভয় কূলই বন্যায় প্লাবিত হয়, ঠিক্ সেইরূপ বিভিন্ন মতাবলম্বী পৃথক্ পথগামী ও বিরুদ্ধ ভাবের উপাসক প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাব-সংঘর্ষে সংশয়-বাদের বিপুল তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া এই বিপ্লব-বন্যারই স্থষ্টি সূচনা করিতেছে। ভারতীয় ধর্ম্মমত ও দার্শনিক চিন্তার সহিত প্রতীচীর ধর্ম্মমত ও দার্শনিক চিন্তার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সম্বন্ধে এত অধিক পার্থক্য রহিয়াছে যে, দেখিলেই মনে হয়, যেন এ দুইটী ভাবরাজ্যের কস্মিন্ কালেও সম্মিলন-সাহচর্য্য সম্ভবপর হইতে পারে না; আর সম্মিলন ঘটিলেও একটীর মধ্যে অপরটীর অস্তিত্ব বিলীন হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। যেখানে দুইটী ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনগত সাম্য থাকে, সেখানে সামান্য প্রভেদ থাকিলেও কালক্রমে সম্মিলন সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু যেখানে পার্থক্যই প্রবল, সেখানে উভয়ের সম্মিলনে প্রধানতঃ একটা বিপ্লববাদেরই আবির্ভাব হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান শিক্ষার সঙ্গেসঙ্গে এদেশেও ঐরূপ সংশয়বাদ কিয়ৎপরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এমত অবস্থায় আমাদের আর্য্যধর্ম্মের দৃঢ়ভিত্তি প্রাচীন সম্পত্তি বেদকেও নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নূতন ধরণে ব্যাখ্যা করা অনেকের অভিমত হইলেও, আমি আমাদিগের সনাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না।

এদেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণ সংস্কৃত গ্রন্থগুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। (১) কান্তাসম্মিত, (২) সুহৃৎসম্মিত, (৩) প্রভুসম্মিত। তন্মধ্যে চিত্তবিনোদনপ্রধান কাব্যশাস্ত্র—কান্তাসম্মিত; কেন না, কাব্যশাস্ত্রগুলি যুক্তিতর্কের বড় একটা ধার ধারে না; শিশির-শোভা যেমন সৌর করস্পর্শে বিলীন হইয়া যায়, কাব্য-রসও তেমনি তর্কের কঠোর তাপস্পর্শে শুষ্ক হইয়া যায়। যুক্তিতর্কপ্রধান দর্শনাদি শাস্ত্র—সুহৃৎসম্মিত; উহারা হিতকারী বন্ধুর ন্যায় যুক্তিতর্কের সাহায্যে, অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক বক্তব্য বিষয় উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেয়। স্বতঃ প্রমাণ বেদশাস্ত্রগুলি প্রভুসম্মিত; প্রভুর আদেশ যেরূপ বিনা বিচারে শিরোধার্য্য এবং অবশ্যপালনীয়, বেদের আদেশ বা বিধিও ঠিক সেইরূপই বিনা তর্কে গ্রহণীয় এবং যথাযথভাবে অনুষ্ঠেয়; পক্ষান্তরে প্রভুর আদেশ অমান্য করিলে যেমন অপরাধী হইতে হয়, বেদের বিধান লঙ্ঘন করিলেও সেইরূপই প্রত্যবায়ী হইতে হয়। বেদ যাহা বলেন, তাহাই সত্য; সুতরাং সে বিষয়ে আর সংশয় বা বিচারের প্রয়োজন হয় না। ইহাই হিন্দুর চিরন্তন ধারণা, এবং সমস্ত হিন্দু শাস্ত্রের অবিসংবাদিত উপদেশ।

বেদ ও ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদের কথা বলিতে হইলে, প্রথমেই নিম্নলিখিত বিষয় গুলির আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক হয়, (১) বেদ কাহাকে বলে, (২) বেদ নিত্য কি অনিত্য, (৩) অক্ষরাত্মক বেদের নিত্যতা কিরূপে সম্ভবে ? (৪) বেদ অনিত্য হইলে তাহার কর্ত্তা কে ? (৫) বেদ কত দিনের ? (৬) বেদ নিত্য হইলে পরভবিক ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতির নামোল্লেখ বেদে থাকা সম্ভব হয় কি প্রকারে ? (৭) এবং বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয় কেন ? ইহার মধ্যে বেদ কাহাকে বলে, সে কথা পরে বলা হইবে। প্রথমে বেদ নিত্য কি অনিত্য, এই প্রশ্নের আলোচনা করা যাউক।

বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ বড় দেখা যায় না; অনেকেই বেদের নিত্যতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; তবে প্রকারগত ভেদ আছে। তন্মধ্যে মীমাংসাদর্শন-প্রণেতা জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন—বেদ নিত্যসিদ্ধ; উহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের উর্ব্বর মস্তিষ্কের উৎকট কল্পনার প্রকৃষ্ট পরিণতি নহে; উহা নিত্যসিদ্ধ। যাহা ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাপ্রসূত হয়, ইতিহাস বা জনশ্রুতিই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে, কিন্তু, ইতিহাসের ক্ষীণ আলোক এ নিবিড় অন্ধকার অপনয়নে অসমর্থ; কিংবদন্তীর আর কথা কি ? যাহার উৎপত্তি ও কর্ত্তার কথা স্মৃতিপথেও পতিত হয় না, কোন্ যুক্তিতে তাহাকে অনিত্য বা

পুরুষকল্পিত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিব ? অবিচ্ছিন্ন গুরুশিষ্যপরম্পরা-ক্রমে বেদবিদ্যা জগতে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং তাহার রক্ষণাবেক্ষণেরও অভাব ঘটে নাই, অথবা সম্প্রদায়-বিচ্ছেদেও বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হয় নাই।

কথিত আছে যে, বেদবিদ্যা প্রথমে মুখে মুখেই থাকিত, এবং গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে শ্রুত ও প্রচারিত হইত; এই কারণে বেদের অপর একটী নাম 'শ্রুতি'। মহামতি বাচস্পতি মিশ্র শ্রুতি-শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

"শ্রূয়তে এব পরং ন কেনচিৎ ক্রিয়তে" ইতি।

অর্থাৎ যাহা কেবল লোকপরম্পরাক্রমে শ্রুত হইয়াই আসি-তেছে, অথচ কেহ কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ নাই, তাহার নাম শ্রুতি। অতি পুরাকালে লোকে বিস্মৃতি কাহাকে বলে, জানিত না; কিন্তু কালক্রমে পাঠকবর্গের মধ্যে বিস্মৃতির অভ্যুদয় হইল; এবং ক্রমশঃ তাহা ঘনীভূত হইতে লাগিল; লোকে ছয় মাসের মধ্যেই ভুলিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় বিধাতা পুরুষ লেখ্য বর্ণমালা সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহার সাহায্যে বেদবিদ্যাকে পত্রারূঢ় করিলেন। ইহা স্বয়ং বৃহস্পতির উক্তি। তিনি বলিয়াছেন—

যাণ্মাসিকেঽপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে নৃণাম্।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা।" (হরিবংশ)

হয়ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ইনি কোন বৃহস্পতি ? এবং সেই অক্ষরগুলিই বা কোন্‌জাতীয়—

বাঙ্গলা, দেবনাগর বা চীনা ইত্যাদি। আমার পক্ষে কিন্তু ইহার উত্তর দেওয়া অতি সহজ, কেবল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করা মাত্র।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, বেদ যখন অক্ষরাত্মক শব্দসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং অক্ষরমাত্রই যখন উৎপত্তি-ধ্বংসশীল অনিত্য, জলতরঙ্গের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, আবার পরক্ষণেই কোথায় বিলীন হইয়া যায়; এবং উচ্চারণের তারতম্যানুসারে প্রত্যেক বর্ণই বিভিন্নাকারে পরিণত হয়; তখন অনিত্য অক্ষরাত্মক বেদের নিত্যতা সম্ভব হয় কি প্রকারে? তদুত্তরে পাণিনির পক্ষাবলম্বিগণ বলেন, শব্দ দুই প্রকার; এক স্থূল বর্ণময়, অপর সূক্ষ্ম বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটাত্মক। স্থূলশব্দ অনিত্য, সাবয়ব ও শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আর সূক্ষ্ম স্ফোট শব্দ নিত্য, নিরবয়ব ও বর্ণাভিব্যঙ্গ্য।

প্রাণিগণের সূক্ষ্মশরীর যেরূপ স্থূল শরীরের মধ্যে থাকিয়া কাজ করে, সূক্ষ্ম স্ফোটাত্মক শব্দও তেমনি বর্ণময় স্থূল শব্দের ভিতর দিয়া অর্থ প্রতীতি জন্মায়। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগ-বিয়োগে বর্ণাত্মক শব্দের উৎপত্তি, বিনাশ কিংবা বিকৃতি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু স্ফোট শব্দের সেরূপ কিছুই সংঘটিত হয় না; উহা নিত্য নিরবয়ব; চিরকাল আছে এবং অনন্তকাল থাকিবে। বর্ণময় শব্দ দ্বারা ইহা স্ফুটিত অর্থাৎ অভিব্যক্ত হয়, এবং অভিমত অর্থকেও স্ফুটিত করে; এই জন্য ইহার নাম স্ফোট। প্রত্যেক স্থূল দেহের যেমন অতিরিক্ত এক একটী সূক্ষ্ম দেহ থাকে,

তেমনি প্রত্যেক স্থূল শব্দেরই এক একটী অতিরিক্ত স্ফোট শব্দ আছে।

'স্ফোট' এই নামকরণ হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত স্ফোট শব্দ হইতেই অর্থ-প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রোত্রগ্রাহ্য স্থূল শব্দ হইতে হয় না, হইতেও পারে না। কৈয়ট বলিয়াছেন,

"বৈয়াকরণা বর্ণব্যতিরিক্তস্য পদস্য বাচকত্বমিচ্ছন্তি। বর্ণানাং বাচকত্বে দ্বিতীয়াদিবর্ণোচ্চারণানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ" ইতি।

কথাটার একটুকু ব্যাখ্যা না করিলে বোধ হয় ঠিক বুঝা যাইবে না। শব্দের উচ্চারণমাত্রেই যে, অর্থ-প্রতীতি হইয়া থাকে, বর্ণময় শব্দ তাহার কারণ নহে। বর্ণমাত্রই উৎপন্ন-প্রধ্বংসী, এবং বিভিন্নকালবর্ত্তী। এমন কোনও দুইটী বর্ণ নাই, যাহারা একই সময়ে একসঙ্গে উচ্চারিত হইতে পারে। মনে করুন, র্+আ+ম্+অ, এই চারিটী বর্ণের সমবায়ে 'রাম' শব্দ নিষ্পন্ন হয়; অথচ 'র্' উচ্চারণ কালে পরবর্ত্তী অক্ষর তিনটী অনাগতাবস্থায় ভবিষ্যতের গর্ভে নিদ্রিত থাকে; এইরূপ 'আ' উচ্চারণের সময়ও প্রথমোচ্চারিত 'র্' অক্ষরটী অতীতের আশ্রয় লইয়াছে, এবং 'ম্' ও 'অ' অক্ষর দুইটি তখনও অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিতেছে; সুতরাং উহাদের একত্রীকরণ একান্তই অসম্ভব; অথচ একত্রীকরণ না হইলে 'রাম' পদ-নিষ্পত্তি ও তদর্থ প্রতীতির আশা সুদূরপরাহত; কাজেই বলিতে হইবে

যে, অক্ষরাত্মক 'রাম' পদের দ্বারা অর্থ-প্রত্যায়ন করা, আর বন্ধ্যাপুত্রের দ্বারা রাজ্য শাসন করা, তুল্য কথা। তাহার পর 'রাম' শব্দের অন্তর্গত, যে কোন একটীমাত্র বর্ণ হইতেও অর্থপ্রতীতির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; তাহা হইলে "রাজ" বা "ময়" বলিলেও 'রাম' অর্থ বুঝাইতে পারে; কারণ, রাজ-শব্দে 'ম' না থাকিলেও 'র্+আ' রহিয়াছে, এবং ময় শব্দে 'র+আ' না থাকিলেও 'ম্' ও 'অ' বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং উহারা যে, 'রাম' শব্দের অর্দ্ধাংশের মালিক, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ 'নদা' 'দীন', 'মাস' 'সাম', 'কপি' 'পিক' ইত্যাদি শব্দে বিপরীত ক্রমে সমস্ত বর্ণই বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং উহারাও একার্থ প্রতিপাদনে সমর্থ হইতে পারে! বোধ হয়, তাহা কেহই স্বীকার করিতে সম্মত হইবে না। এই সমস্ত অনুপপত্তিনিবন্ধন শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বর্ণের অতিরিক্ত অখণ্ড নিরবয়ব স্ফোট শব্দ স্বীকার করা আবশ্যক হয়।

বর্ণের যেমন স্ফোট আছে, তেমনি পদের এবং বাক্যেরও স্ফোট আছে। সেই সেই স্ফোট শব্দ হইতেই আমরা অভিমত অর্থ বিশেষ বুঝিয়া থাকি। তাহারা আরও বলেন—

"নাদৈরাহিতবীজায়াম্ অন্ত্যেন ধ্বনিনা সহ
আবৃত্তি-পরিপাকায়াং বুদ্ধৌ শব্দোঽবধার্য্যতে।"

স্ফোটের অভিব্যঞ্জক যতগুলি বর্ণ থাকে, সেগুলির ক্রমিক উচ্চারণে অভিব্যঙ্গ্য 'স্ফোট' শব্দটী ক্রমশঃ পরিস্ফুটতা লাভ

করিয়া পরিশেষে অর্থ-প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে ; এই কারণেই বর্ণ, পদ ও বাক্যেতে লোকের অর্থ বোধকতা ভ্রম উপস্থিত হয়।

এ কথায় আপত্তি হইতে পারে যে, স্ফোট-শব্দময় বেদ যদি ঈশ্বরের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ নিত্যবস্তুই হয়, তাহা হইলে বেদের মধ্যে পরভবিক ইন্দ্রাদির নাম ও নানাবিধ আখ্যায়িকা স্থান পাইল কিরূপে ? এ আপত্তির সমাধান দুই প্রকারে হইতে পারে।

প্রথমতঃ সুদূর ভবিষ্যতে যে সমস্ত ঘটনাবলী অবশ্য সংঘটিত হইবে, 'অনাগতাবেক্ষণ' ন্যায়ে নিত্যসত্য বেদ ভবিষ্যদ্‌গর্ভগত সেই সমস্ত বিষয় বর্ত্তমানের ন্যায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে সেই সমুদয় ঘটনাবলী লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া বেদের সত্যতাকে আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বাস্তবিকপক্ষে তৎকালে ইন্দ্র-চন্দ্রাদি ব্যক্তি বিদ্যমান না থাকিলেও, প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি লোকের সুখবোধ্য করিবার জন্য শ্রুতি নিজেই ঐ সমস্ত নাম ও ঘটনাবলী কল্পনা করিয়া সন্নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এখন যেমন রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া লোকে তদনুসারে আপনার বালক বালিকার 'রাম' 'লক্ষ্মণ' প্রভৃতি নামকরণ করিয়া থাকে, তেমনি পরবর্ত্তী লোকেরাও বেদ-পাঠে ইন্দ্র, চন্দ্রাদি নাম অবগত হইয়া তদনুসারে বালক-বালিকাগণের ঐরূপ নামকরণ করিয়া গিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্করস্বামী শ্রুতিব্যাখ্যা প্রসঙ্গে "আখ্যায়িকা তু

আচারার্থা বিদ্যাস্তত্যর্থ: চ” ইত্যাদি কথা দ্বারা ঐ সকল বৈদিক আখ্যায়িকার তাৎকালিক অসত্যতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। মনে হয়, ইহার মধ্যে শেষোক্ত মতটীই সমীচীন। স্বয়ং আচার্য্যও বেদান্ত-দর্শনের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদে “শব্দ ইতি চেৎ, নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্” সূত্রের ব্যাখ্যায়—

“সর্ব্বেষাং চ স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে।
নাম রূপঞ্চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ॥
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবৈভ্যো দদাত্যজঃ॥”

ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, বিধাতা প্রথমে বৈদিক শব্দ হইতেই পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ করিয়াছিলেন। অধিক কি, অগ্রে স্বজ্যমান পদার্থের নামোল্লেখ, পরে সেই পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাও তিনি “স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভূমিমসৃজত,” “এতে ইতি বৈ প্রজাপতিঃ দেবান্ অসৃজত, অসৃগ্রম্ ইতি মনুষ্যান্” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সাহায্যেও ঐ কথা প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, ব্রহ্ম জগতের মূল কারণ হইলেও প্রলয়ানন্তর যখন সৃষ্টি কার্য্য আরব্ধ হয়, তখনকার সৃষ্টি নিশ্চয়ই শব্দপূর্ব্বক, অর্থাৎ অগ্রে বস্তু-বোধক নাম-স্মরণ, পরে তদনুরূপ বস্তু নির্ম্মাণ হয়। ইহা লোকব্যবহারেরও বিরোধী নহে,

বরং সম্পূর্ণ অনুরূপ। বর্ত্তমান সময়েও কেহ কোন জিনিষ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই মনে মনে সেই বস্তুর একটা নাম ও আকৃতি মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া লয়, পরে তদনুরূপ বস্তু নির্ম্মাণ করিতে থাকে। অতএব বেদোক্ত নাম ও ঘটনাবলীর তদানীন্তন সত্তা না থাকিলেও, বেদের নিত্যতাপক্ষে কোনও দোষ বা অসঙ্গতি হইতেছে না।

কপিল, কণাদ, গোতম ও বেদব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে একমত হইয়াও স্ফোটবাদের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, স্ফোটবাদে কেবল কল্পনা-কৌশলের পরিচয় প্রদর্শন মাত্র হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে উহার কোন আবশ্যক দেখিতে পাওয়া যায় না; কারণ, স্ফোটবাদ স্বীকার না করিলেও বেদের নিত্যতাসম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত ঘটে না; অধিকন্তু অননুভবগোচর স্ফোট শব্দ কল্পনা সর্ব্বথা নিরর্থক ও অনুপযোগী। শব্দাবয়ব বর্ণসমষ্টির একত্রীকরণ অসম্ভব হইলেও অর্থপ্রতীতির কোন ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না; কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের উচ্চারণের পর বর্ণগুলি বিধ্বস্ত হইলেও, উহাদের এক একটা সংস্কার থাকিয়া যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের উচ্চারণে হৃদয়মধ্যে যে সংস্কার জন্মে, সেই সংস্কারের সহযোগে অন্তিম বর্ণই অর্থ-প্রতীতি জন্মাইতে পারে; সুতরাং স্ফোটবাদ স্বীকারে কেবল কল্পনা-শরীরের গৌরব বৃদ্ধি করা ভিন্ন আর কোনও ফল দেখা যায় না। ইহাদের মতে, বেদ স্বতঃসিদ্ধ নিত্য নহে, পরন্তু ঈশ্বর-প্রণীত, কিন্তু প্রবাহ-নিত্য। অভিপ্রায় এই যে,

"অস্য বা মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ—যদৃ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ।"

ইত্যাদি শ্রুতিই যখন বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তখন তাহাকে ঈশ্বরের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ বলা যাইতে পারে না। প্রত্যেক সৃষ্টিতেই পরমেশ্বর একই প্রকার বেদ প্রচার করিয়া থাকেন; এজন্য উহাকে নিত্য বলিয়া ধরা হয়।

বর্ণের উৎপত্তি-প্রণালী।

বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানা যায় যে, আঘাতই বর্ণোৎপত্তির প্রধান কারণ; সেই আঘাতের পার্থক্যানুসারে শব্দের প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ দৈহিক কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু জঠরাগ্নি দ্বারা প্রতিহত হইয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে ধাবিত হয়। সেই বায়ুরই বহির্গমনের অন্যতম ফল হইতেছে—বর্ণাভিব্যক্তি। সেই বায়ু, যখন যে স্থান স্পর্শ করিয়া নির্গত হয়, তখন তদনুরূপ বর্ণের অভিব্যক্তি করে; এবং জিহ্বার সাহায্যে সেই সমুদয় বর্ণের মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য উৎপাদন করিয়া আবশ্যকীয় ব্যবহারক্ষম শব্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলেন—কদম্ব-কুসুম যেরূপ প্রথমেই চতুর্দ্দিকে কেশররাজিতে পরিবেষ্টিত হইয়া উৎপন্ন হয়, শব্দও ঠিক্ সেইরূপ উৎপত্তিসময়েই সর্ব্বতোমুখ হইয়া উৎপন্ন হয়; ক্রমে সেই শব্দরাশিই দীর্ঘ দীর্ঘতর ও দীর্ঘতম হইয়া শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে।

তখনই লোকের হৃদয়ে শব্দসম্বন্ধে প্রতীতি হইয়া থাকে। কিন্তু নবীন পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে এ কথার অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন—

নদীতে ঢিল নিক্ষেপ করিলে, সেই জলের মধ্যে যেরূপ তরঙ্গ উপস্থিত হয়; এবং সেই তরঙ্গই কিয়দ্দূর গমনের পর অপর তরঙ্গ সমুৎপাদন করত আপনি বিলীন হইয়া যায়; এই দ্বিতীয় তরঙ্গটীও আবার অপর তরঙ্গ সমুৎপাদন করত বিলীন হইয়া যায়। এইরূপ বহুতর তরঙ্গের উৎপত্তি ও ধ্বংসের পর অন্তিম তরঙ্গটী তীরভূমি স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়; ঠিক সেইরূপ কোন প্রকার আঘাতের ফলে আকাশমণ্ডলে প্রথমে একটী শব্দ-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়; সেই শব্দই বায়ুর উপর ভর করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই আবার আকাশে বিলীন হইয়া যায়; সে বিলীন হইবার পূর্ব্বেই অপর শব্দ সৃষ্টি করিয়া রাখে; সেই শব্দটীও আবার অপর শব্দ সৃষ্টি করিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যায়; এইরূপে অসংখ্য শব্দের উৎপত্তি ও ধ্বংসের পর শেষ শব্দটী যাইয়া শ্রোতার কর্ণপটহে প্রতিহত হয়; তখনই শ্রোতার শব্দ-জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

উভয় মতের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত মতে প্রথমোৎপন্ন শব্দই ক্রমশঃ দীর্ঘতা প্রাপ্ত হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ে উপস্থিত হয়; কিন্তু শেষোক্ত মতে তাহা হয় না; এমতে প্রথমোৎপন্ন শব্দের সহিত শ্রোতৃবর্গের সম্বন্ধ ঘটে না; সম্বন্ধ ঘটে পরভবিক কোন একটী শব্দের সঙ্গে।

এখানে একথাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ভারতীয় প্রাচীন ও নবীন সকল দার্শনিকের মতেই শব্দের এক-মাত্র উপাদান আকাশ; বায়ু কেবল আকাশোৎপন্ন সেই শব্দকে বহন করিয়া লইয়া যায় মাত্র; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শব্দ জন্মায় না। অতঃপর বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কারণ, বেদের প্রামাণ্য অপৌরুষেয়তাবাদের উপরেই সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং যতক্ষণ বেদের অপৌরুষেয়তা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ উহার প্রামাণ্য সম্বন্ধেও সন্দেহ দূর হয় না। এই কারণে বেদ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে কিংবা বেদপ্রামাণ্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইলে, অগ্রে উহার অপৌরুষেয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করা একান্ত- আবশ্যক হইয়া পড়ে; শিষ্ট ব্যবহারও এইরূপই। ।১৭।৪৪

বেদের অপৌরুষেয়তা।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, বেদ পৌরুষেয়ই হউক, আর অপৌরুষেয়ই হউক, তাহা লইয়া বিচার বিতর্কের প্রয়োজন কি? বেদ যদি প্রমাণসিদ্ধ সত্যার্থ-প্রকাশক হয়, তবে বিনা বাক্যব্যয়ে সকলেই উহার আদর করিবে, প্রামাণ্য স্বীকার করিবে, এবং বেদোপদিষ্ট পথে চলিতেও দ্বিধা বোধ করিবে না। আর বেদ যদি কেবলই কতকগুলি অপ্রামাণিক অসত্যার্থ প্রচার করে এবং অলীক অযথার্থ বিষয়ে লোককে প্রলুব্ধ করে, তাহা হইলে শত লোভনীয় ফলের উল্লেখ থাকিলেও কোন মনস্বী লোকই সে

কথায় কর্ণপাত করিবে না; সুতরাং ঐরূপ অসার আলোচনায় সময়ক্ষেপ করা সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও নিষ্ফল। এতদুত্তরে আচার্য্যগণ বলেন যে, না এ আলোচনা অনুপযোগী বা কাকদন্ত-পরীক্ষার ন্যায় নিষ্প্রয়োজন নহে; ইহার আলোচনায় যথেষ্ট প্রয়োজন ও উপযোগিতা আছে।—

বেদ যদি পৌরুষেয়—ব্যক্তিবিশেষের প্রযত্ন-প্রসূত হয়, তাহা হইলে, উহার প্রামাণ্য সম্বন্ধে স্বতই সংশয় সমুত্থিত হইতে পারে; কারণ, পুরুষমাত্রই অল্পাধিক পরিমাণে ভ্রম, প্রমাদ, প্রতারণা ও ইন্দ্রিয়-বৈকল্য প্রভৃতি দোষরাশির বিলাস-ভবন; সুতরাং পুরুষপ্রণীত বাক্যে লোকের সংশয় সম্ভাবনাও খুবই স্বাভাবিক। সংশয়িত বাক্য যতক্ষণ দৃঢ়তর প্রমাণান্তর দ্বারা পরীক্ষিত না হয়, ততক্ষণ কোন মনস্বী মানবই তাহাতে আস্থা স্থাপন করে না, এবং তদুপদিষ্ট পথেও পদার্পণ করিতে সম্মত হয় না। কাজেই তাহা স্বতঃ প্রমাণরূপেও পরিগৃহীত হয় না। অতএব সেরূপ বাক্যের প্রামাণ্য নির্ণয়ের জন্য সর্ব্বাদৌ পরীক্ষার প্রয়োজন হয়।

পক্ষান্তরে, বেদ যদি যথার্থই অপৌরুষেয় হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, পুরুষমাত্র-সুলভ ভ্রম-প্রমাদাদির সম্বন্ধ নিবন্ধন যে, অপ্রামাণ্য-সম্ভাবনা, তাহা উহাতে আদৌ স্থান পাইতে পারে না; সুতরাং উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতেও কাহারো কোন প্রকার আপত্তি আসিতে পারে না। এই কারণেই, বেদবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন কথা বলিতে

হইলে প্রথমেই বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক হয়।

অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, দৃশ্যমান বিশ্ব প্রকটিত হইবার পূর্ব্বে, এমনই একটা অননুভবনীয় সাম্যের বিলাস ছিল, যেখানে বৈচিত্র্যের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল না। যাহার পরিচয় দিতে যাইয়া শাস্ত্র বলিয়াছে—

"নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমি-
র্নাসীৎ তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।
শব্দাদিবুদ্ধ্যাদ্যুপলভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ॥" ইতি।

(সাংখ্যদর্শন ৫। ৮৫ সূত্র, বিজ্ঞানভিক্ষু)

সে সময়, দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না, ভূমি, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্মণ্ডল, কিংবা দেব দানব প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক কোনও বৈচিত্র্যময় পদার্থ ছিল না; তখন প্রকৃতি দেবী নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় নিতান্ত নিস্তব্ধভাবে শান্তির ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন এবং একমাত্র চিন্ময় পুরুষ তখন সাক্ষিরূপে প্রকৃতির পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

এইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইবার পর জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মরাশি উদ্বুদ্ধ (ফলোন্মুখ) হইল; সঙ্গে সঙ্গে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের হৃদয়েও সিসৃক্ষা—জগৎ রচনার ইচ্ছা বা সংকল্প

উপস্থিত হইল—“বহু স্যাং প্রজায়েয়”। তখন তাঁহার সেই অমোঘ ইচ্ছাপ্রভাবে প্রকৃতির দীর্ঘনিদ্রার অবসান হইল—প্রকৃতির সর্ব্বশরীরে বিক্ষোভ বা স্পন্দন উপস্থিত হইল। অতঃপর—

“স তপোঽতপ্যত, তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত,
যদিদং কিঞ্চ” ইতি।

(ছান্দোগ্য ৬।২।১)

তিনি তপস্যা করিলেন; তপস্যা করিয়া জগতের যাহা কিছু পদার্থ, সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। পরমেশ্বরের তপস্যা অর্থ—সৃষ্টিসম্বন্ধে কর্ত্তব্যাবধারণের উপযোগী চিন্তা।

এই সময়েই তিনি অন্ধ প্রকৃতির পরিচালনক্ষম সর্ব্বাদৌ শরীরধারী এক মহাপুরুষের সৃষ্টি করিলেন; তাঁহার নাম আদিপুরুষ হিরণ্যগর্ভ (১)। পরমেশ্বর সেই আদিপুরুষের উপর সৃষ্টি পরিচালনার সমস্ত ভার সমর্পন করিলেন।

হিরণ্যগর্ভ তখন আপনার গুরুতর কর্ত্তব্যভার দুর্ব্বহ বিবেচনা করিয়া নিতান্ত চিন্তান্বিত হইলেন,—তিনি ধ্যানে বসিলেন। ধ্যান-

---

(১) “স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥”

“ব্রহ্মা কবীনাং প্রথমঃ সংবভূব,
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা॥” (মুণ্ডকোপনিষদ্।১)
হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥” (ঋগ্বেদ)

নিমগ্ন হিরণ্যগর্ভের হৃদয়ে তখন বেদের সূক্ষ্ম সূত্রস্বরূপ একটা ধ্বনি (নাদ) আবির্ভূত হইল। ইহাই বাঙ্ময় জগতের বীজ বা আদি কারণ।

ক্রমে সেই অস্ফুট নাদই স্ফুটতর হইয়া স্বর-ব্যঞ্জনসংঘাতময় বর্ণরাশিরূপে পরিণত হইল। তখন ভূ-পৃষ্ঠে নিপতিত তুষাররাশি যেমন শৈত্যসংযোগে করকাকারে পরিণত হয়, তেমনি আদি পুরুষের হৃদয়নিহিত সেই বর্ণরাশিই ভগবদিচ্ছাক্রমে পরস্পারের সহিত সম্মিলিত হইয়া বৈদিক শব্দাকার ধারণ করিল, এবং ক্রমে তাহাই জগতে প্রণব, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদ নামে অভিহিত ও প্রচারিত হইল।

আলোচ্য বেদবিদ্যার এবংবিধ প্রচার যে, কেবল বর্ত্তমান সৃষ্টির প্রারম্ভেই একবারমাত্র হইয়াছে, তাহা নহে; অনাদি কাল হইতেই এই নিয়ম অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং চলিবেও চিরকাল। প্রত্যেক প্রলয়ের অবসানে বা প্রত্যেক সৃষ্টির প্রারম্ভে এইরূপেই বেদবিদ্যার আবির্ভাব ও প্রচার হইয়া থাকে, এবং সুদূর ভবিষ্যতেও এ নিয়মের অন্যথা হইবে না। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে এ কথার অনুকূলে যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে। যথা—

"যুগান্তেহন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য)

"অনাদি-নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা, যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবৈভ্যো দদাত্যজঃ॥"

ইত্যাদি বচনপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, জগতে দিবারাত্রপ্রবাহ যেরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়প্রবাহও সেইরূপই অপ্রতিহতভাবে চলিয়া আসিতেছে; এবং প্রত্যেক রাত্রির অবসানে যেরূপ একই আদিত্যের বারংবার আবির্ভাব হয়, আবার দিবাবসানে তিরোভাব হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক সৃষ্টির প্রারম্ভেই একই বেদবিদ্যার আবির্ভাব বা উদ্বোধন হইয়া আবার প্রলয়-কালে অন্তর্ধান হয়। ইহাই মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার সনাতন নিয়ম।

ভারতের নরনারীগণ দীর্ঘকাল এই বেদরূপ কল্পতরুর ছায়া-শীতল পাদতলে সমাসীন থাকিয়া সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে আপন আপন অভীষ্ট ধর্ম্মময় ফললাভে পরিতুষ্ট ও কৃতার্থ হইত। সে সময় আর্য্য নরনারীগণের সুবিমল মানসাকাশে ধর্ম্ম-জ্ঞানময়-পূর্ণ শশধরের সমুজ্জ্বল আলোকমালা চিরনিরন্তর বিরাজমান ছিল; সংশয়-সমীরণের আন্দোলনে কাহারও কোমল হৃদয় চঞ্চল হইত না; বিতর্ক-বাত্যার তীব্র তাড়নে সনাতন বেদ-তরু কখনও প্রকম্পিত হইত না, নাস্তিকতা-পিশাচীর প্রচণ্ড তাণ্ডবে শান্তশীল

সাধুহৃদয় কদাচ উদ্বেজিত হইত না; বিতণ্ডাবাদরূপ মহামেঘের গভীর গর্জ্জনে কাহারো শ্রবণবিবর বধিরীকৃত হইত না, এবং প্রবল প্রতিপক্ষের দোষক্ষেপরূপ ভীষণ অশনি-সম্পাতও সম্ভাবিত ছিল না। সেই পরম রমণীয় স্মরণীয় সময়ে সকলেই অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার বেদরূপ কল্পপাদপের শীতল ছায়ায় বসিয়া শান্তিসুখ সম্ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইত। কিন্তু দুর্নিবার কাল কাহারো মুখাপেক্ষা করে না; সে আপন মনে আপনার কর্ত্তব্য পথে চলিতে থাকে, কেহই তাহার সে গতি রোধ করিতে সমর্থ হয় না।

সেই মহামহিম করাল কালচক্রের অমোঘ আবর্ত্তনে ভারতের সেই শান্তির সময় চলিয়া গেল, সে সুখের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, একে একে পুরাতন নিয়ম-বন্ধন সমস্তই বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল—ভারতবাসীর নির্ম্মল মানসাকাশে সংশয়ের সূক্ষ্ম রেখা উপস্থিত হইল। ক্রমে তাহাই ঘনীভূত প্রবল জলদজালে পরিণত হইয়া ভারতে বিষম দুর্দ্দিনের সূত্রপাত করিল। তখন কুতর্ক-কালিমাস্পর্শে শুদ্ধ সাধুহৃদয়ও ক্রমে মলিন হইতে লাগিল; বিতণ্ডাবাদরূপ ঝটিকা-সংপাতে সনাতন ধর্ম্মবন্ধনগুলি ক্রমে শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া পড়িল; এবং বেদের অপৌরুষেয়তা বা স্বতঃ প্রামাণ্যসম্বন্ধে পূর্ব্বে যে, বিশ্বাস ছিল, তাহা ও ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়া যাইতে লাগিল।

তৎপূর্ব্বে—যখন ভারতে ঋষিশাসন বলবৎ ছিল, তখন কোন লোক ভ্রান্তিবশেও যদি বেদের বিরুদ্ধে তর্ক করিত, কিংবা অল্পমাত্রও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত, তাহা হইলে, সে

লোক নাস্তিক নামে অভিহিত হইত এবং আর্য্যসমাজ হইতে বিতাড়িত হইত। মনু বলিয়াছেন—

"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥"

(মনুসংহিতা ২।১১)

অভিপ্রায় এই যে, কোন লোক যদি অসৎ তর্কের সাহায্যে বেদবিদ্যার প্রতি অনাদর প্রকাশ করে, তাহা হইলে সাধুজনেরা সেই বেদবিদ্বেষী নাস্তিককে সমাজ হইতে দূর করিয়া দিবেন।

মনুর মতে, যাহার প্রতি অনাদর প্রকাশও মহা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত ছিল, কালক্রমে একদল লোক তাহারই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

এই মহামন্ত্রের উপাসক, ইহকাল-সর্ব্বস্ব নাস্তিক-শিরোমণি চার্ব্বাক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিল। ক্রমে তাহারা প্রচার করিতে লাগিল—

"ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।"
"চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ॥"
"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ॥" ইত্যাদি।

(সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)

অর্থাৎ স্বর্গ নাই, নরক নাই, পরলোকগামী দেহাতিরিক্ত

আত্মাও নাই। গুড় ও তণ্ডুলাদি দ্রব্য সম্মিলিত হইলে, তাহাতে যেমন অভিনব মাদকতাশক্তি আবির্ভূত হয়, ঠিক তেমনি ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু, এইভূতচতুষ্টয়ের সংযোগে স্থূল দেহেও চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু দেহাতিরিক্ত নিত্য-চৈতন্যসম্পন্ন আত্মা বলিয়া কোনও পদার্থ নাই; সুতরাং দেহ-ধ্বংসের পর স্বর্গনরকাদিরও সম্ভাবনা নাই। ইহলোকেই স্বর্গ-নরকাদি প্রতিষ্ঠিত। ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও মাংসলোলুপ রাক্ষসপ্রকৃতি-সম্পন্ন, এই তিন শ্রেণীর লোক নিজ নিজ স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে বেদশাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছে; সুতরাং উহা প্রতারণামূলক অপ্রমাণ, ইত্যাদি আপাতমধুর বাক্য-বিন্যাসে বেদনিষ্ঠার পরা-কাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল।

সেই ভীষণ দুঃসময়ে অপার করুণাসাগর কৃপাপরবশ ঋষি-সমাজ সমাজের হিতচিন্তায় মনোযোগী হইলেন, এবং উহার প্রতিকারকল্পে উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণে তৎপর হইলেন। অধিকন্তু, সমাজের সাময়িক শক্তি ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন-প্রকার উপদেশ ও যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রধানতঃ বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু বেদ যদি অপৌরুষেয় না হইয়া পৌরুষেয়ই হয়, তবে উহার প্রামাণ্য-নির্দ্ধারণ কখনই নিঃসন্দেহ হইতে পারে না; এই কারণে বেদপ্রামাণ্যবাদীর পক্ষে সর্ব্বাদৌ বেদের অপৌরুষেয়তা চিন্তা করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য যে, এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বাচার্য্য-প্রদর্শিত পথেরই অধিকপরিমাণে অনুসরণ করিব।

বেদের অপৌরুষেয়তা বা প্রামাণ্য সম্বন্ধে চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমেই প্রাচীন ঋষিবৃন্দ ও আচার্য্যগণের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; জানিতে ইচ্ছা হয় যে, তাঁহারা দীর্ঘ কালব্যাপী কঠোর সাধনা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে এ সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

প্রকৃত কথা।

তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এ বিষয়ে কপিল, কণাদ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, গোতম, পতঞ্জলি ও জৈমিনি প্রভৃতি দূরদর্শী ঋষিগণ এবং জ্ঞানগুরু শঙ্কর, শবর, সায়ন, উদয়ন ও রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ সকলেই একমত হইয়াছেন; সকলেই সমস্বরে বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার করিয়াছেন। কেবল যে, স্বীকারোক্তিতেই তাঁহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত করিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু বিপুল আড়ম্বর-পূর্ণ যুক্তিতর্কের সাহায্যেও সে সমুদয় কথার সমর্থন করিয়াছেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা প্রত্যেকে বিভিন্ন পথের পথিক ও বিভিন্ন মতের উপাসক হইয়াও বেদের অপৌরুষেয়তা বা প্রামাণ্য বিষয়ে সকলেই একমত হইয়াছেন, কিন্তু একমত হইয়াও প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ রুচি ও প্রবৃত্তিভেদে বিভিন্ন প্রকার স্বাধীন যুক্তির অবতারণা করিয়া যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কে কিরূপ যুক্তি ও প্রমাণের অনুসরণপূর্ব্বক স্বমত সমর্থন করিয়াছেন, পরে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব এবং পরিশেষে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়া এপ্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। এখন প্রথমে মহর্ষি

গোতমের কথাই আলোচনা করা যাইতেছে। মহর্ষি গোতম স্বপ্রণীত ন্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবচ্চ তৎপ্রামাণ্যম্, আপ্তপ্রামাণ্যাৎ" ॥ ৬৭ ॥

মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ যেরূপ প্রমাণ—সত্যার্থ-প্রতিপাদক, প্রসিদ্ধ বেদ-শাস্ত্রও ঠিক সেইরূপই প্রমাণ; কারণ, উহা আপ্তবাক্য। আপ্ত অর্থ—রাগদ্বেষাদি দোষশূন্য। রাগদ্বেষাদি দোষেই পুরুষকে প্রতারিত করে, অসৎপথে লইয়া যায়; সুতরাং যাহাদের হৃদয় রাগদ্বেষাদি দোষে কলুষিত, তাহাদের বাক্যে স্বতই অপ্রামাণ্যা-শঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহাদের হৃদয় হইতে সেই রাগদ্বেষাদি দোষনিচয় চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, তাদৃশ শুদ্ধসত্ত্ব 'আপ্ত' পুরুষদিগের বাক্যে ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ-সম্বন্ধ থাকিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের বাক্যে অপ্রামাণ্যা-শঙ্কাও আসিতে পারে না। (১) পরম পুরুষ পরমেশ্বর স্বভাবতই নির্দ্দোষ—রাগদ্বেষাদি-দোষরহিত (২); সুতরাং তৎকৃত বেদবাক্যে ভ্রান্তি বা প্রতারণাদি দোষ থাকা কখনও সম্ভব

---

(১) আপ্তের লক্ষণ —"আগমো হ্যাপ্তবচনম্, আপ্তঃ দোষক্ষয়াদ্ বিদুঃ।
ক্ষীণদোষোঽনৃতং বাক্যং ন ক্রয়াৎ হেত্বসম্ভবাৎ ॥

(২) ঈশ্বরের নির্দ্দোষত্ব প্রামাণিক শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। যথা—"ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ॥" (যোগসূত্র : ১।২৪)
"ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগস্তদ্যোগাদৃতে॥" (সাংখ্যদর্শন ১।১৯)।

হয় না। ভ্রান্তি সম্ভব হয় না বলিয়াই উহা স্বতঃ প্রমাণ; উহা অপৌরুষেয়। এখানে দেখা যায়, বেদবাক্য যে, প্রমাণ এবং তদুপদিষ্ট বিষয়সমূহও যে, সত্য, তদ্বিষয়ে মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র দৃষ্টান্ত বা উদাহরণরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যদিও আমাদের পক্ষে বেদোপদিষ্ট সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হয় না সত্য, তথাপি তদেকদেশ মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া সমুদয় বেদশাস্ত্রেরই সত্যতা বা প্রামাণ্য স্বীকার করা বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত বা যুক্তিবিরুদ্ধ হয় নাই। বেদোক্ত মন্ত্রের সফলতা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট উক্ত উদাহরণটা নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইবে না; আর অথর্ব্ববেদের উপবেদ আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভৈষজ্যবিজ্ঞানের সাফল্য সম্বন্ধেও বোধ হয় কাহারো আপত্তি থাকিতে পারে না; সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক কথা না বলিলেও চলে।

মহামুনি কণাদ বেদপ্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে তাঁহার প্রথম কথা এই—

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্॥" (বৈশেষিক সূত্র ১।১।৩)

অর্থাৎ বেদ যখন নিত্যনির্দ্দোষ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের বচন, তখন উহার প্রামাণ্য অবশ্যস্বীকার্য্য। ঈশ্বর যে, পৌরুষেয় ভ্রমপ্রমাদাদি কোন দোষেই দূষিত নহেন, একথা ঈশ্বরাস্তিত্ববাদী ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য; সুতরাং সূত্রমধ্যে ঐ সমস্ত

কথা স্পষ্ট না থাকিলেও, ধরিয়া লইতেই হইবে যে, ঐসকল কথাও সূত্রকারের অভিপ্রেত।

কণাদের আর একটী সূত্রে একথা আরও স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে। সূত্রটী এই—

"বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্ব্বেদে ॥" (৬।১।১)

বাক্যরচনামাত্রই বুদ্ধিসাপেক্ষ ; যাহার বিশিষ্ট বুদ্ধি নাই, সে কখনও কোনরূপ বাক্য রচনাকরিতে পারে না। বেদও বাক্যসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে ; সুতরাং তাহাও যে, বুদ্ধিপূর্ব্বক বিরচিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বক্তা প্রথমে বক্তব্য বিষয়সমূহ হৃদয়-পটে অঙ্কিত করে, পরে বাক্যদ্বারা তাহা ব্যক্ত করে। যাহা কখনও মনে ধারণা করা হয় নাই, বা হইতে পারে না, উন্মত্ত ভিন্ন কেহই তদ্বিষয়ে বাক্য প্রয়োগ করে না। ইহাই কার্য্য কারণভাবের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম। অথচ বেদে যে সমুদয় বিষয় বিবৃত রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশই লোকবুদ্ধির অগোচর— অলৌকিক ; সুতরাং সে সমুদয় বিষয় বুদ্ধিতে সংকলন করা, যা'র তা'র পক্ষে সম্ভবপর হয় না ; একমাত্র অনন্ত জ্ঞানসাগর পরমেশ্বরের পক্ষেই সম্ভব হয় ; অতএব অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেদপ্রণয়নের গুরুতর দায়িত্ব পরমেশ্বরের উপরেই অর্পণ করিতে হয়। জীবসুলভ ভ্রমপ্রমাদাদি দোষসমূহ কস্মিন্ কালেও পরমেশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারে না ; সুতরাং তৎকৃত বেদবাক্যেও

ভ্রমপ্রমাদাদি দোষসম্বন্ধ থাকিতে পারে না; পারে না বলিয়াই বেদবাক্য অভ্রান্ত নিত্য প্রমাণ। কণাদের পর পতঞ্জলির কথা বলা যাউক। যোগদর্শনপ্রণেতা মহামুনি পতঞ্জলি এ সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে কোন কথা না বলিলেও, তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে যে দুইটী সূত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই বেদপ্রামাণ্যের সম্বন্ধে তাঁহার কতকটা অভিমত জানিতে পারা যায়। তাঁহার সূত্রদুইটী এই—

১ম "ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ॥" (১।২৪)

২য়—"স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ, কালেনানবচ্ছেদাৎ।।" (১।২৬)

উদ্ধৃত প্রথম সূত্রের ভাষ্যমধ্যে ব্যাসদেব লিখিয়াছেন— "যোঽসৌ * * * শাশ্বতিকঃ সত্ত্বোৎকর্ষঃ, স কিং সনিমিত্তঃ? আহোস্বিৎ নির্নিমিত্তঃ? তস্য শাস্ত্রং নিমিত্তম্। শাস্ত্রং পুনঃ কিংনিমিত্তম্? প্রকৃষ্টসত্ত্বনিমিত্তম্; এতয়োঃ শাস্ত্রোৎকর্ষয়োঃ ঈশ্বরসত্ত্বে বর্ত্তমানয়োরনাদিঃ সম্বন্ধঃ।"

এখানে প্রথমে জিজ্ঞাসা হইল, ঈশ্বরের যে, অনাদিসিদ্ধ সত্ত্বোৎকর্ষ (বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ), উহা কি সনিমিত্তক? অথবা নির্নিমিত্তক?—অর্থাৎ তদ্বিষয়ে কি কোন প্রমান আছে? অথবা প্রমাণ নাই? উত্তর হইল—হাঁ, উহা সনিমিত্তক অর্থাৎ তৎকৃত শাস্ত্রই সেবিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ বা জ্ঞাপক। পুনর্ব্বার

প্রশ্ন হইল—ভাল, শাস্ত্রপ্রামাণ্যের কারণ (যুক্তি) কি? উত্তর হইল—ঈশ্বরের সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বাভাবিক উৎকর্ষই শাস্ত্র-প্রামাণ্যের কারণ।

অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর যদি শুদ্ধসত্ত্ব না হইতেন, তাহা হইলে তৎকৃত বেদশাস্ত্র কখনই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইত না; আবার বেদশাস্ত্র যদি সত্যার্থপ্রতিপাদক প্রমাণস্বরূপ না হইত, তাহা হইলে, তৎপ্রণেতা ঈশ্বরেরও সত্ত্বোৎকর্ষ প্রমাণিত হইত না। ঈশ্বরের সত্ত্বোৎকর্ষ বা বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বেদশাস্ত্র, এতদুভয়ের মধ্যে যে, একটা সম্বন্ধ, তাহা অনাদিসিদ্ধ।

উদ্ধৃত দ্বিতীয় সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, নিত্য পরমেশ্বরই পরবর্ত্তী বেদবক্তা ব্রহ্মা প্রভৃতিরও গুরু বা উপদেষ্টা; সুতরাং এখানে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ না থাকিলেও, প্রকারান্তরে বলাই হইয়াছে যে, পরমেশ্বরই বেদবিদ্যার চিরন্তন আশ্রয় ও প্রচারক, এবং তাঁহা হইতেই বেদবিদ্যা জগতে প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে—"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে" এবং "প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী" অর্থাৎ যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদবিদ্যা উদ্বোধিত করিয়াছিলেন।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, পরমেশ্বরই বেদবিদ্যার নিত্য নিবাসভূমি, এবং তিনিই উহার প্রাণ ও প্রচারক; অতএব পরমেশ্বরপ্রণীত বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য অব্যাহত বলিতে হইবে। ইহার পর কপিলের কথা আলোচনা করা যাউক।

সাংখ্যপ্রণেতা মহর্ষি কপিল বিশেষ আড়ম্বর সহকারে বেদ-

প্রামাণ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, এবং তিনি বেদের অপৌরুষেয়তা-সংস্থাপনেও সমধিক প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি পঞ্চম অধ্যায়ের একটী সূত্রে বলিয়াছেন—

"ন নিত্যত্বং বেদানাং, কার্য্যত্বশ্রুতেঃ।" (৫।৪০)

বেদ নিত্য নহে; যেহেতু শ্রুতিতে উহার উৎপত্তির কথা রহিয়াছে। —'ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ প্রভৃতি ইহাঁর (পরমেশ্বরের) নিঃশ্বাসস্বরূপ ইত্যাদি, এবং 'পরমেশ্বর হইতে ঋক্, সাম ও সমস্ত ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে' ইত্যাদি শ্রুতি সমূহ (১) যখন বেদোৎপত্তির কথা তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে, এবং উৎপত্তিশীল পদার্থ মাত্রই যখন অনিত্য, তখন বেদের অনিত্যতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কপিলের মতে বেদ স্বরূপতঃ অনিত্য হইলেও প্রবাহক্রমে (২) নিত্য। অনাদিকাল হইতে কখনও বেদবিদ্যার অত্যন্ত বিলোপ হয় নাই, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না।

বেদ অনিত্য হইলেও মহাভারতাদি গ্রন্থের ন্যায় উহা পৌরুষেয় নহে, একথা তিনি অপর একটী সূত্রে পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—

---

(১) "অস্য বা মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্, যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ" ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যক ৩।২।৫)

"ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে, ছন্দাংসি জজ্ঞিরেঽপি চ" ইত্যাদি।

(২) জলপ্রবাহের জলরাশি পরিবর্ত্তনশীল হইলেও, তাহার প্রবাহ যে প্রকার স্থিরতর থাকে, সেই প্রকার স্থিরতর বস্তুকে 'প্রবাহনিত্য' বলা হয়।

"ন পৌরুষেয়ত্বং বেদানাং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ।"

(সাংখ্যদর্শন ৫।৪৫)

কপিলের অভিপ্রায় এই যে, বেদ পৌরুষেয় নহে; কারণ, বেদকর্ত্তা কোন পুরুষ থাকা সম্ভব হয় না। প্রথমতঃ যাঁহারা মুক্ত পুরুষ, তাঁহাদের যোগ্যতা সত্ত্বেও বহু আয়াসসাধ্য ঈদৃশ বিশাল বেদরচনায় তাঁহাদের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না; বিনা প্রয়োজনে কখনও কোন প্রকৃতিস্থ পুরুষের প্রবৃত্তি হইতে পারে না; সুতরাং মুক্ত পুরুষ দ্বারা বেদ রচনা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়তঃ যাহারা অমুক্ত পুরুষ—ভ্রম প্রমাদাদি দোষের চির-সহচর; চেষ্টা সত্ত্বেও, তাহাদের পক্ষে ঐ রূপ জ্ঞানগম্ভীর অলৌকিক রহস্যপূর্ণ, এতবড় একটা শাস্ত্র প্রণয়ণ করা সম্ভবপর হয় না। অতএব বেদকে পৌরুষেয় বলিতে পারা যায় না; এবং অপৌরুষেয় বলিয়াই, বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয়ও আসিতে পারে না।

উৎপত্তিশীল পদার্থও যে, অপৌরুষেয় হইতে পারে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত কপিলদেব 'পৌরুষেয়' কথার এইরূপ পরিভাষা করিয়াছেন যে,—

"যস্মিন্নদৃষ্টেঽপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে, তৎ পৌরুষেয়ম্॥"

(সাংখ্যদর্শন ৫।৫০)

তাৎপর্য্য এই যে, যাহার উৎপত্তি প্রত্যক্ষ-গোচর না হইলেও, দেখিবামাত্র উহার বুদ্ধিপূর্ব্বকত্ব প্রতীত হয়, অর্থাৎ ইহার

রচনা নিশ্চয়ই কাহারো বুদ্ধিশক্তি-পরিচালনার প্রকৃষ্ট ফল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহাই 'পৌরুষেয়'। যেমন মহাভারত প্রভৃতি। আর যাহার সম্বন্ধে সেরূপ প্রতীতি হয় না; অযত্নসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়, তাহা পুরুষবিশেষ হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেও 'অপৌরুষেয়' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য; যেমন প্রাণিমাত্রের সহজসিদ্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস। অলৌকিকার্থের প্রতিপাদক বেদ সম্বন্ধে যে, 'কৃতত্ব' বুদ্ধি কেন হইতে পারে না, তাহা প্রথমেই বলা হইয়াছে। বেদকে আদিপুরুষের নিঃশ্বাসতুল্য বলাতে বুঝা যাইতেছে যে, ইহাও নিশ্বাসবৎ অযত্নপ্রসূত; সুতরাং ইহা অপৌরুষেয়। অতঃপর জৈমিনির সিদ্ধান্ত আলোচনা করা যাউক।

মহামুনি জৈমিনি বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সংস্থাপনবিষয়ে সমধিক প্রয়াস পাইয়াছেন; এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি প্রথমতঃ বর্ণের নিত্যতা নিরূপণ করিয়াছেন, পরে শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে, একটা বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধ আছে, তাহারও নিত্যতা স্থাপন করিয়াছেন, এবং তাহা দ্বারাই বেদের অপৌরুষেয়তা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন—

"ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ, তস্য
জ্ঞানমুপদেশঃ।" ইত্যাদি (১।১।৫)।

পদার্থ প্রতীতির জন্য সাধারণতঃ যে সমুদয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সে সমুদয় শব্দ নিত্য—অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল

পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে ও থাকিবে। একই বর্ণের বা শব্দের যে, প্রত্যেক উচ্চারণেই প্রভেদ প্রতীত হয়, তাহা বর্ণ বা শব্দ-গত নহে ; পরন্তু উচ্চারণগত। সেই উচ্চারণগত পার্থক্যই বর্ণে ও শব্দে আরোপিত করিয়া উহাদের পার্থক্য কল্পনা করা হয় মাত্র।

দৃশ্যমান জাগতিক পদার্থনিচয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারা যায় ;—আমরা জগতে সচরাচর যে সমস্ত বস্তুর বিনাশ দর্শন করিয়া থাকি, প্রকৃতপক্ষে সে সমুদয় বস্তুর স্থূলভাব বিনষ্ট হইলেও উহাদের আকৃতিগুলি চিরকাল থাকিয়া যায়। সমস্ত বস্তুরই আকৃতিসমূহ নিত্য বা চিরস্থায়ী ; বস্তুর বিনাশে ও তাহার বিনাশ হয় না। সেই সমুদয় আকৃতির সহিতই শব্দের সম্বন্ধ, ব্যক্তির (স্থূল পিণ্ডের) সহিত নহে। আকৃতিই শব্দের মুখ্য অর্থ, ব্যক্তি নহে। শব্দ ও আকৃতির মধ্যে যে, বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধ, ইহা হর-গৌরীমূর্ত্তির ন্যায় অবিযুক্তস্বভাব নিত্যসিদ্ধ। উহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের চিন্তা বা চেষ্টার ফল নহে।

ভাল, নিত্য আকৃতির সহিত শব্দের সম্বন্ধ স্বীকার করায়, 'ইন্দ্রাদি দেবতার উৎপত্তির পূর্ব্বে তদ্বাচক ইন্দ্রপ্রভৃতি শব্দসমূহ কি অর্থহীন অবস্থায় ছিল ? অর্থহীন শব্দমাত্রই উন্মত্ত-প্রলাপের ন্যায় অপ্রমাণ ; সুতরাং তদবস্থায় আলোচ্য বেদও অপ্রমাণমধ্যেই পরিগণিত হইতে পারে, এবং অগ্নিশব্দ উচ্চারণ করিলে ও বক্তার মুখ দগ্ধ হইতে পারে, ইত্যাদি আশঙ্কারও অবসর থাকে না। কারণ, আকৃতি পদার্থ স্বভাবতই নিত্য এবং দাহউষ্ণত্বাদি গুণসম্পন্ন অগ্নি

হইতে স্বতন্ত্র ; সেই আকৃতিই অগ্নি শব্দের অর্থ, সাধারণ অগ্নি নহে। পরে, বেদোক্ত ঋষিদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

বেদেতে যে সমস্ত ঋষির নাম পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহারা বেদের স্রষ্টা নহে—দ্রষ্টা মাত্র। যে ঋষি যে মন্ত্র প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি নামে অভিহিত হইয়াছেন।

মহর্ষি কাত্যায়নও তাহার সর্ব্বানুক্রম সূত্রে এ কথার সুন্দর সমাধান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"দ্রষ্টার ঋযয়ঃ—স্মর্ত্তারঃ পরমেষ্ঠ্যাদয়ঃ।"

সূত্রভষ্যকার যাজ্ঞিক অনন্তদেব এই সূত্রের ব্যাখায় বলিয়াছেন—

পরমেষ্ঠী আদিঃ প্রথমো যেষাং, তে পরমেষ্ঠ্যাদয়ঃ। সংহিতায়াম্ আদৌ দর্শপূর্ণমাসমন্ত্রাঃ পঠিতাঃ, তেষাং চ পরমেষ্ঠী ঋষিঃ। 'পরমেষ্ঠ্যাদয়ঃ' ইতি—পরমেষ্ঠি-প্রজাপতিপ্রভৃতয়ঃ মন্ত্রাণাং দ্রষ্টার ঋষয় ইত্যুচ্যন্তে। 'দ্রষ্টারঃ' ইত্যস্য ব্যাখ্যানং 'স্মর্ত্তারঃ' ইতি।

পরমেষ্ঠ্যাদয়ো হি পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে নানাবিধদুষ্করতপশ্চরণাদি-বিশিষ্ট-কর্ম্মজনিত-স্মৃতিসংস্কারাৎ ব্যবস্থিতধর্ম্মাণঃ সুপ্তপ্রবুদ্ধবৎ কল্পাদৌ,...কল্পান্তে অধ্যেতৃক্ষয়াদুৎসন্নান্ মন্ত্রান্ স্মরন্তীতি স্মর্ত্তার ইত্যুচ্যতে। অতশ্চ যঃ পরমেষ্ঠ্যাদিঃ যং মন্ত্রং স্মরতি, তস্য মন্ত্রস্য স ঋষিরিত্যুচ্যতে। অতএবাহ "ঋষিঃ দর্শনাৎ" ইতি।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যজুর্ব্বেদসংহিতার প্রথমেই 'দর্শপূর্ণমাস' যজ্ঞের মন্ত্রসমূহ পঠিত হইয়াছে ; পরমেষ্ঠী তাহার ঋষি।

পরমেষ্ঠিপ্রভৃতি প্রজাপতিগণ এই সকল মন্ত্রের দ্রষ্টা—স্মরণ-কর্ত্তা—ঋষি। সূত্রস্থ 'স্মর্ত্তা' শব্দটী 'দ্রষ্টা' কথারই ব্যাখ্যা বা অর্থপ্রকাশকমাত্র।

পূর্ব্বকল্পে পরমেষ্ঠী প্রজাপতিপ্রভৃতি ঋষিগণ নানাপ্রকার দুষ্কর তপস্যা ও সৎকর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ে সেই সমুদয় সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ ছিল। কল্পক্ষয়ে অর্থাৎ প্রলয়সময়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও অধ্যেতৃ লোকের বিলোপ হওয়ায় বেদমন্ত্র সমূহ উৎসন্ন বা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। পুনর্ব্বার যখন নূতন সৃষ্টির আরম্ভ হয়, তখন পরমেষ্ঠিপ্রভৃতির হৃদয়নিহিত সেই পূর্ব্বতন সংস্কারসমূহই সুপ্ত-প্রতিবুদ্ধের ন্যায়ে পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়। তখন তাঁহারা পূর্ব্বপরিজ্ঞাত বেদমন্ত্রসমূহ স্মরণ করিতে থাকেন। যিনি যে মন্ত্র স্মরণ করিয়াছিলেন, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ঋষিগণ যে, মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন, সে দর্শন চাক্ষুষ দর্শন নহে; উহা মানস দর্শন; মনে মনে তাহারা বেদমন্ত্রসমূহ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই জন্যই পৌরাণিকগণ বলিয়াছেন—

"ন কশ্চিদ্ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্মুখঃ" ইত্যাদি।

বেদের কেহ কর্ত্তা নাই, স্বয়ং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদের স্মরণ-কর্ত্তা মাত্র।

বেদের কোন কোন অংশ ব্যক্তিবিশেষের নামে অভিহিত দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন—কাঠক, কৌথুম, শাকল প্রভৃতি। এইরূপ নাম দর্শনে সহজেই মনে হইতে পারে যে, ঐ সমুদয়

বেদাংশ কঠ, কুথুম ও শকল প্রভৃতি ঋষির কল্পনাপ্রসূত ; সুতরাং পৌরুষেয় ; সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন—

"আখ্যা প্রবচনাৎ ॥" (১।১।৩০)

কঠ কুথুম ও শকল প্রভৃতি ঋষিগণ সমধিক অভিজ্ঞতালাভ করিয়া বেদের ঐ সমস্ত অংশের প্রবচন অর্থাৎ ব্যাখ্যান বা অধ্যাপনা প্রভৃতি দ্বারা প্রচারকার্য্য করিয়াছিলেন ; সেইজন্যই ঐ সমস্ত বেদাংশ তাহাদের নামানুসারে কাঠক কৌথুম ও শাকল প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে ; প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ঐ সমস্ত অংশের রচয়িতা নহে, কেবল ব্যাখ্যাকর্ত্তা ও প্রচারকমাত্র ; সুতরাং ইহা দ্বারাও বেদের অনিত্যতা বা পৌরুষেয়তা প্রমাণিত হইতে পারে না। যাহা অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, এবং যাহার উপর কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব থাকার কোনও প্রমাণ নাই ; তাহাই অপৌরুষেয়। বোধ হয়, বেদকে এরূপে অপৌরুষেয়—স্বতঃপ্রমাণ বলিতে কাহারও কোন আপত্তি হইতে পারে না।

মহামুনি জৈমিনি এ বিষয়ে আরও অনেক সুসঙ্গত যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। প্রবন্ধের বিস্তৃতিভয়ে এখানে সে সমুদয় কথার আর অধিক আলোচনা করা হইল না। অতঃপর বেদসম্বন্ধে বেদান্ত-সিদ্ধান্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

বেদান্তদর্শনের প্রণেতা বেদব্যাসের বাক্যভঙ্গী আলোচনা

করিলে মনে হয়, তিনি যেন বেদের অপৌরুষেয়তা বা প্রামাণ্য বিষয়ে নিতান্তই সংশয়শূন্য ছিলেন; সেই কারণেই তিনি তদ্বিষয়ে আর বিশেষ আলোচনার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই।

বেদব্যাস ও বেদান্ত দর্শন

তিনি বেদের প্রামাণ্যসম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া প্রথমেই বলিয়াছেন—

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ (১।১।৩)

শঙ্কা হইয়াছিল,—যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার সম্পন্ন হইতেছে, তাদৃশ মহামহিমাময় পরমেশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ কি? তদুত্তরে বেদব্যাস বলিলেন—ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই তাঁহার অস্তিত্বে প্রমাণ। পক্ষান্তরে, অতিগভীর-তত্ত্বপ্রকাশক ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র যাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তিনি যে, নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মভিন্ন আর কেহই হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মই বেদের কর্ত্তা।

বেদব্যাস এখানে এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহার পর, দেবতাধিকরণে—মনুষ্যের ন্যায় ইন্দ্রাদি দেবতারও জ্ঞান-কর্ম্মোপযোগী শরীর ও অধিকার আছে কিনা, এই বিচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"শব্দ ইতিচেৎ নাতঃ প্রভবাৎ, প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্॥"
(১।৩।২৮)

এই সূত্রে তিনি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত প্রতিপাদন করিয়াছেন

যে, অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ এই জগৎ প্রথমতঃ শব্দ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; শব্দই জগতের নিমিত্ত কারণ।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন, কেহ কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিতে হইলে, অগ্রে সেই বস্তুর একটা আকৃতি ও তদ্বোধক শব্দ মনোমধ্যে স্মরণ করে; পরে তদনুরূপ বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া থাকে; তেমনি পরম কারণ পরমেশ্বরও সৃজ্যমান বস্তুবোধক শব্দের স্মরণপূর্ব্বক বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বেদের অন্যত্র কথিত আছে যে, "এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবান্ অসৃজত, অসৃগ্রমিতি মনুষ্যান্, ইন্দব ইতি পিতৃন্" এবং "স প্রজাপতিঃ ভূরিতি ব্যাহরন্ স ভূমিমসৃজত" ইত্যাদি। উক্ত বেদবাক্যও এ কথার সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে। এ সমুদয় প্রমাণ হইতেই বেদব্যাস বাঙ্ময় জগতের নিত্যতা সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"অত এব চ নিত্যত্বম্॥" (৩।৩।২৯)

যেহেতু জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বেও শব্দের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, সেই হেতুও শব্দকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। প্রলয়ের পর যখনই নূতন করিয়া সৃষ্টি হয়, তখনই প্রত্যেক সৃষ্টিতে পূর্ব্বসৃষ্টির অনুরূপ কতকগুলি বিশিষ্ট বস্তুর সৃষ্টি হয়; সুতরাং কোন সময়েই বৈদিক শব্দের আনর্থক্য সম্ভাবনা করা যায় না।

ইহার মতে বেদ নিত্য হইলেও ব্রহ্মের ন্যায় ধ্বংসোৎপত্তি-বিরহিত কূটস্থ নিত্য নহে; পরন্তু প্রবাহনিত্য; অর্থাৎ পরমেশ্বর-প্রসূত বেদরাশি অনাদি কাল হইতে গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে

একই আকারে চলিয়া আসিতেছে ; কখনও ইহার অত্যন্ত উচ্ছেদ হয় নাই, এবং ভবিষ্যতেও হইবার সম্ভাবনা নাই ; এই কারণেই অনিত্য বেদকেও নিত্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রকৃত-পক্ষে কিন্তু বেদ পরমেশ্বরের প্রণীত অনিত্য।

"অস্য বা মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদ্—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ" ইত্যাদি, এবং "তস্মাৎ সামানি জজ্ঞিরে ছন্দাংসি জজ্ঞিরেঽপি চ"।

ইত্যাদি শ্রুতি-বচনই নিজের অনিত্যতা জ্ঞাপন করিতেছে।

বেদবিদ্যা পরমেশ্বর হইতে প্রসূত হইয়াও যে, কি প্রকারে 'অপৌরুষেয়' হইতে পারে, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বেদান্তাচার্য্য-গণ পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয় শব্দের এমনই একটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যাহা দ্বারা কোনটী পৌরুষেয়, আর কোনটী 'অপৌরুষেয়', ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা বলেন—পৌরুষেয়ত্ব কি ?

"সজাতীয়োচ্চারণানপেক্ষোচার্য্যত্বম্"।

অর্থাৎ যে শব্দের উচ্চারণে, তাহার সজাতীয় বা অনুরূপ পূর্ব্বতন অন্য কোনও উচ্চারণের অপেক্ষা থাকে না ; যথেচ্ছরূপে স্বাধীন ভাবে উচ্চারণ করা হয়, তাহাই 'পৌরুষেয়', আর যাহার উচ্চারণ তদ্বিপরীত—ঐরূপ পূর্ব্বতন উচ্চারণের অপেক্ষিত, অর্থাৎ যে শব্দ বা যে বাক্য ইতঃপূর্ব্বে যে ভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল, পরেও যদি সেই শব্দ বা সেই বাক্যটী ঠিক সেই

ভাবেই উচ্চারিত হয়, বক্তার কোন স্বাতন্ত্র্য না থাকে, তাহ হইলে সেই শব্দ বা বাক্য 'অপৌরুষেয়' সংজ্ঞায় অভিহিত হয় যেমন মহাকবি কালিদাসকৃত 'রঘুবংশ' নামক মহাকাব্য। কালিদাস আপনার ইচ্ছামত রস-ভাবের অভিব্যঞ্জক শব্দসমূহ সংকলনপূর্ব্বক বিবিধবাক্য রচনা দ্বারা ঐকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে, রঘুবংশ রচনা কালে, তৎপূর্ব্বতন ঐরূপ আর একখানা 'রঘুবংশ' দেখিয়া, ঠিক তদনুসারে এই রঘুবংশ রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ কল্পনা করিবার অনুকূল কোনও যুক্তি বা প্রমাণ দেখা যায় না। বেদরচনার ব্যবস্থা কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। দৃশ্যমান জগতের প্রথম সৃষ্টি ও তাহার সময় নির্দ্ধারণ করা যেরূপ অসম্ভব; তদ্রূপ বেদেরও প্রথম রচনা যে, কোন শুভ মূহুর্ত্তে কিরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করাও মানব-বুদ্ধির অসাধ্য। এই জন্যই বেদের সম্বন্ধে 'রচনা' কথাটার পরিবর্ত্তে অভিব্যক্তি বলিলেই বোধ হয় ঠিক হয়। জ্ঞান-গুরু শঙ্করাচার্য্য এ বিষয়ে—

"অনাদি-নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥"

এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া অর্থ করিবার সময় বলিয়াছেন যে,

"উৎসর্গোঽপ্যয়ং সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনাত্মকো দ্রষ্টব্যঃ, অনাদি-নিধনায়া অন্যাদৃশস্যোৎসর্গস্যাসম্ভবাৎ"। (১।৩।২৮)

অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ যে, উৎপত্তি-ধ্বংসরহিত নিত্য বেদবাক্যের

উৎসর্গ করিয়াছিলেন; সেই উৎসর্গ অর্থে গুরুশিষ্য-সম্প্রদায়-পরম্পরা ক্রমে বেদের প্রচার মাত্র বুঝিতে হইবে, কিন্তু উৎপত্তি নহে; কারণ, নিত্য বেদবাক্যের উৎপাদন করা কোন মতেই সম্ভব হয় না।

পূর্ব্বকল্পে বৈদিক বাক্যসমূহ যেরূপ পারম্পর্য্যক্রমে বিন্যস্ত ছিল, পরকল্পেও ঠিক সেইরূপ পারম্পর্য্যবিশিষ্ট ক্রমেই প্রকাশিত হইয়াছে; কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এমন কি, একটী বিন্দুবিসর্গও পরিত্যক্ত হয় নাই। ফল কথা, পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হইয়াও বেদোচ্চারণে অতি সামান্যমাত্রও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন নাই; এই কারণেই বেদ তাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়াও অপৌরুষেয়; অপৌরুষেয় বলিয়াই অবিসংবাদিত প্রমাণ রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে।

স্মৃতি ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্র আলোচনা করিলেও এতদনুরূপ বহুতর প্রমাণ পাইতে পারা যায়। উদাহরণস্বরূপ দুই একটী শ্লোকমাত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

"অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম শব্দরূপং যদাত্মকম্।"
"অনাদি-নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা সয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥"
"নাম-রূপে চ ভূতানাং কর্ম্মণাং চ প্রবর্ত্তনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ॥"
"যুগান্তেহন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা"। ইত্যাদি।

এ পর্য্যন্ত বেদের অপৌরুষেয়তা ও প্রামাণ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত মতবাদ উদ্ধৃত হইল, সে সমুদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে, দার্শনিক ঋষি ও আচার্য্যগণ সকলেই বেদের অপৌরুষেয়তা অবনতমস্তকে মানিয়া লইয়াছেন; এবং স্বস্ব সিদ্ধান্ত-সমর্থনের জন্য নানাবিধ যুক্তি তর্কের অনুসরণ করিয়াছেন। পার্ব্বত্য নদী সমূহ যেরূপ ঋজু-কুটিল নানাপথে প্রস্থিত হইয়াও মহাসমুদ্রে যাইয়া মিলিত হয়, সেইরূপ ঋষিগণও বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মতের অনুসরণ করিলেও বেদের অপৌরুষেয়তাবাদে সকলেই একমত হইতে পারিয়াছিলেন; ইহাই বেদের অব্যাহত প্রামাণ্যবাদের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

আলোচনা।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও ঋষিগণের চিন্তাপদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করিলে স্বতই মনে হয় যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এমনই পবিত্র ও মধুরতাময় একটা সময় আসিয়াছিল, যে সময় ভারতের জনসাধারণ বেদবাক্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি পোষণ করিত; সকলেই বেদবাক্যের অখণ্ডনীয় প্রামাণ্য স্বীকার করিত, এবং অবনত মস্তকে বেদের আদেশ মানিয়া চলিত, ও তাহার অনুশীলনে চিরশান্তিকর জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির অমৃত রসাস্বাদে চিরকৃতার্থ হইত।

কিন্তু উত্তম জলাশয় যেমন দীর্ঘকাল অসংস্কৃত অবস্থায় পতিত থাকিলে ক্রমে তাহাতে বিবিধ বিষকীট প্রাদুর্ভূত হইয়া জলের বিশুদ্ধতা বিধ্বস্ত করিয়া দেয়, এবং যাহারাই তাহাদের সংস্পর্শে আসে, তাহাদেরই জীবন সঙ্কটময় করিয়া তোলে, তদ্রূপ

পবিত্র ভারতক্ষেত্রেও দীর্ঘকাল পরে, সংশয়-সমাকুল নাস্তিকের দল প্রাদুর্ভূত হইয়া বেদবাক্যের অপৌরুষেয়তাবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বেদের অলোকসামান্য মহিমা বিধ্বস্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। যাহারা তাহাদের অসৎ সংসর্গে আসিল, তাহাদিগকেই মঙ্গলময় শান্তির দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভীষণ নরকের পথে পরিচালিত করিতে লাগিল। তাহার ফলে সেই চিরসেবিত বেদবাক্যই তখন লোকের নিকট কতকগুলি অসার অর্থহীন শব্দরাশি বলিয়া উপেক্ষিত হইতে লাগিল। কাহারো নিকট কল্পনাকুশল কবিকুলের উদ্দাম লেখনী-প্রসূত উত্তম কাব্যরূপে বিবেচিত হইল; আবার কাহারো নিকট বা প্রতারণাপটু কপট ব্রাহ্মণগণের জীবিকার্জ্জনের উৎকৃষ্ট উপায়রূপে পর্য্যবসিত হইতে লাগিল। বলা আবশ্যক যে, তখনও উহা অনভিজ্ঞ অজ্ঞ-জনের উচ্ছৃঙ্খল গীতিমাত্র বলিয়া কাহারো নিকটই বিবেচিত হয় নাই। সেই সময় বৈদিকজীবন আর্য্য ঋষিগণ দেশ কাল ও পাত্রানুসারে যখন যেরূপ আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন, তখন তদনুরূপ প্রমাণ প্রয়োগের সাহায্যে প্রতিপক্ষ দমনের বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে—

মহর্ষি কণাদ ও গোতমের সিদ্ধান্তপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, তাঁহারা যে সময় বেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তখনও যেন সংশয়বাদ পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই; তখনও বেদবাক্যের প্রতি জনসাধারণের যে অচলা শ্রদ্ধা ছিল, তাহা যেন একেবারে পুছিয়া যায় নাই, এবং তখনও

ঈশ্বর সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার সাহস অনেকের হৃদয়েই স্থান পায় নাই; কারণ, তাহা হইলে কণাদ কখনই বেদের প্রামাণ্যপ্রতিষ্ঠার জন্য কেবল "তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" মাত্র বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না, এবং গোতমও শুধু 'মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের নজির দেখাইয়া "মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবৎ চ তৎপ্রামাণ্যম্" বলিতে সাহস করিতেন না। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে, সে সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারো মনে বড় একটা সংশয় ছিল না; সুতরাং বেদকে ঈশ্বরবাক্য বলিয়াই অব্যাহতি লাভ করা, তাহাদের পক্ষে বড় অনুচিত মনে হয় না।

গোতমের উদাহৃত মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ যদিও বেদ-বহির্ভূত না হউক, তথাপি ঐরূপ উদাহরণ প্রদর্শনে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নাই। কারণ, বেদে সাধারণতঃ দুই-শ্রেণীর মন্ত্র পরিলক্ষিত হয়; এক দৃষ্টার্থক, অপর অদৃষ্টার্থক। তন্মধ্যে ঐহিক ফলসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে সমুদয় মন্ত্র প্রযুক্ত হয়, সে সমুদয় মন্ত্র দৃষ্টার্থক, যেমন 'শ্যেনযাগ' প্রভৃতিতে প্রযুক্ত মন্ত্রসমূহ। শ্যেনযাগের ফল শত্রুসংহার; তাহা ইহলোকেই দেখিতে পাওয়া যায়; এই জন্য ঐ সমস্ত মন্ত্রকে দৃষ্টার্থক বলা যাইতে পারে'। আর পারলৌকিক ফল লাভের জন্য, যে সমুদয় মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সে সমুদয় মন্ত্র অদৃষ্টার্থক। যেমন, স্বর্গ-ফল লাভের উদ্দেশ্যে 'অশ্বমেধ' যজ্ঞে ব্যবহৃত মন্ত্রসমূহ। স্বর্গলাভ বর্ত্তমান দেহে সম্ভব হয় না, দেহপাতের পরেই হয়; এই জন্য তৎপ্রযুক্ত-মন্ত্রসমূহকে অদৃষ্টার্থক বলিতে পারা যায়।

দৃষ্টার্থক বাক্য ও মন্ত্রসমূহের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কাহারো বিপ্রতিপত্তি বা সংশয় নাই এবং থাকিতেও পারে না; কারণ, চেষ্টা করিলেই উহার ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। আর আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভৈষজ্য-বিজ্ঞান যে, অতি সত্য, সে সম্বন্ধেও কাহারো আপত্তি নাই। যত কিছু বিপ্রতিপত্তি অদৃষ্টার্থক মন্ত্রের সম্বন্ধে। কিন্তু অদৃষ্টার্থক মন্ত্রগুলিও যে, নিশ্চয়ই অপ্রামাণিক বা মিথ্যা, এ কথাও বলিতে পারা যায় না; কাজেই উহা সন্দেহাস্পদ; অথচ যাহার কথার একদেশ নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তাহার সন্দিহ্যমান কথাংশও প্রমাণরূপে পরিগ্রহ করা সুধীসম্মত ও চিরন্তন ব্যবহারসিদ্ধ।

এই কারণেই মহামতি গোতম দৃষ্টার্থক মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের উদাহরণ দ্বারা সমস্ত বেদবাক্যের প্রামাণ্য নিরূপণের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চয়ই যুক্তিবহির্ভূত কার্য্য করেন নাই।

গোতমের মতে বেদ-প্রামাণ্যের ইহাও অপর একটি কারণ যে, বেদপ্রণেতা পরমেশ্বর আপ্ত পুরুষ। আপ্ত অর্থ রাগদ্বেষাদি দোষরহিত। সেই রাগ-দ্বেষাদি দোষ যাহার কস্মিন্ কালেও নাই, তৎপ্রযুক্ত নির্দ্দোষ বাক্য কখনই ভ্রমপ্রমাদাদি দোষদুষ্ট অপ্রমাণ বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যাহারা ঐরূপ পরমেশ্বরের সদ্ভাবে সন্দেহরহিত আস্তিক, তাহাদের পক্ষেই এই সকল কথা সুসঙ্গতও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে, কিন্তু নাস্তিকের পক্ষে নহে। আর যাহারা মন্ত্রের অমোঘ

শক্তি স্বীকারে সঙ্কুচিত অথবা স্থলবিশেষে কখনও বৈফল্য দর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষেও মন্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে সত্য, কিন্তু মন্ত্রসমূহ বাস্তবিক পক্ষেই কি কেবল অসার অর্থহীন কতকগুলি শব্দ মাত্র? তাহা হইলে কখনই উহারা এতকাল পর্য্যন্ত অক্ষত দেহে জীবিত থাকিতে পারিত না। আমার বিশ্বাস, এখনো যদি কেহ শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অনুসরণপূর্ব্বক উপযুক্ত ঋত্বিকের সাহায্যে মন্ত্রপ্রয়োগ করিতে পারে, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তাহাকে যথাযথ ফললাভে ভগ্নমনোরথ হইতে হয় না।

আচার্য্য রামানুজস্বামী শ্রীভাষ্যের এক স্থানে প্রমাণ করিয়াছেন যে, গুরুর নিকটে মন্ত্র শিক্ষাকরা আবশ্যক; কারণ, গুরুমুখীকরণের ফলে মন্ত্রমধ্যে একটা সংস্কার বা শক্তিবিশেষ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা গুরুর সাহায্য না লইয়া স্বীয় প্রতিভাপ্রভাবে মন্ত্র শিক্ষা করেন, তাহাদের অভ্যস্ত মন্ত্রগুলি সেই শক্তিলাভে বঞ্চিত থাকে; এই জন্যই যথাযথভাবে উচ্চারণপূর্ব্বক ক্রিয়ায় প্রযুক্ত হইলেও শক্তিহীন সেই সমুদয় মন্ত্র উপযুক্ত ফলপ্রসবে সমর্থ হয় না। অতএব স্থানবিশেষে বৈফল্যদর্শনেই যে, মন্ত্রের অপ্রামাণ্য বা বিফলতা মনে করা, তাহা সঙ্গত হয় না। যোগদর্শনকার পতঞ্জলি এ সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই বলিয়াছেন; তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও কণাদ ও গোতমের সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ; সুতরাং সে কথার আর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসহীন, তাহাদের সমক্ষে

বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবার অনুরোধ করা বিড়ম্বনা মাত্র। বোধ হয়, তাহাদের প্রবোধের জন্যই সাংখ্যপ্রণেতা কপিল-দেব ঈশ্বরকে অন্তরালে রাখিয়া আপনার অভিমত সিদ্ধান্ত-সংস্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছেন।

তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে, কোন গ্রন্থ কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছে, অতীতের সাক্ষ্যদাতা ইতিহাসই তাহা বলিয়া দেয়। অন্ততঃ কিংবদন্তীও তাহার একটা অস্পষ্ট আভাস প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু যেখানে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব, এবং কিংবদন্তীও কোন কথা বলেনা, সেখানে গ্রন্থের পৌরুষেয়ত্ব বা রচয়িতার নামাদি নিরূপণের প্রয়াস কেবল পণ্ড পরিশ্রম ভিন্ন আর কি হইতে পারে। আজ পর্য্যন্তও যাহার গুরুশিষ্য-সম্প্রদায়ের অত্যন্ত উচ্ছেদ হয় নাই, সেই বেদের যদি কেহ স্বতন্ত্র কর্ত্তা থাকিত, তবে নিশ্চয়ই তাহা সুধীসমাজে অবিজ্ঞাত থাকিত না।

প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে বলিতেছে—"ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্মুখঃ" অর্থাৎ বেদের কেহ কর্ত্তা নাই, স্বয়ং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ইহা স্মরণ করিয়াছিলেন মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, নিদ্রো-ত্থিত লোক যেরূপ পূর্ব্বদিবসের অধীত বিষয়সমূহ পরদিবসে যথাযথভাবে স্মরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ আদি পুরুষ ব্রহ্মাও, পূর্ব্বকল্পে যেরূপ বেদবিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন, সমাধি প্রভাবে তাহার সংস্কার হৃদয়মধ্যে নিহিত থাকায়, সৃষ্টিকালে তিনি যথাযথ ভাবে তাহা স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাহার পর, যে সমস্ত বেদবাক্যে বেদোৎপত্তির আভাষ

পাওয়া যায়, "অস্য বা মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেবদঃ সামবেদঃ" ইত্যাদি, এবং "ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে ছন্দাংসি জজ্ঞিরেঽপি চ" ইত্যাদি, সে সমুদয় বাক্যেও বেদাবির্ভাবেরই কথা মাত্র আছে, কিন্তু তাহার স্রষ্টা বা কর্ত্তার কোন নাম গন্ধও নাই; কাজেই ইহারা বেদকে পৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ।

মহামুনি জৈমিনির সিদ্ধান্তপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যে, সে সময়ে বেদের উপর সংশয়বাদটা যেন অত্যন্ত প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল; সেই কারণেই তাহাকে বেদের অপৌরুষেয়তা-নিরূপণ প্রসঙ্গে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতে হইয়াছিল।

তাহার মতে বেদটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; এক ভাগ লৌকিকার্থবোধক, অপর ভাগ অলৌকিকার্থবোধক। তন্মধ্যে লৌকিক ভাগকে ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভাপ্রসূত বলিয়া কল্পনা করিলেও, অলৌকিক ভাগের সম্বন্ধে সেরূপ কল্পনা করিবার অবসরই ঘটে না; কারণ, লৌকিক বিষয়গুলি দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করাও নিতান্ত অসম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু অলৌকিক অংশে ত আর সে কথা বলিতে পারা যায় না। অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা যে, স্বর্গলাভ হয়, ইহা প্রাকৃত বুদ্ধির অগম্য; সুতরাং প্রাকৃত বুদ্ধিসম্পন্ন লোক আপনার অবিজ্ঞাত বিষয়ে কি করিয়া অপরকে নিয়োজিত করিতে পারে? এবং কিরূপেই বা "স্বর্গকামোঽশ্ব-

মেধেন যজেত” বলিতে সাহস করিতে পারে? এই জন্যই—ভট্ট কুমারিল বলিয়াছেন, অগ্নি যে পুরোহিত, এ কথা মানুষ কিসে জানিতে পারিত? যদি “অগ্নিমীলে পুরোহিতম্” এইরূপ মন্ত্র নিবদ্ধ না থাকিত।—

“অগ্নেঃ পুরোহিতত্বং হি ক্ব দৃষ্টঃ? যেন কার্ত্ত্যতে।
‘ঈলে’ শব্দপ্রয়োগশ্চ ক্ব দৃষ্টঃ স্তোত্রগোচরঃ?
দেবত্বং চাস্য যজ্ঞস্য বিহিতং কোপলক্ষিতম্?
স্বতন্ত্রো বেদ এবৈতৎ কেবলং বক্তুমর্হতি।”

এরূপও কল্পনা করা চলে না যে, অপূর্ব্ব প্রতিভাসম্পন্ন অধস্তন কোন লোক যোগবলে অলৌকিক শক্তিসম্পদ্ লাভ করত ঐ সমস্ত অলৌকিক বিষয় অবগত হইয়া একত্রে সন্নিবেশপূর্ব্বক বেদশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। কারণ, এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই লোকটী যখন যোগানুষ্ঠানেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যোগানুষ্ঠানের পূর্ব্বেও সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই যোগ-মহিমা অবগত ছিল; কারণ, যে যাহা জানে না, তদ্বিষয়ে কখনও তাহার প্রবৃত্তি আসিতে পারে না। যোগবিদ্যা বেদোক্ত; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, সে ব্যক্তি বেদ হইতেই সর্ব্বপ্রথমে যোগমহিমা অবগত হইয়াছিল; সুতরাং যোগপ্রবর্ত্তক বেদকে কখনই যোগের ফল বলিতে পারা যায় না; পরন্তু যোগই বেদ-বিদ্যার প্রকৃষ্ট ফল; অতএব বেদরচনা কখনই যোগসিদ্ধির কার্য্য হইতে পারে না।

আবার সমস্ত বেদের মধ্যে বিভিন্ন ঋষির নামোল্লেখ থাকায় কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, বেদের সেই সমুদয় অংশ সেই সেই ঋষি দ্বারাই বিরচিত হইয়াছিল। এ কথার উত্তরে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, "ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ" ঋষি কথার অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা, রচয়িতা নহে। যে ঋষি যে মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বেদান্তদর্শনপ্রণেতা বেদব্যাসের সিদ্ধান্তও প্রায় এতদনুরূপই বটে; সুতরাং তাহার আর পৃথক্ আলোচনার প্রয়োজন নাই।

শব্দ নিত্য কি, অনিত্য, একথা লইয়া পরস্পরের মধ্যে বিষম বিবাদ থাকিলেও বেদের অপৌরুষেয়তা বিষয়ে কিছুমাত্র মতভেদ ঘটে নাই; কারণ, বেদ যে, অনিত্য হইয়াও অনাদি, এবং পুরুষকৃত হইয়াও অপৌরুষেয়, একথা উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন। আদি-অন্তসম্পন্ন দিবারাত্র যেমন অনাদি, পরম-পুরুষপ্রণীত বেদও তেমনই অনাদি।

ঘনান্ধকারাবৃত রজনীর অবসানে প্রত্যহ যেমন একই সূর্য্য সমুদিত হইয়া আলোকমালা বিস্তার করত লোকলোচন-গোচর হইয়া আনন্দধারা বর্ষণ করেন, তেমনি প্রত্যেক প্রলয়ের অবসানে একই বেদবিদ্যা পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া জ্ঞানালোক বিস্তার করত জগজ্জনের পরম মঙ্গল সাধন করে।

প্রলয়কালে জগতের সমস্ত বস্তু বিধ্বস্ত হইলেও বেদ-বিদ্যার সূক্ষ্ম সংস্কারগুলি থাকিয়া যায়, পুনর্ব্বার নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইলে শব্দ সংস্কাররূপে অবস্থিত সেই বেদরাশি

পুনঃ স্মৃতিপথে উপস্থিত হইয়া, ক্রমে জনসমাজে প্রচারিত হয়; কিন্তু আদি পুরুষ সেই বেদোচ্চারণে কোন প্রকার স্বাধীনতা অবলম্বন করেন না। শ্বাস প্রশ্বাস যেরূপ অযত্নপ্রসূত, বেদবিদ্যাও তদ্রূপ অযত্নপ্রসূত; তজ্জন্যই বেদকে শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় অপৌরুষেয় বলা হইয়া থাকে। এই জন্যই আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—"সজাতীয়োচ্চারণানপেক্ষোচ্চার্য্যত্বং পৌরুষেয়ত্বম্, তদ্ভিন্নত্বম্ অপৌরুষেয়ত্বম্॥"

অর্থাৎ কর্ত্তা স্বেচ্ছামত যে সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করেন, তাহাই পৌরুষেয়, আর যাহার উচ্চারণে কর্ত্তাকে সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বতন উচ্চারণের অনুসরণ করিতে হয়, তাহাই অপৌরুষেয়। সৃষ্টিভেদেও বেদের পরিবর্ত্তন হয় না; প্রত্যেক সৃষ্টিতে একই বেদ একই ভাবে—স্বর, ব্যঞ্জন, বিন্দু বিসর্গাদি সহযোগে একই রূপে উচ্চারিত হয়; এই কারণেই বেদ অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয় বাক্যমাত্রই নির্দ্দোষ; সুতরাং সত্যার্থপ্রকাশক ও স্বতঃ প্রমাণ।

এই যে, অপৌরুষেয়তাবাদ বা আপ্তবাক্যে বিশ্বাস, ইহা কেবল এদেশেই সীমাবদ্ধ নহে; সমস্ত সভ্যজাতির মধ্যেই এইরূপ বিশ্বাসের আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা বাইবেল বা কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থকে প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করেন, তাহারাও ঐ সমস্ত গ্রন্থকে আপ্তবাক্য বলিয়াই বিশ্বাস করেন। তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর পক্ষে এরূপ বিশ্বাস সংস্থাপন করা খুবই স্বাভাবিক। যাহারা প্রথম হইতেই সংশয়-দোলায়

আরোহণপূর্ব্বক কৌতুকমাত্র অনুভব করেন, তাহাদের কোন বিষয়েই তত্ত্বনির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না, বা হইতে পারে না।

বিশেষতঃ যাহা কেবলই একমাত্র অনুভবগম্য; তদ্বিষয়ে তর্কযুক্তির অধিকার অতি অল্পই থাকে। এইজন্য হিন্দুরা বেদকে আপ্তবাক্য ও অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর বেদ যদি অসার বাক্যাড়ম্বরপূর্ণ কেবলই কবিকল্পনা মাত্র হইত, তাহা হইলে বহু কাল পূর্ব্বেই উহার অস্তিত্ব ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত ইহয়া যাইত; অসত্য কথায় আদর অধিক দিন থাকিতে পারে না।

বাইবেল বা কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বেদের বিশেষত্ব এই যে, বেদ অনাদি, স্মরণাতীত কাল হইতে গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে সংরক্ষিত ও সুধীসমাজে সমাদৃত, এবং কে যে, উহার রচয়িতা, তাহা সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত; কিন্তু বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থগুলি কালপরিচ্ছিন্ন অতীতের সাক্ষ্যদাতা ইতিহাসই উহাদের উৎপত্তিকাল ও রচনা-কর্ত্তার পরিচয় প্রদান করিতেছে; সুতরাং ঐ সমুদয় গ্রন্থকে অনাদি অপৌরুষেয় বলিতে পারা যায় না। পৌরুষেয় গ্রন্থের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, ঐ সমুদয় গ্রন্থকর্ত্তা যদি সিদ্ধ পুরুষ হন, তাহা হইলেই তাহাদের গ্রন্থ প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে; পক্ষান্তরে, তাহাদের গ্রন্থ যদি প্রামাণিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলেই তাহাদের

সিদ্ধিলাভের কথাও প্রমাণিত হইতে পারে, ইত্যাদি বহুবিধ বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে। বেদের সম্বন্ধে যে, সে সমস্ত বিতর্ক কেন আসিতে পারে না, সে কথা পূর্ব্বেই বহুবার বলা হইয়াছে।

বেদের অপৌরুষেয়তা বা প্রামাণ্য সম্বন্ধে মোটামোটি যাহা বলিবার, বলা হইল। বেদই সমস্ত বিদ্যার আকর; ছোট বড় সমস্ত নদনদী যেরূপ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া বিভিন্ন দিক্‌পথে প্রস্থান করে, তদ্রূপ উত্তমাধম সমস্ত বিদ্যাই এই বেদ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া নানা আকারে ও নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন প্রস্থানে পরিণত হইয়াছে। মানবের অভিলষিত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের খবর এই বেদ হইতেই পাওয়া যায়; জীব-নিস্তারের একমাত্র উপায়স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যাও এই বেদরূপী কল্পতরুরই অতি মনোহর সৌরভপূর্ণ অপূর্ব্ব কুসুম; যাহার মহনীয় সৌরভে মর জগৎও অমরসুলভ সুধাস্বাদে চির নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, নানা দিগ্‌দেশীয় নদ-নদীসমূহ যেমন বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন পথে গমন করিয়াও অবশেষে অপার বারিধিবক্ষে আত্ম-সমর্পণ করিয়া চিরবিশ্রাম লাভ করে এবং নিজ নিজ নামরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলে মিলিয়া একীভূত হয়; সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রই তেমনভাবে বিভিন্ন মতে ও বিভিন্ন পথে প্রস্থিত হইয়াও, পরিশেষে সেই ব্রহ্মবিদ্যায় আত্ম-সমর্পণ করিয়া বিশ্রাম বা সামঞ্জস্য লাভ করে। তখন শান্তিময় ব্রহ্মবিদ্যার

সংস্পর্শে ধর্ম্ম ও কর্ম্মগত সমস্ত বিরোধ ও বিসংবাদ বিধ্বস্ত হইয়া যায়, এবং সর্ব্বত্র একতা ও সমতা দর্শনের উজ্জ্বল আলোক ফুটিয়া উঠে; অশান্তিময় জগৎ তখন অমৃতময় শান্তিনিকেতনে পরিণত হয়।

যে ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রভাবে সমস্ত শাস্ত্র ও সমস্ত ধর্ম্মের আপাত-প্রতীয়মান বিবাদরাশি একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, অরুণ-কিরণ স্পর্শে নৈশ তমোরাশির মত জীবের অন্তর্নিহিত অজ্ঞানান্ধকার অন্তর্হিত হইয়া যায়, বেদই সেই ব্রহ্মবিদ্যার আকর বা উপলব্ধি স্থান; বেদেতেই আমরা সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মবিদ্যার সহিত পরিচিত হই।

এই ধ্রুব সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যমরাজ প্রশান্তচেত নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন—

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি,
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।"

এবং গীতার প্রবক্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এই মহাসত্য স্মরণ করিয়াই প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ।"

প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সমস্ত বেদের অর্থাৎ বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ ও সংহিতা-ভাগ সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য জীবের নিঃশ্রেয়স-সাধন ব্রহ্মবিদ্যা।

একতান বাদ্যে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র হইতে বিভিন্নাকার ধ্বনি উচ্চারিত হইয়াও, মূলতঃ একই মুখ্য ধ্বনির অনুবৃত্তি ও পরিপুষ্টি সাধন করে, ঠিক তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন বেদের বিভিন্ন অংশে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ইতিহাসাদি বিভিন্ন বিষয় বর্ণিত থাকিলেও, উহারা সকলেই সমভাবে সেই ব্রহ্মবিদ্যারই অনুসরণ, সমর্থন ও পরিপোষণ করিয়া থাকে।

বিশেষ এই যে, বেদেতে যাহা সংক্ষিপ্ত, অন্যত্র তাহাই বিস্তৃত; বেদেতে যাহা অস্ফুট, অন্যত্র তাহাই পরিস্ফুট; অথবা বেদেতে যাহা সূত্রাকারে নিবদ্ধ, অন্যত্র তাহাই ভাষ্যাকারে বিবৃত হইয়াছে মাত্র।

বেদের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার যে, কিরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহা আমরা অতঃপর ক্রমশঃ প্রদর্শন করিব।

এখন প্রথমতঃ বেদ কাহাকে বলে, এবং বেদ কতপ্রকার, এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। বেদশব্দের যৌগিকার্থ চিন্তা করিলে জানা যায় যে, বেদ শব্দটী 'বিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিদ্ধাতুর অর্থ—জ্ঞান (জানা); সুতরাং উহার যোগলব্ধ অর্থ হইতেছে এই যে, ধর্ম্ম, অর্থ, জ্ঞান, কর্ম্ম, বন্ধ, মোক্ষ ও চেতনাচেতন-তত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞেয় বিষয়সমূহ যে শাস্ত্রের সাহায্যে জানিতে পারা যায়, তাহার নাম বেদ। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উক্তপ্রকার যোগার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলিয়াছেন যে, আত্মহিতকর যে সমস্ত উপায় প্রত্যক্ষ বা অনুমানের সাহায্যে

বেদের পরিচয়

জানিতে পারা যায় না; বেদ সেই সমস্ত উপায় জ্ঞাপন করে বলিয়াই বেদের বেদত্ব (১)। কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে প্রায় সকলেই উক্তপ্রকার যোগার্থ গ্রহণে সম্মত হইতে পারেন নাই; সেই কারণে তাহারা পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ দ্বারা বেদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন (২)। তন্মধ্যে শ্রৌত সূত্রকার কাত্যায়ন ও আপস্তম্ব বলিয়াছেন—

"মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ম্।"

অর্থাৎ মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ, এতৎসমষ্টির নাম বেদ। ইহাদের মতে বেদসমষ্টি দুইভাগে বিভক্ত—এক ভাগের নাম মন্ত্র ও অপর ভাগের নাম ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ প্রধানতঃ কর্ম্মকাণ্ড ও সংহিতা নামে পরিচিত এবং বেশীর ভাগ ছন্দোবদ্ধ ও পদ্যাকারে গ্রথিত; আর ব্রাহ্মণ ভাগ প্রধানতঃ ছন্দোবিহীন গদ্যাত্মক এবং জ্ঞানকাণ্ড, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ নামে অভিহিত।

---

(১) "প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন, তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা॥" (যাজ্ঞবল্ক্য।)

(২) বেদ সম্বন্ধে অপর কয়েক জন আচার্য্যের মত প্রদর্শিত হইতেছে,—

(ক) সায়নাচার্য্য বলেন,—"মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মকঃ শব্দরাশির্ব্বেদঃ।" মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক শব্দসমূহের নাম বেদ।

(খ) তার্কিকগণ বলেন—"মীনশরীরাচ্ছেদেন ভগবদ্বাক্যং বেদঃ।" অর্থাৎ মীন শরীরধারী ভগবানের বাক্যের নাম বেদ।

(গ) বেদান্তিগণ বলেন—"ধর্ম্ম-ব্রহ্ম-প্রতিপাদকমপৌরুষেয়ং বাক্যং বেদঃ।" অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদক অপৌরুষেয় বাক্যের নাম বেদ।

(ঘ) তান্ত্রিকগণ বলেন—"অপৌরুষেয়া আগমা বেদাঃ।"
অর্থাৎ অপৌরুষেয় আগমসমূহের নাম বেদ।

নিরুক্তকার যাস্ক ঋষি মন্ত্র-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"মন্ত্রা মননাৎ।" অর্থাৎ যাহা দ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ও তদুপযোগী বিষয় সমূহ জানা যায়, তাহার নাম মন্ত্র। প্রকৃত পক্ষেও মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ও তদুপযোগী দ্রব্য ও দেবতাপ্রভৃতি বিষয়সমূহ স্মৃতিপথে পতিত হইয়া থাকে; সুতরাং নিরুক্তকারের প্রদর্শিত অর্থ সুসঙ্গতই মনে হয়। ইহা ছাড়া "মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ" (লোকে যাহার অর্থ নিরন্তর চিন্তা করিলে পরিত্রাণ পায়, তাহার নাম মন্ত্র) এইরূপও আর একটী অর্থ প্রসিদ্ধ আছে।

মন্ত্র ভাগ।

বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—পরোক্ষকৃত, অপরোক্ষকৃত ও আধ্যাত্মিক (১)। তন্মধ্যে যে সমুদয় মন্ত্রে প্রথম পুরুষানুযায়ী ক্রিয়াপদ থাকে, সে সমুদয় মন্ত্র পরোক্ষকৃত। যে সমুদয় মন্ত্রে মধ্যম পুরুষানুযায়ী ক্রিয়াপদ সন্নিবিষ্ট থাকে, সে সমুদয় মন্ত্র প্রত্যক্ষকৃত। আর যে সমুদয় মন্ত্রে উত্তম পুরুষানুসারে ক্রিয়াপদ বিদ্যমান থাকে, সে সমুদয় মন্ত্র আধ্যাত্মিক মন্ত্র নামে কথিত।

উক্ত মন্ত্র সমূহ পুনশ্চ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারি ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে অর্থানুসারে যে সকল মন্ত্রের ছন্দ ও পাদব্যবস্থা হইয়া থাকে, সেই সকল মন্ত্র ঋক্ (২)।

(১) "তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ—পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্মিক্যশ্চ" ইতি। (নিরুক্ত, দৈবত কাণ্ড)

(২) "তেষামৃক্, যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা।" "গীতিষু সামাখ্যা।" "শেষে যজুঃশব্দঃ" (জৈমিনি সূত্র)॥

যে সকল ঋক্ স্বরসংযোগে গীত হইবার যোগ্য, সেই সমুদয় ঋক্ সাম ; তদ্ভিন্ন অনিয়তাক্ষর পাদযুক্ত যে সমুদয় মন্ত্র, সে সমুদয় মন্ত্র যজুঃনামে অভিহিত ; আর যে সকল মন্ত্র প্রধানতঃ শান্তিক-পৌষ্টিক কর্ম্মে বিনিযুক্ত, সেই সমুদয় মন্ত্র আথর্ব্বণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক যজ্ঞেই অল্পাধিক পরিমাণে উক্ত ত্রিবিধ মন্ত্রই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এবং ক্রিয়াবিশেষে আথর্ব্বণ মন্ত্রও পরিগৃহীত হয়। তন্মধ্যে ঋক্‌মন্ত্রে আহুত দেবতার স্তুতিকর্ত্তা—হোতা, যজুর্মন্ত্রে হবনকারী ঋত্বিক্ অধ্বর্য্যু, আর সামমন্ত্রে দেবতার গুণগায়ক উদ্গাতা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। (১)

প্রত্যেক মন্ত্রেই পৃথক্ পৃথক্ ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা নির্দ্দিষ্ট আছে। মন্ত্রের প্রয়োগ কালে ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতার চিন্তা করা, এবং বিনিয়োগ অর্থাৎ যে মন্ত্র যে কার্য্যে প্রযোজ্য, তাহা জানা আবশ্যক। ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও বিনিয়োগ না জানিয়া মন্ত্র প্রয়োগ করিলে কোন যজ্ঞেরই যথোক্ত ফল লাভ করা যায় না। (২)

---

(১) "ঋগ্‌ভিঃ স্তুবন্তি, যজুর্ভি র্যজন্তি, সামভির্গায়ন্তি" ইতি যাজ্ঞিকাঃ।

(২) বেদাচার্য্যগণ বলেন—

"অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ।
অধ্যাপয়েদ্ যজেদ্বাপি পাপীয়ান্ জায়তে তু সঃ॥
ঋষিং ছন্দশ্চ দৈবতং বিনিয়োগং স্বরং তথা।
অবিদিত্বা প্রযুঞ্জানো মন্ত্রকণ্টক উচ্যতে।" ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া মন্ত্রের স্বর বর্ণ ও মাত্রাদি চিন্তা করাও আবশ্যক।

ঋষি অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা, অর্থাৎ সমাধিশুদ্ধ হৃদয়মধ্যে যে ঋষি যে মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি বলিয়া অভিহিত; কিন্তু কোন ঋষিই কোনও নূতন মন্ত্র রচনা করেন নাই। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন "ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ, নতু কর্ত্তারঃ।" ঋষিশব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থও ঐরূপই। কেন না, ঋষি শব্দটী 'ঋষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ঋষ্ ধাতুর অর্থ—গতি বা প্রাপ্তি; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সমাহিত অবস্থায় যাঁহারা বেদমন্ত্রসমূহ প্রাপ্ত বা অবগত হইয়াছিলেন, তাহারাই ঋষি। স্থলবিশেষে কোন কোন ঋষিকে 'মন্ত্রকৃৎ' বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে সকল স্থলেও, 'মন্ত্রকৃৎ' অর্থ মন্ত্রের রচয়িতা নহে; পরন্তু মন্ত্রের প্রচারকর্ত্তা মাত্র বুঝিতে হইবে।

বৈদিক মন্ত্রের ছন্দঃ অনেকপ্রকার—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্ প্রভৃতি। ছন্দঃ অর্থ আচ্ছাদন। নিরুক্তকার বলিয়াছেন 'ছন্দশ্ছাদনাৎ" অর্থাৎ মন্ত্র ও যজ্ঞকর্ত্তাকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া 'গায়ত্রা' প্রভৃতির নাম হইয়াছে 'ছন্দঃ'; অথবা অগ্নি-সন্তাপ ও পাপকর্ম্ম হইতে রক্ষার্থ কর্ত্তাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে; এই জন্য ইহাদের নাম হইয়াছে 'ছন্দঃ'।(*) ছান্দোগ্যোপ-

---

(*) "ছাদয়ন্তি হ বা এনং ছন্দাংসি পাপাৎ কর্ম্মণঃ।' (আরণ্যকাণ্ড)। "প্রজাপতিরগ্নিমচিনুত; স ক্ষুরপতির্ভূত্বাতিষ্ঠৎ। তং দেবা নোপায়ন্তে, ছন্দোভিরাত্মানং ছাদয়িত্বোপায়ন্তে, তৎ ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্" ইতি।

(তৈত্তিরীয় সংহিতা)।

নিষদে কথিত আছে যে, দেবগণ মৃত্যুভয়ে কাতর হইয়া ত্রয়ী বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বেদোক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর নিকট আত্মগোপন করিবার অভিপ্রায়ে ছন্দঃসমূহ দ্বারা আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন; তাহাই (আচ্ছাদন করাই) ছন্দের ছন্দস্ত্ব অর্থাৎ ছন্দের অসাধারণ ধর্ম্ম(১)। স্বর ও মাত্রাদি বিভাগক্রমে উক্ত ছন্দঃসমূহ বহুভাগে বিভক্ত।

প্রত্যেক মন্ত্রেই ঋষি ও ছন্দের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ দেবতারও নাম নির্দ্দেশ আছে। কর্ম্মকর্ত্তাকে মন্ত্রপ্রয়োগকালে সেই সকল দেবতার চিন্তা করিতে হয়। দেবতা অর্থ দীপ্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম-চৈতন্য। সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যই বিভিন্ন প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকটিত হইয়া দেবতাসংজ্ঞা লাভ করেন (২)। কিন্তু মীমাংসকাচার্য্যগণ মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতা স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে মন্ত্রময় দেবতা; মন্ত্রই দেবতার আকার; তদতিরিক্ত কোন আকার নাই। সেই মন্ত্রময় দেবতাই কর্ম্মের যথোপযুক্ত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। মন্ত্রভেদে দেবতার নাম ও রূপভেদ অনেক প্রকার। যজ্ঞকর্ত্তা কর্ম্মানুষ্ঠানকালে সেই সেই নাম-রূপবিশিষ্ট দেবতার চিন্তা করিবেন। ঋষি, ছন্দঃ ও

---

(১) "দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্; তে ছন্দোভি-রাত্মানমাচ্ছাদয়ন্। যদেভিরাচ্ছাদয়ন্, তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্" ইতি।

(ছান্দোগ্য—১।৪।১)

(২) "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ" ইতি।

(ঋক্ শ্রুতিঃ

দৈবত চিন্তার অত্যাবশ্যকতা জ্ঞাপনের অভিপ্রায়ে আচার্য্যগণ বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিয়াছেন "তস্মাদেতানি মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাৎ"। বেদের মন্ত্রভাগ এইরূপ বহু বিষয়ের অবতারণা করিয়া এবং বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া নিরতিশয় বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে।

মন্ত্র ভাগের ন্যায় ব্রাহ্মণভাগও অতি বিস্তীর্ণ এবং গুরু গম্ভীর বিবিধ বিষয়ে পরিপূর্ণ। যেমন মন্ত্রভাগের প্রধান লক্ষ্য—জীবের অভ্যুদয়সিদ্ধির উপায়ভূত যজ্ঞাদি কর্ম্মনিরূপণ, তেমনি ব্রাহ্মণভাগেরও প্রধান লক্ষ্য হইতেছে—জীবের নিঃশ্রেয়স-সাধন ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদন। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্তই যজ্ঞাদির পারিপাট্য ও অনুষ্ঠানপ্রণালী প্রভৃতি কর্ম্মাঙ্গ বিষয়সমূহও ব্রাহ্মণ-ভাগে বিশেষভাবে সমাদৃত ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ভাগ।

সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ জাতিই বেদাদি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা অর্থ প্রকাশ করেন, এবং শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য সকল সুধীসমাজে প্রচার করেন, সেই প্রকার স্বয়ং বেদও আপনার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তাৎপর্য্যসমূহ যে অংশে প্রকাশ করিয়া কর্ম্ম ও ব্রহ্মের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং জীবনিস্তারের প্রশস্ত পথ—ব্রহ্মবিদ্যা বিবৃত করিয়াছেন, সেই অংশ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়াছে। অতএব সমস্ত ব্রাহ্মণ ভাগকে পূর্ব্বোক্ত ম গুের (সংহিতা ভাগের) ব্যাখ্যাগ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ব্রাহ্মণভাগ আপনার অভিমত উক্ত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত উপনিষদ্, আরণ্যক, ইতিহাস ও সূত্র প্রভৃতি বহু ভাগে

বিভক্ত হইয়া আপনার কার্য্যক্ষেত্র সুপ্রশস্ত ও সুগম করিয়াছে। উক্ত সকল ভাগেরই উদ্দেশ্য এক—সেই সংহিতাভাগের রহস্য প্রকাশন বা ব্রহ্মবিদ্যানিরূপণ। বিশেষতঃ কেবল স্বর্গাদি অভ্যুদয় লাভের উপায়-প্রদর্শনই যে, মন্ত্রভাগের প্রধান লক্ষ্য নহে, ব্রহ্মবিদ্যাই মুখ্য লক্ষ্য, সে কথাও ব্রাহ্মণভাগ নানা প্রকারে বুঝাইয়া দিয়াছে। মন্ত্রভাগের সহিত ব্রাহ্মণভাগের এই প্রকার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, অধ্যাত্মচিন্তা-প্রধান উপনিষদ্ ও আরণ্যক গ্রন্থের মধ্যেও মন্ত্রকাণ্ডোক্ত যজ্ঞ ও যজ্ঞোপকরণাদির চিন্তা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষ এই যে, মন্ত্রকাণ্ডোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্রব্য ও মন্ত্রাদিসাপেক্ষ, আর এ সকল যজ্ঞ দ্রব্যাদিনিরপেক্ষ, শুধু চিন্তাত্মক। উদাহরণস্বরূপে ছান্দোগ্যোক্ত উদ্গীথবিদ্যা ও বৃহদারণ্যকোক্ত অশ্বমেধচিন্তার উল্লেখ করা যাইতে পারে (১)।

ব্রাহ্মণভাগে কর্ম্মানুষ্ঠানের পদ্ধতি বা পারিপাট্য যেমন নিরূপিত হইয়াছে, তেমনি বিধি (নিষেধ), অর্থবাদ ও বিধ্যর্থ-বাদ, এই তিনটী বিষয়ও বিশেষভাবে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং ঐ তিনটী অংশও ব্রাহ্মণভাগের (*) স্বরূপমধ্যেই পরি-

(১) সামসংহিতোক্ত স্তোত্রজাতীয় একটী অংশের নাম উদ্গীথ। প্রসিদ্ধ সোমযাগে উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। উপনিষদে উহা একটী স্বতন্ত্র উপাসনা রূপে বিহিত হইয়াছে। উহাতে যজ্ঞাঙ্গ কোন মন্ত্র বা দ্রব্যের অপেক্ষা নাই, কেবল উদ্গীথ শব্দের উৎ গী ও থ, এই তিনটী অক্ষরের বিভিন্ন প্রকার চিন্তামাত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোক্ত অশ্বমেধও দ্রব্যাদি নিরপেক্ষ কেবল চিন্তাত্মক মাত্র।

* "ব্রাহ্মণমপি ত্রিবিধং বিধিরূপং, অর্থবাদরূপং, তদুভয়বিলক্ষণঞ্চ" ইতি প্রস্থানভেদঃ।

গণিত। বিধি অর্থ ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক বাক্য (†)। বিধির আকার চারি প্রকার—উৎপত্তিবিধি (‡) অধিকারবিধি, বিধিনিয়োগবিধি ও প্রয়োগবিধি। এতদতিরিক্ত আরও কয়েক প্রকার বিধির প্রভেদ স্মৃতিশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। যেমন নিয়ম বিধি ও পরিসংখ্যা-বিধি প্রভৃতি। সে সকলের সম্পূর্ণ আলোচনা এখানে অনাবশ্যক এবং অসম্ভবও বটে (১)।

---

† বিধিশব্দের অর্থ—(ক) জৈমিনির মতে—চোদনালক্ষণো বিধিঃ"। চোদনেতি ক্রিয়ার প্রবর্ত্তকং বাক্যম্‌।" (১।১।—সূত্রভাষ্য)।

(খ) ভট্টমতে—শাব্দী ভাবনা বিধিঃ।

(গ) প্রভাকরমতে—"নিয়োগো বিধিঃ"।

(ঘ) ন্যায়মতে—"ইষ্টসাধনতা বিধিঃ"।

(ঙ) "কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্‌। এতৎ স্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণ।"

(‡) ১। কর্ম্মের যথাযথ স্বরূপবোধক বিধির নাম উৎপত্তিবিধি। ইহার অপর নাম অপূর্ব্ববিধি। যেমন "আগ্নেয়ঃ অষ্টাকপালো ভবতি"।

২। ইতিকর্ত্তব্যতাসহকারে ফলসাধনীভূত কর্ম্মের ফলসম্বন্ধনিরূপক যে বিধি, তাহা অধিকারবিধি। যেমন "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত"।

৩। কর্ম্মাঙ্গবোধক বিধির নাম বিনিয়োগ বিধি। যেমন—ব্রীহিভির্যজেত"।

৪। অঙ্গ ও প্রধানভূত কর্ম্মের যে এক প্রয়োগবিষয়তাবোধক বিধি, তাহাই প্রয়োগবিধি। ইহা প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বোক্ত বিধিত্রয়েরই সম্মিলিতভাবাত্মক।

(১) যাহা দ্বারা অভিপ্রেত বিষয়ে অপ্রবৃত্তি বা অনিয়মে প্রবৃত্তির সম্ভাবনা বারণ করা হয়, তাহার নাম নিয়মবিধি। যেমন—"ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" এই বাক্যে ভার্য্যাগমনে অনিয়মিত প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা হইয়াছে।

আর যাহা দ্বারা কর্ত্তার যথেচ্ছ প্রবৃত্তির সঙ্কোচমাত্র সাধন করা হয়, তাহার নাম পরিসংখ্যাবিধি। যেমন—'পঞ্চ পঞ্চনখান্‌ ভুঞ্জীত"। এস্থলে বুঝিতে হইবে—ভোজন-লোলুপ ব্যক্তিরা ইচ্ছানুসারে যে কোন প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিতে পারিত, উক্ত পাঁচটী মাত্র প্রাণীর মাংস ভক্ষণের বিধি দ্বারা তাহাদের সেই যথেচ্ছ প্রবৃত্তিকে সংযত করা হইল।

অতঃপর অর্থবাদের কথা বলিব। অর্থবাদ প্রথমতঃ দুই প্রকার। এক বিধির স্তাবক বা প্রশংসাপর, অপর নিষেধের নিন্দা প্রকাশক। শুধু শাস্ত্রোক্ত বিধিবাক্যই বিহিত কর্ম্মে সহজে লোকের প্রবৃত্তি সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না, অবসন্ন হইয়া পড়ে; সেই জন্য অর্থবাদ বাক্যের প্রয়োজন হয়। অর্থবাদ বাক্য নানাপ্রকার লোভনীয় ফলপ্রদর্শন দ্বারা বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে লোককে উৎসাহিত ও প্রবর্ত্তিত করে। নিষেধের স্থলেও সেই কথা। শুধু শাস্ত্রীয় নিষেধবাক্যই রাগানুসক্ত লোককে নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না; সেইজন্য অর্থবাদবাক্য নিষিদ্ধ কর্ম্মের নিন্দা দ্বারা লোকের রাগানুবিদ্ধ প্রবৃত্তিতে বাধা প্রদান করে। উক্ত অর্থবাদ আবার প্রকারান্তরে তিন প্রকার। এক গুণবাদ, দ্বিতীয় অনুবাদ, তৃতীয় ভূতার্থবাদ। (১)

এইরূপে বেদের ব্রাহ্মণভাগে সংহিতোক্ত মন্ত্রার্থের বিবৃতি, যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধি, অনুষ্ঠানপ্রণালী ও ইতিকর্ত্তব্যতাপদ্ধতি এবং বিচিত্র উপাখ্যান প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত ও সন্নিবদ্ধ

(১) "বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারন্ধে। ভূতার্থবাদস্তণানাবর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ।"
প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ অর্থপ্রতিপাদক বাক্য গুণবাদ। যেমন "আদিত্যো যূপঃ" যূপ কাষ্ঠের আদিত্যত্ব প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। প্রমাণান্তরসিদ্ধ বিষয়ের বোধক বাক্য অনুবাদ। যেমন—"অগ্নিঃ 'হিমস্য ভেষজম্।" অর্থাৎ অগ্নি যে হিমের ঔষধ (নিবারক), ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং উহা অনুবাদ; আর যাহা প্রমাণান্তর সিদ্ধও নয়, প্রমাণান্তরবিরুদ্ধও নয়, তাদৃশ বিষয়ের প্রতিপাদক বাক্য—ভূতার্থবাদ। যেমন—"ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ"। ইন্দ্র যে বৃত্রাসুরের উদ্দেশ্যে বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, ইহা প্রমাণান্তরসিদ্ধও নয় ও বিরুদ্ধও নয়; সুতরাং ইহা ভূতার্থবাদ।

আছে। তাহার পর আরণ্যক ও উপনিষদ্-গ্রন্থসমূহের মধ্যে, জগৎ, জীব, ব্রহ্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বন্ধ, মোক্ষ ও পরলোকচিন্তা প্রভৃতি সমুন্নত গভীর তত্ত্বসকল এরূপ উত্তমভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহার তুলনা অন্যত্র কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। উপনিষদ্ ও আরণ্যকের কথা পৃথক্‌ভাবে পরে আলোচনা করিব, এখন বেদসম্বন্ধে আরও কয়েকটী সাধারণ কথা বলিতেছি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক উক্ত বেদশাস্ত্র ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। উক্ত চতুর্ব্বিধ বেদবাক্যই ত্রিতন্তুন্যায়ে অবিযুক্তভাবে পরস্পর সম্মিলিত ছিল। অধ্যেতৃবর্গ অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক উহাদের শ্রেণী বিশ্লেষণ করিয়া আবশ্যকমত কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন। কালক্রমে যখন অধ্যেতৃবর্গের সে শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল; বৈদিক অনুষ্ঠানেও বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইল, তখন জগন্মঙ্গলকর পরমকারুণিক ভগবান্ নারায়ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি অবতীর্ণ হইয়া জগতের হিতার্থে সেই অবিযুক্ত বেদরাশিকে বিভক্ত করিয়া চারিটী বেদসংহিতা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিলেন। ভাগবতে কথিত আছে—

"পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশকলয়া বিভুঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগো বেদং চক্রে চতুর্বিধম্॥
ঋগথর্ব্ব-যজুঃসাম্নাং রাশীনুদ্ধৃত্য বর্গশঃ।
একৈকাং সংহিতাং চক্রে সূত্রে মণিগণা ইব॥"

এখানে স্পষ্টই বলা হইল যে, ভগবান্ বেদব্যাস,—পরস্পর সংহতভাবে অবস্থিত ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদকে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া চারিটী বেদসংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ঋগ্বেদ ছন্দোবদ্ধ—পদ্যময়, যজুর্ব্বেদ ছন্দোরহিত—গদ্যাত্মক, সামবেদ—ছন্দঃ ও স্বরসংযোগসম্পন্ন গেয়; আর অথর্ব্ববেদ গদ্য পদ্য উভয়াত্মক; শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম্মে উহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু অথর্ব্ববেদের স্বতন্ত্র সত্তাই নাই; উহা বেদত্রয়েরই অন্তর্গত। কেবল প্রয়োগ-সৌকর্য্যার্থ অথর্ব্ববেদের পার্থক্য গণনা করা হইয়া থাকে মাত্র। অথর্ব্ববেদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই বলিয়াই বেদের একটী সাধারণ নাম 'ত্রয়ী'। 'ত্রয়ী' অর্থ—ঋক্, যজুঃ ও সাম, এই অংশত্রয়ের সমষ্টি বা সমাহার। বোধ হয়, এই কারণেই, যে যে স্থানে বেদের নামোল্লেখ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ স্থলেই 'অথর্ব্ব'কে 'বেদ' শব্দের সহিত সংযোজিত করা হয় নাই। যেমন—ছান্দোগ্যোপনিষদে দেবর্ষি নারদ ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের অধীত বিদ্যার পরিচয় প্রদানসময়ে বলিয়াছিলেন—

"ঋগ্বেদম্ ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং
সামবেদং আথর্ব্বণম্।"

এখানে ঋক্ যজুঃ ও সাম সকলেই 'বেদ' বিশেষণ লাভের অধিকারী হইল; কেবল অথর্ব্ব বেচারীই সে সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত রহিল।

অথর্ব্ববেদকে 'আঁথর্ব্বণম্' মাত্র বলা হইল, কিন্তু বেদপদবীতে স্থান দেওয়া হইল না। এইরূপ বৃহদারণ্যকোপনিষদেও, যে স্থলে বেদাবির্ভাবের কথা বলা হইয়াছে, সে স্থলে অথর্ব্বকে 'বেদ' বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। যথা—

"অস্য বা মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ—
যদ্ ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ।"
ইত্যাদি। (২।৪।১০)

এখানেও ঋক্ যজুঃ সাম, তিনই 'বেদ' শব্দে চিহ্নিত হইয়াছে, কেবল অথর্ব্বই সেই চিহ্ন লাভে বঞ্চিত রহিয়াছে। এইরূপ তৈত্তিরীয় শ্রুতিরও একস্থানে অথর্ব্ববেদের নির্দ্দেশ-স্থলে—"অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছম্" বলিয়া অথর্ব্ববেদের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু সেখানেও 'বেদ' শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। ঋগ্‌বেদীয় পুরুষসূক্তের যেখানে বেদের উল্লেখ রহিয়াছে, সেখানেও 'অথর্ব্ব' শব্দের পরিবর্ত্তে কেবল 'ছন্দঃ' শব্দমাত্রের প্রয়োগ হইয়াছে,—

"তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাদ্ যজুরজায়ত॥"

অর্থাৎ সেই যজ্ঞপুরুষ হইতে ঋক্ যজুঃ সাম ও ছন্দঃ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এখানে সাধারণ বেদবোধক কেবল ছন্দঃ শব্দদ্বারাই অথর্ব্ববেদের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া অন্যত্রও অথর্ব্ববেদকে ‘বেদ’ শব্দে নির্দ্দেশ না করিয়া কেবল ছন্দঃ শব্দে নির্দ্দেশ করিতে দেখা যায়। যথা—

“ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুসা সহ” ইত্যাদি।

এই সকল প্রমাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বেদপর্য্যায়ে অথর্ব্ববেদের কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই; স্বাতন্ত্র্য নাই বলিয়াই বেদের যে সাধারণ সংজ্ঞা ছন্দঃ, সেই ছন্দঃ শব্দেই অথর্ব্ববেদের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে জনক-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে কথিত আছে যে, জনক মহারাজ স্বীয় বিদ্বৎসভাসমক্ষে সুবর্ণমণ্ডিত স্বর্ণ শৃঙ্গ-যুক্ত সহস্র গো সমানয়নপূর্ব্বক সভাস্থ বেদবিৎ পণ্ডিতগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, আপনাদের মধ্যে যিনি বেদবিদ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি এই সমস্ত গোধন গ্রহণ করুন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি আসিয়া এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র স্বীয় শিষ্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন “এতাঃ সোম্যোদজ সামশ্রবঃ” অর্থাৎ হে সোম্য সামশ্রবঃ, তুমি এই সমস্ত গোধন লইয়া যাও।

আচার্য্য স্বামী শঙ্কর এ কথার ব্যাখ্যাস্থলে বলিয়াছেন যে, “সামশ্রবাঃ সামবিধিং হি শৃণোতি, অতঃ অর্থাৎ চতুর্ব্বেদো যাজ্ঞবল্ক্যঃ।” অর্থাৎ শিষ্য যখন সামশ্রবাঃ, তখন নিশ্চয়ই সে যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট সামবেদোক্ত বিধিবিধানসমূহ শ্রবণ (অধ্যয়ন) করিতেছে; অতএব ফলেফলে যাজ্ঞবল্ক্য যে, চতুর্ব্বেদজ্ঞ, ইহা সূচিত হইল।’ টীকাকার আনন্দগিরি এই কথার এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন,—

"যতো যাজ্ঞবল্ক্যাদ্ যজুর্ব্বেদবিদঃ সকাশাৎ ব্রহ্মচারী সামবিধিং শৃণোতি; ঋক্ষু চাধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে; ত্রিষ্বেব চ বেদেষু অন্তর্ভূতোঽথর্ব্ববেদঃ; তস্মাৎ + + + বেদচতুষ্টয়াভিজ্ঞো মুনিঃ ইত্যাহ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যে, যজুর্ব্বেদে পরম পণ্ডিত, ইহা সুপ্রসিদ্ধ। যেহেতু সেই যজুর্ব্বেদবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ব্রহ্মচারী (তাহার শিষ্য) সাম বিধি অধ্যয়ন করিতেছে; এবং যেহেতু ঋক্ সমূহই স্বরসংযোগে সামরূপে গীত হইয়া থাকে, এবং যেহেতু প্রচলৎ অথর্ব্ববেদটী ঋক্ যজুঃ ও সাম, এই বেদত্রয়েরই অন্তর্গত; সেই হেতু বুঝা যাইতেছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য মুনি চতুর্ব্বেদেই পণ্ডিত।

এই সমস্ত প্রামাণিক বাক্য পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতীত হয় যে, অথর্ব্ববেদের পৃথক্ সত্তা নাই, উহা বেদত্রয়েরই অন্তর্গত। অতএব বেদের সংখ্যা যে, মূলতঃ তিনের অধিক নহে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বোধ হয়, এই সমস্ত কারণ দর্শনেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী এবং তাহাদের মতানুগামী এদেশেরও কেহ কেহ মনে করেন যে, অন্যান্য বেদ বিরচিত হইবার বহুকাল পরে, এমন কি, ব্রাহ্মণ ভাগেরও পরে অথর্ব্ববেদ বিরচিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাদের ঐরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন বা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, প্রথমতঃ বেদসমূহের পৌর্ব্বাপর্য্য-নির্দ্ধারণের উপযোগী কোনও প্রকৃষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। যাহা কিছু আছে, তাহাও কেবল 'বোধ হয়' বা 'সম্ভবতঃ' প্রভৃতি কতগুলি সংশয়সঙ্কুল

অসার শব্দ মাত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়তঃ বেদের পুরাবৃত্ত যেরূপ নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, আধুনিক ইতিহাসের ক্ষীণতর আলোক-বর্ত্তী সে অন্ধকার অপনয়নে কখনই সমর্থ হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাসসমূহ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে যে, বেদরাশি প্রথমে অবিভক্ত অবস্থায় ছিল, পরে ভগবান্ বেদব্যাস আবির্ভূত হইয়া,—মহামতি ভট্টোজি দীক্ষিত যেরূপ পাণিনিকৃত অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রসমূহ সুনিয়মে যথাস্থানে স্থাপন করত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' প্রণয়ন করিয়াছেন, সেইরূপ বিশৃঙ্খল ভাবে সন্নিবদ্ধ বেদরাশিকে পৃথক্ করিয়া সুশৃঙ্খল ভাবে যথাস্থানে সংস্থাপনপূর্ব্বক ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব নামে চারিটী সংহিতা সংকলন করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তিনি উহাদের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করেন নাই।

বিশেষতঃ আরণ্যকে ও উপনিষদে, এমন কি, অতি প্রাচীন(১) শতপথ ব্রাহ্মণেও যখন অথর্ব্ববেদের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন কিরূপে বলিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণভাগেরও পরে অথর্ব্ববেদ বিরচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল! বস্তুতঃ অথর্ব্ববেদও অন্যান্য বেদের সমকালীন অনাদিসিদ্ধ; ভগবান্ বেদব্যাস কেবল সে সকলের বিভাগ সম্পাদন করিয়াছেন মাত্র।

(১) যাহারা বেদকে মনুষ্যপ্রণীত বলিয়া মনে করেন, তাহাদের মতেও 'শতপথ ব্রাহ্মণ' গ্রন্থ অতি প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত! আমাদের মতে কিন্তু উহাও অনাদিসিদ্ধ বেদভাগই।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—

"এক এব যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।"

অর্থাৎ অগ্রে গদ্য-পদ্যমিশ্রিত একমাত্র 'যজুর্ব্বেদ' নামেই বেদসমষ্টি পরিচিত ছিল, পরে ভগবান্ বেদব্যাস সেই যজুর্ব্বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নাম প্রদান করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে আরও কথিত আছে যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তু এই শিষ্য চতুষ্টয়ের সাহায্যে বেদবিভাগ সম্পাদন করিয়া 'বেদব্যাস' এই পবিত্র উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। বেদব্যাস বেদবিভাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি বেদবিদ্যার প্রচার ও বিস্তারের জন্য উপযুক্ত পাত্রে তাহার বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। পৈলনামক শিষ্যকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তুকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

বেদের শাখা বিভাগ

ব্যাসশিষ্য পৈলের আবার দুই জনশিষ্য প্রধান—বাস্কল ও ইন্দ্রপ্রমিতি। তন্মধ্যে বাস্কলের শিষ্য সাত জন। তাহারা প্রত্যেকে এক একটী বেদশাখা অধ্যয়ন ও তাহার প্রচার করেন। পৈলশিষ্য ইন্দ্রপ্রমিতি নিজ গুরুর নিকট যে ঋক্‌সংহিতা পাইয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ স্বপুত্র মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন করান। তিনি আবার বেদমিত্র ও শাকপূর্ণী নামক

দুই শিষ্যকে ঐ ঋক্‌সংহিতা শিক্ষা করান। শাকপূর্ণীর আবার তিন শিষ্য ক্রোঞ্চ, বেতালিক ও বলাক। বেদমিত্রের পাঁচ শিষ্য—মুদ্‌গল, গালব, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির। ইহারা প্রত্যেকেই ঋক্‌সংহিতার এক একটী প্রশাখার প্রবর্ত্তক। (*)

এইরূপ শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে বেদরূপ মহীরূহের বিস্তর শাখা প্রশাখা প্রাদুর্ভূত হইয়া ত্রিতাপ-তাপিত জীবগণকে শীতল ছায়ায় শান্তি দান করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ঋক্‌শাখার মধ্যে পাঁচটী শাখা প্রধান ও প্রসিদ্ধতর—শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন ও মাণ্ডুকায়ন। বলা আবশ্যক যে, বেদপারায়ণপরায়ণ ভিন্ন ভিন্ন ঋষির নামানুসারে ঐ শাখাসমূহের উক্তপ্রকার নামকরণ করা হইয়াছে।

সমস্ত ঋগ্বেদসংহিতার মণ্ডলসংখ্যা দশ, অনুবাকসংখ্যা পঁচাশী, সূক্তসংখ্যা এক হাজার আঠার, অষ্টকসংখ্যা আট, অধ্যায়সংখ্যা চৌষট্টী এবং বর্গসংখ্যা দুই হাজার ছয় নির্দ্দিষ্ট আছে (১)। বেদ-পারায়ণ কার্য্য প্রায়শঃ যথোক্ত বিভাগানুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

---

* বর্ত্তমান সময়ে যে, ঋগ্‌বেদ সংহিতা মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহা শৈশিরীয় শাখার অন্তর্গত ; কেহ কেহ আবার ইহাকে 'শাকল' শাখার অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়াও মত প্রকাশ করেন।

(১) "অধ্যায়াঃ স্যুশ্চতুঃষষ্টির্মণ্ডলানি দশৈব তু।
বর্গানাং পরিসংখ্যানং দ্বে সহস্রে ষড়ুত্তরে॥" (চরণব্যূহ)

বলা আবশ্যক যে, মণ্ডলাদির উল্লিখিত সংখ্যাসম্বন্ধে যথেষ্ট বিপ্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়।

সংহিতার ন্যায় ব্রাহ্মণভাগেও আটপ্রকার বিভাগ প্রসিদ্ধ আছে। ১। শাকল ব্রাহ্মণ; ২। বাস্কল ব্রাহ্মণ; ৩। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ; ৪। ঐতরেয় আরণ্যক; ৫। সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ; ৬। কৌষীতকী ব্রাহ্মণ, ৭। কৌষীতকী আরণ্যক, ৮। মাণ্ডূক্যোপনিষদ্। প্রায় প্রত্যেক সংহিতানুসারেই পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ নির্দ্দিষ্ট আছে। এ বিষয়ের আলোচনা পরে করা হইবে।

যজুর্ব্বেদ।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, ঋক্ ও সামবেদে যেরূপ ছন্দোবদ্ধ পাদব্যবস্থা আছে, যজুর্ব্বেদে সেরূপ কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই। যজুর্মন্ত্রে গদ্য পদ্য উভয়ই দৃষ্ট হয়। এইজন্য জৈমিনি মুনিও "শেষে যজুঃ" বলিয়া যজুর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং তাহাই যজুর্ব্বেদের সাধারণ লক্ষণ বুঝিতে হইবে। (২)

উক্ত যজুর্ব্বেদ দুইভাগে বিভক্ত—কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ ও শুক্ল যজুর্ব্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অপর নাম তৈত্তিরীয়সংহিতা ও শুক্ল যজুর্ব্বেদের অপর নাম বাজসনেয়ী সংহিতা। শুক্ল যজুর্ব্বেদের প্রারম্ভেই কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমা তিথি গৃহীত হইয়াছে; সেই হেতু উহার নাম হইয়াছে—শুক্ল যজুর্ব্বেদ; আর কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের প্রারম্ভেতে কর্ম্মানু-

---

(২) যজুর্ব্বেদে আদৌ ছন্দ নাই বলিয়া যাহারা বলেন, তাহাদের কথা ঠিক নহে। যজুর্মন্ত্রও স্থলবিশেষে ছন্দোবদ্ধ আছে; কিন্তু সকল কর্ম্মে সে সমুদয় ছন্দের উল্লেখ করা আবশ্যক হয় না, এই মাত্র বিশেষ।

ষ্ঠানোপযোগী কৃষ্ণা প্রতিপদ্‌সংযুক্ত পূর্ণিমা পরিগৃহীত হইয়াছে; এইজন্য উহার নাম হইয়াছে—কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ; এবং যাজ্ঞবল্ক্যের পরিত্যক্ত যজুর্ব্বেদকে ঋষিগণ তিত্তিরিপক্ষীরূপ ধারণপূর্ব্বক গ্রহণ ও প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া উহার আর এক নাম হইয়াছে—তৈত্তিরীয় সংহিতা। (১)

যজুর্ব্বেদের শাখা-সংখ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। নিরুক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা দুর্গাচার্য্যের মতে ঋগ্বেদের একুশ, যজুর্ব্বেদের একশত, সামবেদের সহস্র, আর অথর্ববেদের নয়টী মাত্র শাখা হয়। কূর্ম্মপুরাণেও এইরূপ সংখ্যাই নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু

---

(১) এ সম্বন্ধে একটী বিচিত্র আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে—

একদা সুমেরুশিখরে ব্রহ্মবিদ্‌ ঋষিগণের একটী সমাজ বা সম্মিলনীর ব্যবস্থা হয়; এবং তদুপলক্ষে পত্রদ্বারা ঘোষণা করা হয় যে,—

"ঋষির্যশ্চ মহামেরৌ সমাজে নাগমিষ্যতি।
তস্য বৈ সপ্তরাত্রংতু ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি॥"

এই প্রকার ঘোষণাসত্ত্বেও মহর্ষি বৈশম্পায়ন ঘটনাক্রমে সেই ঋষি-সমাজে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সেই অপরাধেই যেন সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার ব্রহ্মহত্যার পাপ সংঘটিত হয়। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বৈশম্পায়ন সেই পাপক্ষালনের নিমিত্ত স্বীয় শিষ্যগণকে তপশ্চরণে নিয়োজিত করিলেন। তৎকালে যাজ্ঞবল্ক্য তথায় অনুপস্থিত ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যাগত হইয়া গুরুর অবস্থা অবগত হইলেন, এবং বলিলেন, গুরুদেব, আপনি যে সকল শিষ্যকে তপশ্চরণে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা সকলেই হীনবীর্য্য ক্ষীণশক্তি। দীর্ঘকালেও তাহাদের দ্বারা আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, আমি একাকী অল্পকালের মধ্যেই আপনার অভীষ্ট

চরণব্যূহ নামক গ্রন্থে যজুর্ব্বেদের ৮৬টী শাখা উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ছয়টামাত্র কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের, আর অবশিষ্ট শাখাগুলি শুক্ল যজুর্ব্বেদের। সেই সকল শাখার মধ্যে দ্বাদশটী শাখা প্রধান— চরক ;আহ্বায়ক ; কঠ, প্রাচ্য কঠ, কপিষ্ঠল কঠ, চারায়ণীয়, রাণায়ণীয়, বার্ত্তান্তবীয়, শ্বেতাশ্বতর, ঔপমন্যব, পাতাণ্ডনীয়, মৈত্রায়ণীয়। এইরূপে যজুর্ব্বেদের শাখাসংখ্যা সমষ্টিতে একশত

সাধন করিব। বৈশম্পায়ন ঋষি পুনঃ পুনঃ বারণ করিয়াও যখন যাজ্ঞবল্ক্যের ধৃষ্টতা নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন ক্রোধভরে যাজ্ঞবল্ক্যকে—

"ইত্যুক্তো গুরুরপ্যাহ কুপিতো যাহ্যলং ত্বয়া।
বিপ্রাবমন্ত্রা শিষ্যেণ, মদধীতং ত্যজাশ্বিতি॥"

তুমি যখন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছ, তখন তুমি আমার শিষ্যের উপযুক্ত নহে। অতএব তুমি আমার নিকট অধীত সমস্ত বেদবিদ্যা অবিলম্বে প্রত্যর্পণ কর। তেজস্বী যাজ্ঞবল্ক্যও বিরক্তিসহকারে সমস্ত যজুর্ব্বেদ উদ্গীরণ করিলেন। বেদের এরূপ অপব্যবহার দর্শনে ব্যথিতচিত্ত ঋষিগণ তিত্তিরিপক্ষীর রূপ ধারণপূর্ব্বক পরিত্যক্ত বেদরাশি গ্রহণ করিলেন, এবং শিষ্যগণকে উপদেশ দিলেন। তিত্তিরি কর্ত্তৃক এইরূপে গৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া উহার নাম হইল 'তৈত্তিরীয় সংহিতা।'

এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বেদত্যাগের পর বিদ্যাহীন জীবনকে ঘৃণিত মনে করিয়া—সূর্য্যদেবের আরাধনায় নিরত হইলেন। সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে যে বেদবিদ্যার উপদেশ দেন, তাহার নাম হইল শুক্লযজুর্ব্বেদ। ইহার অপর নাম বাজসনেয়ী সংহিতা।

দাঁড়াইয়াছে। (১) তন্মধ্যে এখন যে সমুদয় শাখা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে তিনটী মাত্র শাখা প্রধান—শুক্ল যজুর্ব্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখা এবং কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখা। এই তৈত্তিরীয় শাখা আবার ঔখেয় ও খাণ্ডিকেয় নামক দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের চল্লিশটী অধ্যায় মাধ্যন্দিনী শাখা নামে পরিচিত। দিবসের মধ্যভাগে তদুক্ত কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; এই জন্য ঐ অংশের নাম 'মাধ্যন্দিন' হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—মধ্যন্দিননামক যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্য ঐ অংশে লব্ধবিদ্য হইয়াছিলেন; এই কারণে উহার মাধ্যন্দিন নাম হইয়াছে। উহার প্রথম অধ্যায়ে দর্শপূর্ণমাস যাগের বিধান উক্ত আছে; দ্বিতীয় অধ্যায়ে দর্শপূর্ণমাস যাগের মন্ত্র ও পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; তৃতীয় অধ্যায়ে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ও তদঙ্গ অগ্নিচয়ন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে; চতুর্থ হইতে অষ্টম অধ্যায় পর্য্যন্ত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের বিধিব্যবস্থা কথিত আছে; নবমে রাজসূয় যজ্ঞের ও দশমে সৌত্রামণিনামক যজ্ঞের বিধি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; একাদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অগ্নিচয়ন সম্বন্ধে সমস্ত কথা বিস্তৃত ভাবে কথিত হইয়াছে; ঊনবিংশ অধ্যায় হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ ও তৎ-

---

"(১) একবিংশতিভেদেন ঋগ্বেদং কৃতবান্ পুরা। শাখানাং তু শতেনাথ যজুর্ব্বেদমকল্পয়ৎ সামবেদং সহস্রেণ শাখানাং চ বিভেদতঃ। অথর্ব্বাণমথো বেদং বিভেদ নবকেন তু॥"

(কূর্ম্ম পুরাণ ৪০ অধ্যায়)।

সম্পর্কিত বিধি ও প্রয়োজন প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ষড়্‌বিংশ (ছাব্বিশ) হইতে ঊনচল্লিশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সর্ব্বমেধ ও পুরুষমেধ, পিতৃমেধযজ্ঞের বিধিব্যবস্থা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; এবং যজ্ঞ-সম্পর্কিত অন্যান্য অনুক্ত বিষয়সমূহও অতি বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই জন্য এই অংশকে যজুর্ব্বেদের পরিশিষ্ট ভাগ বলিয়া অনেকে বর্ণনা করিয়া থাকেন। শুক্ল যজুর্ব্বেদের অবশিষ্ট চল্লিশ অধ্যায়টীতে ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপিত হওয়ায় এবং প্রথমেই 'ঈশা' শব্দ প্রযুক্ত থাকায় ঐ অধ্যায়টী 'ঈশা-উপনিষদ্' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতামধ্যে কাণ্ডসংখ্যা—৭, প্রপাঠক বা প্রশ্নসংখ্যা—৪৪, অনুবাকসংখ্যা ৬৪০, এবং মন্ত্র সংখ্যা—২১৮৪ মাত্র সন্নিবদ্ধ আছে (১)। তন্মধ্যে প্রথম কাণ্ডে প্রপাঠকসংখ্যা—৮, অনুবাকসংখ্যা—১৪০, মন্ত্রসংখ্যা ৩৩২। দ্বিতীয় কাণ্ডে প্রপাঠকসংখ্যা ৬, অনুবাক সংখ্যা ৭৫, মন্ত্র সংখ্যা ৩৮৪। তৃতীয় কাণ্ডে প্রপাঠক সংখ্যা ৫, অনুবাকসংখ্যা ৫৫, মন্ত্রসংখ্যা ২০৬। চতুর্থ কাণ্ডে প্রপাঠকসংখ্যা ৭, অনুবাকসংখ্যা ৮১, মন্ত্র-সংখ্যা ২৭৫। পঞ্চম কাণ্ডে প্রপাঠকসংখ্যা ৭, অনুবাক সংখ্যা ১২০, মন্ত্র সংখ্যা ৪০৩। ষষ্ঠকাণ্ডে প্রপাঠকসংখ্যা ৬, অনুবাকসংখ্যা ৬৬, মন্ত্র সংখ্যা ৩৩৩। সপ্তম কাণ্ডে প্রপাঠক সংখ্যা ৫, অনুবাক-সংখ্যা ১০৭, মন্ত্র সংখ্যা ২৫১।

(১) "কাণ্ডাস্তু সপ্ত বিজ্ঞেয়াঃ প্রশ্নাশ্চাধিককাশ্চতুঃ। চত্বারিংশত্তু বিজ্ঞেয়া অনুবাকাঃ শতানি ষট্॥" (১) তৈত্তিরীয় সংহিতা সায়ন ভাষ্যধৃতা)

শুক্ল যজুর্ব্বেদ অপেক্ষা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতা অনেক বৃহৎ। বলা আবশ্যক যে, সংহিতোক্ত কাণ্ডসংখ্যাদি বিভাগ-বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তদনুসারে কাণ্ডাদির বিভাগ, ও সংখ্যারও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সমগ্র যজুর্ব্বেদ উক্ত উভয় ভাগে বিভক্ত হইয়া বৃহদায়তন পরিগ্রহ করিয়াছে। যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র সমূহ প্রায় সমস্ত বৈদিক কর্ম্মেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যজুর্ব্বেদের মধ্যে প্রায় দ্বিসহস্র ঋক্-মন্ত্র সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায় (১)। সাধারণতঃ সেগুলিও যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র বলিয়াই জনসমাজে পরিচিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতঃপর সামবেদের কথা বলা হইতেছে।—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঋকের সহিত সামবেদের মূলতঃ প্রভেদ অতি অল্প। সামবেদের শাখাসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; সমষ্টিতে এক সহস্র। সামবেদপ্রবক্তা প্রথম আচার্য্য জৈমিনি। তাঁহার প্রধান শিষ্য দুইজন—সুমন্তু ও সুকর্ম্মা। সুকর্ম্মার আবার দুই শিষ্য—হিরণ্যনাভ ও পৌষিঞ্জি। হিরণ্যনাভের শিষ্য কৃতী। কৃতী চব্বিশটী সামশাখা বিস্তার করেন। হিরণ্যনাভের আরও ত্রিশ-জন শিষ্য ছিল; তাহাদের মধ্যে পনের জন প্রাচ্য সামগ, আর পনের জন উদীচ্য সামগ ছিলেন। ইহারা সকলেই এক একটী সামশাখার প্রবর্ত্তক বা প্রচারক। পৌষিঞ্জির শিষ্য পাঁচ জন—

---

(১) "দ্বে সহস্রে শতে ন্যূনে মন্ত্রে বাজসনেয়কে।
ঋগ্‌গণাঃ পরিসংখ্যাতাস্ততোঽন্যানি যজূংষি চ॥
অষ্টৌ শতানি সহস্রাণি চ।" ইত্যাদি (চরণব্যূহ)

লোগাক্ষী, কুথুমী, কুশীদি, লাঙ্গলি ও কুল্য। ইহারা প্রত্যেকেই এক একটী পৃথক্ সামশাখা গ্রহণ ও প্রচার করিয়াছিলেন। এখন সে সকল শাখার মধ্যে প্রধানতঃ একমাত্র কৌথুমী শাখারই বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

কথিত আছে যে, সামবেদ-সংহিতা পুরাকালে সহস্র শাখায় বিস্তৃতি লাভ করিয়া অপূর্ব্ব গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্র অধ্যেতৃবর্গের অনাচার দোষে কুপিত হইয়া, বজ্রাগ্নি দ্বারা তাহার অধিকাংশ শাখাই দগ্ধ করিয়াছিলেন; সুতরাং সেই সমুদয় শাখার পরিচয় পাওয়া অসম্ভব। এই কারণে এবং অসম্ভব বোধে সামবেদের অধ্যায় ও প্রপাঠকাদি বিভাগ বিষয়ে আলোচনা পরিত্যক্ত হইল। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, অথর্ব্ব-বেদ মূলতঃ বেদত্রয়েরই অন্তর্গত; প্রধানতঃ শান্তিক পৌষ্টিক কর্ম্মে প্রযোজ্য। বেদব্যাস সেই সমুদয় অংশ পৃথক্ করিয়া অথর্ব্ব-বেদ নামদিয়াছেন মাত্র। অথর্ব্ববেদের শাখাসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম, সমষ্টিতে নয়টি মাত্র। অথর্ব্ববেদাচার্য্য সুমন্তুর একমাত্র শিষ্য ছিলেন; তাহার নাম কবন্ধ। কবন্ধের দুই শিষ্য—দেবদর্শ ও পথ্য। তন্মধ্যে পথ্যের তিন শিষ্য—জাবালি, কুমুদ ও শৌনক। ইহারা প্রত্যেকে এক একটী বেদ শাখার প্রবর্ত্তন করেন। অথর্ব্ববেদের যে শাখাটী এখনও প্রচলিত আছে, তাহা এই শৌনক শাখা। দেবদর্শের শিষ্য চারিজন; পিপ্পলাদ ঋষি তাহাদের অন্যতম। তিনি যে শাখার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, শুনিতে পাই, কাশ্মীর প্রদেশে এখনও নাকি তাহা প্রচলিত আছে।

পুরাকালে, বিভক্ত বেদশাখাগুলির দেশভেদে অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল; সকল শাখাই সকল দেশে অধীত বা অধ্যাপিত হইত না। 'চরণব্যূহ' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বিখ্যাত নর্ম্মদা নদীকে মধ্যরেখা কল্পনা করিয়া, তাহার উত্তর ও দক্ষিণ ভাগবর্ত্তী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শাখার প্রচলন ছিল। সুখের বিষয় এই যে, সেই সমুদয় পরিগণিত দেশের মধ্যে, বেদবিধুর এই বঙ্গদেশও বাদ পড়ে নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন সে কথা কেবল পুস্তকে পড়িয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে হয় মাত্র; কার্য্যতঃ কিছুই হয় না।

উপরে যে সমস্ত শাখাবিভাগ বর্ণিত হইল, সে সমুদয় বিভাগ পুস্তকে পরিদৃষ্ট হইলেও এখন আর প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই। হয় কালচক্রের অমোঘ আবর্ত্তনে একেবারে নিষ্পিষ্ট হইয়াছে, না হয় কোথাও অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া শুভ সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে।

বেদ শাখার এইরূপ দুরবস্থা যে, বর্ত্তমান সময়েই সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নহে। আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই এই শাখবিলোপের সূত্রপাত হইয়ছে। মহামতি বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যমধ্যে এক স্থানে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,

"সা চ শ্রুতিঃ কাললুপ্তাপি আচার্য্যবাক্যাদবগম্যতে"।

অর্থাৎ সাংখ্যসূত্রমধ্যে যেরূপ শ্রুতির মর্ম্ম নির্দ্দেশ রহিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে যদিও সেরূপ শ্রুতি প্রত্যক্ষ না হউক, তথাপি

আচার্য্য কপিলদেবের উক্তি হইতে ঐরূপ শ্রুতির তাৎকালিক সদ্ভাব অনুমিত হয়।

ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই বিশাল বেদতরুর শাখাসমূহে ক্ষয়রোগ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এবং একে একে প্রায় অধিকাংশ শাখাই বিলুপ্ত হইয়া এখন কয়েকটী শাখা কেবল নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও যে, দীর্ঘকাল অক্ষত অবস্থায় অবস্থান করিবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বহু কারণে এইরূপ শাখাবিলোপ সম্ভাপিত হইলেও, ভারতে বেদবাহ্য নব নব উপধর্ম্মের অভ্যুদয় ও আধিপত্যও যে, ইহার অন্যতম কারণ, ইহা মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সম্মিলিত গ্রন্থের নাম বেদ; সুতরাং ব্রাহ্মণ-বিযুক্ত কোনও সংহিতা নাই, থাকিতেও পারে না। প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গেই এক বা ততোধিক ব্রাহ্মণ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। যেমন ঋক্‌বেদের ব্রাহ্মণ ঐতরেয়; শুক্ল যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ শতপথ ব্রাহ্মণ; সামবেদের ছান্দোগ্য ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ; আর অথর্ব্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণ। শাখাভেদে এইরূপ আরও বহু বিভাগ পরিকল্পিত আছে।

প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে যেমন ব্রাহ্মণ ভাগ সংযুক্ত আছে, তেমনি ব্রাহ্মণের সঙ্গেও আবার ভিন্ন ভিন্ন আরণ্যক সংযোজিত রহিয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঐতরেয় আরণ্যক; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের বৃহদারণ্যক এখনও বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত রহিয়াছে।

তদ্ভিন্ন অনেক ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগই বিলুপ্ত হইয়াছে। তথাপি যে কয়েক খানি ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক গ্রন্থ এখনও অবশিষ্ট আছে, সে সমস্ত গ্রন্থ রক্ষণকল্পেও সকলের যত্নশীল হওয়া আবশ্যক।

যেমন প্রত্যেক ব্রাহ্মণের সহিত পৃথক্ পৃথক্ আরণ্যক সংবদ্ধ আছে, তেমনি প্রত্যেক ব্রাহ্মণের সঙ্গেও ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ্ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। যেমন 'কেন' উপনিষদ্ তলাবকার ব্রাহ্মণের শেষ নবম অধ্যায়; কঠোপনিষদ্ কঠ ব্রাহ্মণের শেষাংশ; ঐতরেয় উপনিষদ্ ঐতরেয় আরণ্যকের শেষ পাঁচ অধ্যায়; তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের শেষ তিন অধ্যায়; বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ ছয় অধ্যায়, এইরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের শেষাংশে অবস্থিত। অন্যান্য উপনিষদ্ সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে।

প্রাচীন ঋষিগণ, যেমন জলময়ী গঙ্গার, তেজোময় সূর্য্যের, ও শিলাময় পর্ব্বত প্রভৃতির অধিদেবতা কল্পনা করিয়াছেন, বেদ-চতুষ্টয়ের সম্বন্ধে ও তাঁহারা সে নিয়মের অন্যথা করেন নাই। তাহারা বেদ চতুষ্টয়েরও এক একটী পৌরুষেয় রূপ কল্পনা করিয়া তাহার হস্ত, মস্তক ও চক্ষু কর্ণাদি অবয়ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যেমন ঋগ্বেদের চক্ষু পদ্মপত্রাকৃতি, গ্রীবা সুঘটিত, কেশ ও শ্মশ্রু আকুঞ্চিত; দৈর্ঘ্য সার্দ্ধদ্বিহস্ত; অত্রিগোত্র, দেবতা চন্দ্র; ছন্দঃ গায়ত্রী; যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদের সম্বন্ধেও এইরূপ স্বতন্ত্র আকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ রূপকল্পনার যে, প্রকৃত

উদ্দেশ্য কি, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ স্বয়ংই বুঝিতে চেষ্টা করিবেন।

উল্লিখিত বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্নিহিত আছে। অনুসন্ধান করিলে সহজেই তাহা ধরা যায়। ব্রাহ্মণ ভাগের ত কথাই নাই; মন্ত্র বা সংহিতাভাগের মধ্যেও ব্রহ্মবিদ্যার কথা কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও বা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। বেদোক্ত দেবীসূক্ত, পুরুষসূক্ত ও মৎস্যসূক্ত প্রভৃতি সূক্তসমূহের মধ্যেও অতি স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মবিদ্যা অদ্বৈতবাদের উপদেশ কথিত আছে। অন্যত্রও যে, তাহার অভাব আছে, তাহা নহে। তবে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রণিধান না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। পরেও আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

আলোচনা।

আমরা এ পর্য্যন্ত বেদ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলাম, সে সমস্তই এ দেশের কথা—ভারতীয় মনীষিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই উক্তপ্রকার মতের অনুমোদন ও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও তাহাদের পদানুগামী এ দেশীয় কোন কোন মহাত্মা এ সমস্ত কথার উপর আস্থা স্থাপন করিতে সম্মত নহে। তাহারা বলেন, ভারতে যখন জ্ঞানোন্মেষের উষাসময় উপস্থিত জ্ঞানালোকের পূর্ণপ্রভায় ভারতভূমি উদ্ভাসিত হয় নাই; সমুন্নত অধ্যাত্মচিন্তা কোথাও আত্মলাভ করে নাই; সেই আলোআঁধারের—জ্ঞান অজ্ঞানের সম্মিশ্রণ সময়ে বেদের কেবল মন্ত্রভাগই বিরচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। সে সময় ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ বা

আরণ্যক কিছুই ছিল না। পরে জ্ঞানোন্মেষণের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্‌গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল; সুতরাং মন্ত্রভাগই যথার্থ বৈদিক সাহিত্যের আদিম গ্রন্থ এবং তাহাই যথার্থ 'বেদ' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, বেদ ও বৈদিক গ্রন্থসমূহ একই সময়ে বিরচিত হয় নাই। এই জন্য তাহারা একটা অভিনব যুগধারা কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রথম ছন্দোযুগ, দ্বিতীয় মন্ত্রযুগ, তৃতীয় ব্রাহ্মণযুগ, চতুর্থ সূত্রযুগ।

তন্মধ্যে ছন্দোযুগে কেবল মন্ত্র সমূহ বিরচিত হইয়াছিল; মন্ত্রযুগে মন্ত্রসংকলন হইয়াছিল; ব্রাহ্মণযুগের প্রথমাংশে ব্রাহ্মণভাগ, দ্বিতীয়াংশে আরণ্যক ভাগ, ও তৃতীয়াংশে উপনিষদ্ সমূহ বিরচিত হইয়াছিল; এবং সূত্রযুগে কল্পসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থ সমূহের রচনা হইয়াছিল।

এই সিদ্ধান্ত যে, একেবারেই অসত্য বা অমূলক, তাহা না হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকাংশই যে, ভ্রমসংকুল, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।

উপনিষদের পূর্ব্বে যে, বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, একথা নিতান্ত অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন। কারণ, তাহারাই যে সমস্ত উপনিষদ্‌কে অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন, সে সমুদয় উপনিষদের মধ্যেও এরূপ বহুতর প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহা দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হয় যে, উপনিষদের পূর্ব্বেও অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থের অসদ্ভাব ছিল না।

উদাহরণ রূপে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকের দুইটি অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে এইরূপ একটি ঘটনা দৃষ্ট হয় যে,

একদা দেবর্ষি নারদ ভগবান্ সনৎকুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর ভগবান্ সনৎকুমার নারদকে বলিলেন, তুমি কোন কোন বিষয় অবগত আছ, অগ্রে তাহা বল ; তাহার পর, তুমি যাহা জান না, সেই বিষয়ে তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব। তদুত্তরে নারদ বলিয়াছিলেন—

"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি, যজুর্ব্বেদং, সামবেদং, আথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেব-বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্প-দেবজনবিদ্যামেতদ্ ভগবোঽধ্যেমি।" (ছান্দোগ্য ৭।১।২)

হে ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ব-বেদ, পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণ, পিত্র্য (পিতৃলোকসম্বন্ধী), রাশি (গণিত), দৈবতবিদ্যা, নিধিবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা অর্থাৎ নৃত্যগীত শিল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি আমি জানি।

উল্লিখিত বাক্যসন্দর্ভ হইতে পুরাকালীন বিদ্যার স্বরূপ ও প্রকারগত প্রভেদ কতকটা জানিতে পারা যায়। এইরূপ

বৃহদারণ্যকোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণেও অনেকগুলি বিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"অস্য বা মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি অস্যৈবৈতানি নিঃশ্বসিতানি।" (বৃহদারণ্যক ২।৪।১০,

এখানে দেখা যায়, ছান্দোগ্যে উল্লিখিত বিদ্যা ভিন্ন আরও কতকগুলি বিদ্যার উল্লেখ রহিয়াছে। এখানে যে, ইতিহাস, পুরাণ ও সূত্র প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তাহা কিন্তু পাণিনিকৃত ব্যাকরণ-সূত্র বা গোভিল প্রভৃতির প্রণীত গৃহ্যাদিসূত্র নহে; এবং পুরাণ ও ইতিহাস অর্থেও প্রচলৎ অষ্টাদশ পুরাণ কিংবা রামায়ণ মহা-ভারতাদি গ্রন্থ নহে; পরন্তু বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগের মধ্যেই অনেক বিষয় সূত্রাকারে গ্রথিত আছে, যেমন—

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ।" ইত্যাদি।

এবং কোন কোন বিষয় ইতিহাসরূপে ও পুরাণাকারেও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (২) সেই সমস্ত বাক্যবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে সূত্র ও ইতিহাসাদির নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

ঐসমস্ত উপনিষদ্ অপেক্ষাও অতি প্রাচীন শতপথ ব্রাহ্মণে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি অনেকগুলি বিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের বৈদিক যুগেও যে, কেবল মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য

কোনও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রচলন বা আলোচনা ছিল না, একথা নিতান্ত ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক; সুতরাং উপেক্ষার যোগ্য।

উপসংহারে আরও বক্তব্য এই যে, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলী এবং তাহাদের প্রদর্শিত পথানুযায়ী এদেশীয় কোন কোন মনীষীও মনে করিয়া থাকেন যে, সমস্তটা বেদ একই সময়ে একই ব্যক্তি দ্বারা বিরচিত হয় নাই। সংহিতা ভাগই সর্ব্বপ্রথমে রচিত হইয়াছিল, পরে অন্যান্য অংশগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা বিরচিত হইয়া বেদসংজ্ঞা লাভ করিয়াছে মাত্র।

প্রাচীন ভারতে সরলমতি কৃষিজীবী আর্য্যগণ বিস্ময়াবহ বিশ্ববৈচিত্র্য-দর্শনে বিহ্বল হইয়া অন্তরে যে, অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেন, বেদ তাহারই বহিরুচ্ছ্বাস মাত্র; সুতরাং আদিম বেদ-সংহিতার মধ্যে কখনই চিন্তাশীল সভ্যজনোচিত কোনও সমুন্নত তত্ত্ব স্থান পাইতে পারে না। যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু উত্তম, এবং যাহা কিছু নূতন ও পরিমার্জ্জিত বুদ্ধিগম্য, সে সমস্তই পরবর্ত্তী মনীষিগণের বুদ্ধিগত ক্রমোন্নতির ফল; সুতরাং ঐ সমস্ত বিষয় ও অংশ (উপনিষদ্ প্রভৃতি) বেদবহির্ভূত— প্রক্ষিপ্ত মাত্র।

ইহাদের মতে ব্রাহ্মণ ভাগ ত দূরের কথা, বৈদিক সংহিতা-ভাগের মধ্যেও উন্নত চিন্তার চিহ্নস্বরূপ যে, দেবীসূক্ত, পুরুষসূক্ত, ও মৎস্যসূক্ত প্রভৃতি সূক্তসমূহ ও 'ঈশাবাস্যা'দি উপনিষদ্ সন্নিবিষ্ট আছে; সে সমস্তই বেদবাহ্য ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উপেক্ষিত

হইয়া থাকে। সে সমুদয়ের অপরাধ এই যে, সমুন্নতচিন্তার চরমোৎকর্ষস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা ঐসমস্ত অংশে স্থান লাভ করিয়াছে।

বেদ যাহাদের নিকট অজ্ঞজনের সরলতাপূর্ণ সাময়িক আনন্দোচ্ছ্বাসের একটা নিদর্শন বা বহিরভিব্যক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ সিদ্ধান্ত খুব সুসঙ্গত হইলেও দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা তাহাদের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। কারণ, তাহারা, যে উপনেত্র বা চশমার সাহায্যে বেদবিদ্যা অবলোকন করেন, আমাদের উপনেত্র তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেন না, তাহাদের বেদ চাষার গান, কিন্তু আমাদের বেদ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ; তাহাদের বেদ লোকের একটা সাময়িক আনন্দোচ্ছ্বাস মাত্র, আর আমাদের বেদ—জীবের ইহ-পরকালের কল্যাণসাধন স্বর্গাপবর্গের দ্বার এবং নিত্য সত্য পরমার্থ তত্ত্বে পরিপূর্ণ; সুতরাং অলৌকিক তত্ত্বনির্দ্দেশ করাই উহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কাজেই আমরা ঐসমস্ত উৎকৃষ্ট অংশকে মৌলিক বেদবিদ্যা হইতে পৃথক্ করিতে নিতান্ত অক্ষম।

আমরা অতঃপর দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, প্রসিদ্ধ ফল্গুনদী যেরূপ দূর হইতে দেখিলে শুষ্ক বালুকাস্তূপ ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না; কিন্তু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে অনুসন্ধান করিলে, তাহার ভিতরেই পিপাসা-বারণক্ষম স্বচ্ছ শীতল সলিল লাভ করিতে পারা যায়, তদ্রূপ বৈদিক সংহিতাভাগকেও যাহারা পুরাতত্ত্ব বা প্রাচীন সাহিত্য মনে করিয়া কেবল বাহিরে বাহিরে আলোচনা করেন, তাহারা উহার মধ্যে কেবলই কতকগুলি

কঠোর ক্লেশসাধ্য কর্ম্মের আড়ম্বর ও বিস্তৃত দ্রব্যসম্ভারের ঘটা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না ; কাজেই অসার অকর্ম্মণ্য বোধে উহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু যাহারা ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণপিপাসু তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং সহিষ্ণুতা সহকারে শান্ত দান্ত ও শ্রদ্ধালু হইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন ; আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, তাহারা নিশ্চয়ই ঐ নীরস সংহিতাভাগের মধ্যেও, দুগ্ধে নবনীতের ন্যায় সর্ব্বসন্তাপহর ও চিরনির্ব্বৃতিকর দুর্লভ ব্রহ্মবিদ্যার মধুর অমৃতধারা আস্বাদনে পরম পরিতোষ লাভ করিতে সমর্থ হন। অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় অবতারণা করা যাইতেছে।

ব্রহ্মবিদ্যা।

ব্রহ্মবিদ্যা এদেশের চিরপরিচিত অতি পুরাতন সামগ্রী। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে একদা এমনই এক শুভ সময়ের আবির্ভাব হইয়াছিল, যে সময়ে ভারতের পুণ্য-প্রস্রবণ তপোবনগত ধ্যান-নিরত সংযমপূত তত্ত্বচিন্তাপরায়ণ ঋষিগণ সন্তাপবহুল সংসার-সুখ পরিহারপূর্ব্বক জরামরণবারণ শান্তিসদন ব্রহ্মবিদ্যার অপূর্ব্ব রসাস্বাদে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন এবং উপায়হীন অধম নরনারীগণের নিস্তারের জন্য, নানা আকারে সেই দুর্লভ ব্রহ্ম-বিদ্যারই স্থিতি বিস্তৃতি ও সমুন্নতি কল্পে যত্নপর ছিলেন।

পুত্রবৎসল পিতা যেরূপ প্রিয়তম পুত্রকে কখনও ক্রোড়ে, কখনও স্কন্ধে, কখনও বা মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক আদর করিয়া থাকেন, ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ আর্য্য ঋষিসমাজও তদ্রূপ প্রাণপ্রিয় জীবনসর্ব্বস্ব ব্রহ্মবিদ্যাকে সংহিতা, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসাদি আকারে সন্নিবেশপূর্ব্বক কখনও সাকারে, কখনও নিরাকারে, কখনও বা অন্যাকারে আরোপণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন।

আর্য্য ঋষিগণ ব্রহ্মবিদ্যাকে যে, কত ভাল বাসিতেন, এবং কিরূপ আদর করিতেন, সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও দর্শন প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে তাহার প্রভূত পরিচয় প্রকটিত আছে। প্রসিদ্ধ মুণ্ডকোপনিষদ্ এই ব্রহ্মবিদ্যাকেই অপর সমস্ত বিদ্যার প্রতিষ্ঠা ও পরম গোপনীয় রহস্য বিদ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

"স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাম্,
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রায় প্রাহ"। (১।১ ১)

অর্থাৎ বিশ্বপতি ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা আকর স্বরূপ এই ব্রহ্মবিদ্যা নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্ব ঋষিকে উপদেশ দিয়াছিলেন। অথর্ব্ব ঋষি আবার শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে ইহার বিস্তৃতি বিধান করিয়াছিলেন।

পর্ব্বত-কন্দরনির্গত ক্ষীণতোয়া একই নদী হইতে যেমন শত শত উপনদীর আবির্ভাব হয়, তেমনি এই পরা বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা

হইতেই অপর সমস্ত অপরা বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে; এই কারণে ব্রহ্মবিদ্যাকে সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে।

লোকে প্রিয় জনকেই প্রিয় বস্তু প্রদান করিয়া থাকে; এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রই সাধারণতঃ পিতার সমধিক প্রিয় হইয়া থাকে। শুনঃশেফের ঘটনাই এই বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ (১)। ব্রহ্মবিদ্যার প্রথম আচার্য্য স্বয়ং ব্রহ্মা যখন প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, তখন বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহার কত প্রিয় ছিল; এবং তদানীন্তন মনীষিসমাজেও ইহা কিরূপ আদরণীয় বস্তু ছিল। লোকহিতপরায়ণ বিদ্যাচার্য্য ঋষিগণের অপার করুণা-প্রভাবেই আজ আমরা সেই কঠোর সাধনালব্ধ দুর্লভ ব্রহ্মবিদ্যার

---

(১) শুনঃশেফ সম্বন্ধে বাল্মিকীয় রামায়ণে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে। ইক্ষাকুবংশে অম্বরীষ নামে এক নৃপতি ছিলেন। তিনি একদা একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞের জন্য সংগৃহীত পশুটী দেবরাজ ইন্দ্র অপহরণ করেন। পশু অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া পুরোহিত অম্বরীষকে বলিলেন; মহারাজ, তোমার যাগের পশু নষ্ট হইয়াছে। শীঘ্র সেই পশু আনয়ন কর, অথবা তৎপরিবর্ত্তে একটী নরবলির ব্যবস্থা কর; নচেৎ তোমার অমঙ্গল হইবে। পুরোহিতের কথানুসারে অম্বরীষ রাজা বহু অন্বেষণেও অপহৃত পশু না পাইয়া অবশেষে মহামুনি ঋচীকের নিকট যাইয়া বহু অর্থ দ্বারা একটী পুত্র ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলেন। ঋচীক মুনি তাহাতে সম্মত হইয়া বলিলেন—"নাহং জ্যেষ্ঠং নরশ্রেষ্ঠ বিক্রীণীয়াং কথঞ্চন।" "অনন্তর ঋচীকপত্নী বলিলেন—অবিক্রেয়ং সুতং জ্যেষ্ঠং ভগবানাহ ভার্গবিঃ। মমাপি দয়িতং বিদ্ধি কনিষ্ঠং শুনকং নৃপ॥ প্রায়েণ হি নরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃষু বল্লভাঃ। মাতৃণাং কনীয়াংসস্তস্মাৎ রক্ষে কনীয়সম্॥" তখন মধ্যমপুত্র শুনঃশেফ অবস্থা বুঝিয়া নিজেই বলিলেন—"পিতা জ্যেষ্ঠমবিক্রেয়ং মাতা চাহ কনীয়সম্। বিক্রীতং মধ্যমং মন্যে রাজন্ পুত্রং নয়স্ব মাম্॥" অতঃপর অম্বরীষ মহারাজ শুনঃশেফকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। শেষে মহাতপা বিশ্বামিত্রের কৃপায় শুনঃশেফ রক্ষা পান।

আলোচনা করিবার যৎকিঞ্চিৎ অধিকার লাভ করিয়াছি। - এখন সেই ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

ব্রহ্মবিদ্যা অর্থ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান; যে জ্ঞানে চিৎ-জড়ের— ব্রহ্ম, জীব ও জগতের স্বরূপ, স্বভাব, শক্তি ও কার্য্য-কারণভাব প্রভৃতি অবিজ্ঞাত তত্ত্বসমুহ লোকবুদ্ধির বিষয়ীভূত করিয়া দেয়, তাহাই যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যা।

ব্রহ্মবিদ্যার পরিচয়।

ব্রহ্ম চেতন কি অচেতন; এক কি অনেক, সগুণ কি নিগুর্ণ, সাকার কি নিরাকার; স্বতন্ত্র, কি পরতন্ত্র। এই জীব চেতন কি অচেতন, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কি অভিন্ন; এক, না অনেক, অণু কি বিভু, সসঙ্গ, কি অসঙ্গ, কর্ত্তা, না উদাসীন, বদ্ধস্বভাব, কিংবা মুক্তস্বভাব; এবং দৃশ্যমান জগৎ কি ব্রহ্ম-প্রসূত, না প্রকৃতিজাত, অথবা স্বভাবসম্ভূত; ইহা সাদি, না অনাদি, নিত্য না অনিত্য, এবং ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের কিরূপ সম্বন্ধ, ইত্যাদি দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিবিধ সত্য বিষয় লোকের জ্ঞানগোচর করিয়া দেওয়াই 'ব্রহ্মবিদ্যার' প্রধান লক্ষ্য।

ব্রহ্ম, জীব ও জগতের কথা পরে পৃথগ্‌ভাবে আলোচনা করা যাইবে, এখন ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য, তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে,—

বিশাল বারিধিবক্ষে উত্থান-পতনশীল অসংখ্য তরঙ্গমালা যেমন একটীর পর একটী উঠিয়া আবার বিলীন হইয়া যায়, মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার বিশ্রাম বা আত্যন্তিক বিরাম দৃষ্ট হয় না; মানবীয় ক্ষুদ্র মানস-সরোবরেও তেমনি শত শত চিন্তার

তরঙ্গ নিরন্তর উত্থান-পতনলীলা করিতেছে; ক্ষণকালের জন্যও তাহার বিরাম নাই। যে লোক নিজে তরুতলবাসী ভিক্ষান্নভোজী দীন দরিদ্র, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারও মানস রাজ্য নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। সে লোকও আকাশে অট্টালিকা গড়িয়া তাহারই চিন্তায় সতত ব্যাকুল। নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে সুষুপ্তি সমাগমের পূর্ব্বপর্য্যন্ত (১) প্রত্যেক জীবই অল্পাধিক পরিমাণে এই চিন্তা-দেবীর উপাসনা দ্বারা সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে। এই যে, উত্থান-পতনশীল চিন্তাধারা বা বুদ্ধিবৃত্তি-প্রবাহ, ইহাই সাধারণতঃ আমাদের নিকট জ্ঞাননামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত জ্ঞানই জীব ও অজীবের অর্থাৎ চেতনাচেতনময় জগতের মধ্যরেখা-রূপে পার্থক্য বিধান করিতেছে, এবং প্রাণিগণের প্রার্থিত লাভের দুর্গম পথকে সুগম ও সরল করিয়া দিতেছে; এবং ইহাই অনর্থসঙ্কুল নিবিড় তমসাচ্ছন্ন সংসারারণ্যে পথিপ্রদর্শক উজ্জ্বল আলোকের কার্য্য করিতেছে। এই বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞানেরই অবস্থাগত বিশেষ নাম বিদ্যা।

কথিত বিদ্যা-পদার্থটী বস্তুতঃ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্

(১) জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামে তিনটী অবস্থা প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে জাগ্রদবস্থায় বাহ্য বস্তু বিষয়ে, এবং স্বপ্নাবস্থায় অন্তরে বাসনাময় বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তি বিদ্যমান থাকে, কিন্তু সুষুপ্তি সময়ে সেই বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি।
পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ॥"

(কৈবল্যোপনিষদ্ ১৩)

বা স্বতন্ত্র না হইলেও, জ্ঞানমাত্রই বিদ্যা-পদবাচ্য নহে। যেমন জল ও জলতরঙ্গ ভিন্নপদার্থ না হইলেও, তদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তেমনি সাধারণ জ্ঞান ও ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

জগতে প্রত্যেক প্রাণীই অল্পাধিক পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তির (জ্ঞানের) পরিচালনা করে—আবশ্যকীয় ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য যথাসাধ্য জ্ঞানের সাহায্য লইয়া থাকে; কিন্তু সে সমুদয় জ্ঞান কখনই আলোচ্য 'বিদ্যা' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। (১) কারণ, জ্ঞান হইতেছে সাধারণ, আর বিদ্যা হইতেছে অসাধারণ। যে কোন বস্তুবিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তিকেই জ্ঞান বলিতে পারা যায়, কিন্তু জ্ঞানমাত্রকেই 'বিদ্যা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। প্রাণিমাত্রই স্ব স্ব ব্যবহারোপযোগী জ্ঞানের অনুশীলন করিয়া থাকে, কিন্তু বিদ্যা লাভ সকলের ভাগ্যে সুলভ হয় না। বিদ্যা হইতেছে প্রযত্নসাপেক্ষ ও তত্ত্বনির্ণয়পর, কোন বিষয়ই বিনা বিচারে গ্রহণ করে না। জ্ঞান কদাচিৎ ভ্রান্তি বা অবিদ্যারও সহচর হইয়া থাকে, বিদ্যা কিন্তু আপনার অধিকার মধ্যে ভ্রান্তি বা অবিদ্যার অল্পমাত্রও অবস্থান সহ্য করে না। সে যতক্ষণ অবিদ্যার আমূল উচ্ছেদ করিতে না পারে, ততক্ষণ কিছুতেই স্থিরতা লাভ করে না। বিশেষতঃ উভয়ের ফল ও উদ্দেশ্যগত প্রভেদও যথেষ্ট; জ্ঞানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য—প্রেয়ঃ—ঐহিক বা পারলৌকিক ভোগ সম্পদ্; তাহার ফল মৃত্যু;

(১) "জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।" ইত্যাদি। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ)

আর বিদ্যার উদ্দেশ্য—শ্রেয়ঃ—সর্ব্বসন্তাপহারিণী মুক্তি, এবং ফল চিরশান্তি। এই কারণেই, সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধেও যাহা শ্রেয়োলাভের উপায়, তাদৃশ জ্ঞানকে বিদ্যা নামে, আর তদ্বিপরীত সাধারণ জ্ঞানকে অবিদ্যা ও অজ্ঞান নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগবান্‌ও প্রকৃত জ্ঞানসাধন 'অমানিত্ব' প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহকে জ্ঞান নামে অভিহিত করিয়া, তদ্ভিন্ন জ্ঞান মাত্রকেই অজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (২)

দেবাসুরসংগ্রামের ন্যায় এই যে, বিদ্যা ও অবিদ্যার পরস্পর বিরোধ, ইহা শাশ্বতিক—অনাদি কাল হইতেই আছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত থাকিবে। বোধহয়, এতাদৃশ বিরোধের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উপনিষৎ একবাক্যে বিদ্যা ও অবিদ্যার পার্থক্য ঘোষণা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন—

"দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।"

অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা নামে পরিচিত পদার্থ দুইটী অত্যন্ত বিরুদ্ধস্বভাব এবং বিভিন্ন ফলপ্রদ।

ছান্দোগ্য ও জাবালোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ।"

অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই বিভিন্ন প্রকার।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ আরও স্পষ্ট ভাষায় বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রভেদ বলিয়াছেন—

(২) "অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।

*** *** ***

এতজ্‌ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥" (ভগবদ্গীতা)।

"ক্ষরং ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা।"

অর্থাৎ অবিদ্যা হইতেছে ক্ষর অর্থাৎ ধ্বংসশীল, আর বিদ্যা হইতেছে অমৃত (নিত্য)। ঈশোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"অন্যদেবাহুর্ব্বিদ্যয়া অন্যদেবাহুরবিদ্যয়া।" (১০ শ্লোকে)

অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা যে ফল লাভ হয়, অবিদ্যা দ্বারা নিশ্চয়ই তাহার বিপরীত ফল লাভ হয়। এবংবিধ ফলবৈলক্ষণ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যমরাজ নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মমন্যমানাঃ।
দংদ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।"

অর্থাৎ যাহারা অবিদ্যার অধিকারে অবস্থিত হইয়া নিজেই নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সমুদয় মূঢ় লোক অন্ধ-পরিচালিত অন্ধের ন্যায় বিষম দুঃখরাশির মধ্যে নিপতিত হয়। অবিদ্যার ঈদৃশ ভীষণ ফল নির্দ্দেশের পর, বিদ্যা সম্বন্ধে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফলের কথা বলিয়াছেন—"বিদ্যয়াঽমৃত-মশ্নুতে" অর্থাৎ জীব বিদ্যা দ্বারা অমৃত বা মোক্ষ ফল লাভ করে।

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে বিদ্যাভেদ বহুপ্রকার দৃষ্ট হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বকৃত সংহিতামধ্যে বিদ্যাকে চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—

বিদ্যাবিভাগ

"পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥ (১।৩)

অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ, কণাদ ও গোতমকৃত ন্যায় দর্শন,

পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা, মনুপ্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্র, শিক্ষা ও কল্পসূত্র প্রভৃতি, ছয়টী বেদাঙ্গ (১) এবং ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি চারি বেদ, এই চতুর্দ্দশটী বিদ্যার স্থান, অর্থাৎ বিদ্যালাভের প্রধান উপায়। এই চৌদ্দটী শাস্ত্র যে কেবল বিদ্যারই স্থান, তাহা নহে, পরন্তু ধর্ম্মেরও আকর।

এখানে যে চতুর্দ্দশটী শাস্ত্রকে বিদ্যাস্থান বলা হইয়াছে, তাহাকেই আবার ধর্ম্মস্থানও বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বিদ্যা সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিগণের কিরূপ ধারণা ছিল। তাঁহারা নিঃসংশয়চিত্তে বুঝিয়াছিলেন যে, যাহা ধর্ম্মলাভের অনুকূল ও সাধনরাজ্যের জটিল দুর্গম পথকে সরল ও সুগম করিয়া দেয়, যাহা দ্বারা কামকর্ম্মাদি-কলুষিত মানবচিত্ত বিমল মণিদর্পণের ন্যায় বিশুদ্ধ হইয়া ক্রমে ভগবৎ-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভে সমর্থ হয়, এবং যাহার অনুশীলনে হৃদয়নিহিত দোষরাশি সৌরকরস্পৃষ্ট নৈশ তিমিররাশির ন্যায় অচিরে বিদূরিত হইয়া যায়, তাহাই প্রকৃত 'বিদ্যা' ও জ্ঞানপদবাচ্য ; এতদ্ভিন্ন—যাহা ভগবৎ-প্রা প্তির পরিপন্থী ও সংসারাসক্তির পরিবর্দ্ধক, তাহা বিদ্যা হইলেও বস্তুতঃ অবিদ্যার রূপান্তর মাত্র, এবং জ্ঞান হইলেও অজ্ঞানের প্রতিচ্ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বিষ্ণুপুরাণে এই চতুর্দ্দশ বিদ্যাকেই আবার অষ্টাদশ প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে।

---

(১) ছয় প্রকার বেদাঙ্গ এই—
"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাংচিতিঃ॥
জ্যোতিষাময়নং চৈব বেদাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥"

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণং চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বমর্থশাসনম্।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থং তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥"

এখানে দেখা যায়—পূর্ব্বপ্রদর্শিত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে যে সমস্ত শাস্ত্রের উল্লেখ আছে, এখানেও সে সমস্তেরই উল্লেখ রহিয়াছে; অধিকন্তু আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, সংগীতশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র, এই চারিটী শাস্ত্রকেও বিদ্যাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বিষ্ণুপুরাণের মতে—ব্যবহারিক বা পারমার্থিক, যে কোন প্রকার জ্ঞানপ্রদ শাস্ত্রই বিদ্যা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য; সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, সংগীতশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র কেহই বিদ্যার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারিতেছে না; আর যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্যবহারনির্ব্বাহক বা জীবিকার্জ্জনের উপায়স্বরূপ ঐ সমস্ত শাস্ত্র জ্ঞানপ্রদ এবং শিক্ষণীয় হইলেও মোক্ষমার্গের অনুকূল নয় বলিয়া বিদ্যা নামে অভিহিত হইবার অযোগ্য; কাজেই তিনি ঐ সমস্ত শাস্ত্রকে বিদ্যার মধ্যে পরিগণনা করেন নাই; সুতরাং বিদ্যার উল্লিখিত বিভাগে কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য থাকিলেও, তাহাতে প্রকৃত বিষয়ের কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটে নাই।

প্রসিদ্ধ উপনিষদ্ গ্রন্থসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে, দেখা যায় যে, অতি পুরাকালে এদেশে উল্লিখিত চতুর্দ্দশ বা অষ্টাদশ প্রকার

বিদ্যা ভিন্ন আরও অনেক প্রকার বিদ্যা ভারতীয় বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত ছিল, দুঃখের বিষয়, এখন সে সমুদয় বিদ্যার প্রকৃত স্বরূপ বা পরিচয় পরিজ্ঞাত হইবার কোনই উপায় নাই; কেবল সে সকলের নামানুসারে যতটুকু বুঝিতে পারা যায় মাত্র।

ছান্দোগ্যোপনিষদে একটী আখ্যায়িকায় নারদ ও সনৎকুমারের সংবাদ বর্ণিত আছে। তথায় কথিত আছে যে, একদা মহর্ষি নারদ মহাভাগ সনৎকুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন—"অধীহি ভগব ইতি। শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ—তরতি শোকমাত্মবিদ্। সোঽহং ভগবঃ, শোচামি; তং মা ভগবান্ শোকস্য পরং পারং তারয়তু ইতি।"

হে ভগবন্, আপনাদের ন্যায় জ্ঞানিজনের নিকটই শ্রবণ করিয়াছি যে, আত্মবিদ্ (যে লোক আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সে) লোক শোক উত্তীর্ণ হয়। হে ভগবন্, আমিও শোক (দুঃখ) অনুভব করিতেছি; অত এব আপনি আমাকে শোক-সাগরের পরপারে লইয়া যান।

অতঃপর সনৎকুমার বলিলেন—"যদ্বেত্থ, তেন মা উপসীদ, তত ঊর্দ্ধং তে বক্ষ্যামি" অর্থাৎ তুমি যাহা জান, অগ্রে তাহা আমার নিকট নিবেদন কর, পরে তোমাকে অবিজ্ঞাত বিষয়সমূহ আমি উপদেশ দিব। তদুত্তরে নারদ আপনার বিজ্ঞাত বিদ্যার পরিচয় প্রদানচ্ছলে বলিয়াছিলেন—

"ঋগ্বেদং ভগবো হধ্যেমি, যজুর্ব্বেদং, সামবেদং, আথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং, বেদানাং বেদং, পিত্র্যং

রাশিং, দৈবং, নিধিং, বাকোবাক্যম্, একায়নম্, দেববিদ্যাং, ব্রহ্মবিদ্যাং, ভূতবিদ্যাং, ক্ষত্রবিদ্যাং, নক্ষত্রবিদ্যাং, সর্পদেবজনবিদ্যাম্—এতদ্ ভগবোঽধ্যেমি।" (ছান্দোগ্য ৭।১।২)

অর্থাৎ আমি, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ব বেদ, পঞ্চম বেদ ইতিহাস পুরাণ, ব্যাকরণ, পিত্র্য অর্থাৎ পিতৃ লোক সম্পর্কিত বিদ্যা, রাশি (গণিত বিদ্যা) দৈবত বিদ্যা, নিধিবিদ্যা, বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), নীতিবিদ্যা, দেববিদ্যা (নিরুক্ত), ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, নক্ষত্র-বিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও শিল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি, এই সমস্ত বিদ্যা আমি অবগত আছি।

ইহা হইতে উত্তমরূপে জানিতে পারা যায় যে, পুরাকালেই বা এ দেশে বিদ্যা ও তাহার স্বরূপ-বিভাগ কত প্রকার ছিল, আর এখনই বা তাহার কতটা অবশিষ্ট আছে। ইহা ছাড়া, অতি প্রাচীন ভাসনামক মহাকবির স্বপ্রণীত 'প্রতিমা'নাটকে এমন কতকগুলি বিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমানে কোথাও সে সমুদয়ের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় না; ভবিষ্যতেও যে, জানিতে পারা যাইবে, সে আশাও অতি অল্প। প্রাচীন উপনিষৎ শাস্ত্র আবার বিদ্যাসমষ্টিকে মোটামোটি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—এক 'পরা', দ্বিতীয় 'অপরা'। তন্মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাকে পরা বিদ্যামধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া অপর সমস্ত বিদ্যাকেই অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

উপরে যে সমস্ত বিদ্যার কথা বলা হইল, সে সমস্তই অপরা

বিদ্যা, এতদ্ভিন্ন যে বিদ্যা, তাহার নাম 'পরা বিদ্যা'। এই পরা বিদ্যাই আত্ম-বিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা নামে পরিচিত। এই পরা বিদ্যাই যে, সর্ব্ববিদ্যার বিশ্রামভূমি ও সর্ব্ব জীবের চরম লক্ষ্য; ইহা আমরা পরে প্রদর্শন করিব। উপনিষদ্ শাস্ত্রে এই পরা ও অপরা ভেদে বিভক্ত দুই প্রকার বিদ্যাই লোকের শিক্ষণীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ মুণ্ডকোপনিষদে এই পরা ও অপরা বিদ্যার স্বরূপ বিভাগ ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি অতি উত্তমরূপে বর্ণিত আছে। মুণ্ডকোপনিষদের ঋষি শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রথমেই আদেশ করিতেছেন—

পরা ও অপরা বিদ্যা

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে—পরা চৈবাপরা চ।" (১।২।৪)

মানবকে পরা ও অপরা দুই প্রকার বিদ্যাই অধিগত হইতে হইবে। উক্ত উভয়প্রকার বিদ্যার মধ্যে অপরা বিদ্যা হইতেছে—উপায়, আর পরা বিদ্যা হইতেছে—তাহার ফল; অথবা অপরা বিদ্যা হইতেছে—সাধন, আর পরা বিদ্যা হইতেছে তাহার সাধ্য। সাধন ব্যতিরেকে যেমন সিদ্ধি লাভ হয় না, তেমনি অপরা বিদ্যার অনুশীলন ব্যতিরেকেও পরা বিদ্যায় অধিকার হয় না।

মুণ্ডকোপনিষদ্ কেবল যে, পরা ও অপরা বিদ্যার নামমাত্র উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, তাহা নহে; তদুভয়ের পার্থক্য পরিচয়ও উত্তমরূপে প্রদান করিয়াছেন। 'অপরা বিদ্যা' কাহাকে বলে, তদুত্তরে ঐ উপনিষদ্ই বলিয়া দিতেছেন—

"তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বা-

ঙ্গিরসঃ, শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং ,নিরুক্তম্, ছন্দো জ্যোতিষম্ ইতি ।" (১।১।৫)

অর্থাৎ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষাশাস্ত্র, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ শাস্ত্র, এই সমস্ত বিদ্যা 'অপরা বিদ্যা'। কারণ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঐ সমুদয় বিদ্যার বিষয় বা লক্ষ্য ব্রহ্ম নহে ; অব্রহ্ম-বিষয়ক বলিয়াই ঐ সমস্ত বিদ্যা অপরা বিদ্যা নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রেয়োলাভ যাহার লক্ষ্য নয়, পরন্তু স্বর্গাদি প্রেয়ঃপ্রাপ্তিই প্রধান লক্ষ্য, তাহা কখনই 'পরা' বিদ্যা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে।

অতঃপর পরা বিদ্যা কাহাকে বলে, তাহার পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে মুণ্ডকোপনিষদ্ই বলিতেছেন—

"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" (১।১।৫)

তাহার নাম পরা বিদ্যা, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর অর্থাৎ নিত্য নির্ব্বিকার পরব্রহ্মকে অধিগত হওয়া যায়—সম্যক্‌রূপে জানিতে পারা যায়।

এই 'অক্ষর' পদার্থটী যে, ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, তাহাও মুণ্ডকোপনিষদ্ হইতে এবং অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থের সাহায্যে জানিতে পারা যায়। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলিতেছেন, অক্ষর কি ? না,

"যৎ তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥" (১।১।৬)

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" ইত্যাদি (১।১।৯)

অর্থাৎ যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, নাম গোত্র ও চক্ষুঃকর্ণবিহীন, অর্থাৎ সর্ব্বনিষেধের পর্য্যন্ত ভূমি, এবং যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিদ্, তিনিই সেই বিজ্ঞেয় অক্ষর পুরুষ।

এখানে 'অক্ষরের' যেরূপ স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, ব্রহ্মভিন্ন অপর কাহারো পক্ষেই তাহা সম্ভবপর হয় না। বৃহদারণ্যকোপনিষদেও ব্রহ্মবিদ্যা প্রসঙ্গে 'অক্ষর' শব্দের প্রভূত পরিমাণে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"তদক্ষরং ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি" (৩।৮।৮।)

"এতস্মিন্ নু খল্বক্ষরে গার্গি, আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।" "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।" (৩।৮।৯)

ভগবদ্গীতায় আরও স্পষ্ট ভাবে অক্ষরকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" ইত্যাদি।

অধিক কি, মুণ্ডকোপনিষদেরই অন্যত্র 'অক্ষরকে' ব্রহ্ম এবং তদ্বিষয়ক বিদ্যাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা—

'যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্, প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।"

অর্থাৎ যে বিদ্যার প্রভাবে অক্ষর সত্য পুরুষকে জানিতে

পারা যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা তাহাকে যথাযথভাবে উপদেশ করিয়াছিলেন। (১)

এখানে মুণ্ডকশ্রুতি নিজেই যখন অক্ষর-বিদ্যাকে 'ব্রহ্মবিদ্যা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন অক্ষর শব্দের প্রকৃতার্থ নিরূপণে আর কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। অতএব এবিষয়ে আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের ধৈর্য্য-চ্যুতি করিতে ইচ্ছা করি না। এখন প্রকৃত কথার অবতারণা করা যাউক।

প্রথমেই বলিয়াছি যে, উক্ত পরা বিদ্যারই অপর নাম ব্রহ্ম-বিদ্যা; ইহাই সমস্ত বিদ্যার পরা কাষ্ঠা বা শিরোমণি ও সমস্ত বিদ্যার প্রসবভূমি এবং সমস্ত বিদ্যার বিশ্রামস্থান। বিভিন্ন পথগামী নদনদী সকল যেমন অপার বারিধিমধ্যে মিলিত হইলে নিজ নিজ নাম রূপ ও গুণরাশি ভুলিয়া যায়, তেমনি বিভিন্ন পথাবলম্বিনী অপরা বিদ্যা সমূহও এই ব্রহ্মবিদ্যার সহিত সম্মিলিত হইলে পর, নিজেদের বাদ-প্রতিবাদের সমস্ত কোলাহল পরি-ত্যাগ করিয়া এক হইয়া যায়। এই কারণেই এদেশে ব্রহ্মবিদ্যার এত আদর ও এত প্রভাব ভারতীয় মনীষিসমাজে প্রকটিত হইয়াছিল।

যিনি জন্ম-জন্মান্তরার্জ্জিত অসীম সৌভাগ্য বলে কিয়ৎ-পরিমাণেও এই ব্রহ্মবিদ্যার রসাস্বাদ করিবার অধিকার পাইয়াছেন, তিনিই আত্মহারা হইয়া ধন জন বিষয় বিভব বিসর্জ্জন

(১) বেদান্তদর্শনের প্রথমাধ্যায়ে "অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ"(১।৩।১০) সূত্রেও মীমাংসিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মই এই অক্ষর শব্দের অর্থ।

দিয়া ইহার অনুবর্ত্তনে জীবন পাত করিয়াছেন। উদাহরণরূপে মহারাজ ভরতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করি। অতঃপর পরা বিদ্যার সহিত অপরা বিদ্যার সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও কার্য্যভেদ কি প্রকার, তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান

জ্ঞানমাত্রই সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—এক পরোক্ষ, অপর অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধেও পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিভাগ অবশ্যই আছে। তন্মধ্যে শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশে, কিংবা দৃঢ়তর যুক্তি তর্কের সাহায্যে, যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা পরোক্ষ, আর সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় সাহায্যে বা যোগবলে, যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহা অপরোক্ষ। অপরোক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা পরোক্ষ জ্ঞান স্বতই দুর্ব্বল; এই কারণে কোথাও অপরোক্ষ জ্ঞানের সহিত পরোক্ষ জ্ঞানের বিরোধ উপস্থিত হইলে, পরোক্ষ জ্ঞানই পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু অপরোক্ষ জ্ঞান কখনও কোথাও পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা পরাজিত হয় না। ইহাই জ্ঞান-রাজ্যের সনাতন ব্যবস্থা। এই হেতুই কোন ব্যক্তির দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত হইলে শত উপদেশেও তাহা অপনীত করা যায় না। (১) ব্রহ্ম সম্বন্ধেও এ নিয়মের অন্যথা হয় না। এই জন্যই—

---

(১) সেখানে দিগ্‌ভ্রান্তের দিগ্‌বিষয়ক জ্ঞানটী ভ্রমাত্মক হইলেও প্রত্যক্ষাত্মক (অপরোক্ষ); আর উপদেশজ শাব্দ জ্ঞান হয় পরোক্ষ; কাজেই ঔপদেশিক জ্ঞানে তাহার বাধ হইতে পারে না।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্, তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥"

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে॥"

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্ম।"

"সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে এবং শ্রুত্যনুমোদিত কার্য্য-কারণভাব-ঘটিত অনুমানাদি প্রমাণ হইতেও যে জ্ঞান জন্মে, সে জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যা হইলেও সম্পূর্ণ পরোক্ষ, আর শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন প্রভৃতি উপযুক্ত সাধনানুষ্ঠানের ফলে যে, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়, তাহাই প্রকৃত অপরোক্ষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ ব্রহ্মবিদ্যা। ভোজন বলিলে যেমন ভোজন-জনিত তৃপ্তি লাভ পর্য্যন্ত বুঝায়, তেমনি ব্রহ্মবিদ্যা বলিলেও, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত অর্থই বুঝায়; কারণ, আচার্য্যগণ ঐরূপ অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সর্ব্বত্র উহার প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা নামতঃ এক হইলেও, স্বরূপতঃ দুই প্রকার—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। বলা বাহুল্য যে, উক্ত উভয়প্রকার ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে অপরোক্ষ ব্রহ্মবিদ্যাই জীবের নিঃশ্রেয়স লাভের একমাত্র সাক্ষাৎ উপায়।

উল্লিখিত পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপগত প্রভেদের ন্যায় উহাদের কার্য্যগত প্রভেদও যথেষ্ট আছে। যদিও ব্রহ্মবিষয়ক

পরোক্ষ বিদ্যা অনায়াসলভ্য না হউক, যদিও অংশতঃ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান নিরসনপূর্ব্বক বুদ্ধিগত সঞ্চিত মলক্ষালনেও সমর্থ হউক, এবং যদিও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের প্রকৃষ্ট পথ প্রাপ্তির উপায় হউক, তথাপি, মুমুক্ষু সাধক যাহার জন্য সংসারের সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এবং যাহার উদ্দেশ্যে সাধনরাজ্যের কঠোর ক্লেশরাশিকেও সুকুমার কুসুমহারের ন্যায় সাদরে বরণ করিয়াছেন, পরোক্ষ ব্রহ্মবিদ্যা কখনই তাহার সে ফল প্রদান করিতে কিংবা দুঃখ-নিদান সংসারের মূলীভূত অবিদ্যা অপনয়নে সমর্থ হয় না। অবিদ্যা নিরসনে সেই অপরোক্ষ ব্রহ্মবিদ্যারই একমাত্র নির্ব্যূঢ় অধিকার, অন্যের নহে। আচার্য্য বিদ্যারণ্য স্বামী বলিয়াছেন—

"পরোক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং শাব্দং দেশিকপূর্ব্বকম্।
বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতং পাপং কৃৎস্নং দহতি বহ্নিবৎ॥
অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানং শাব্দং দেশিকপূর্ব্বকম্।
সংসার-কারণাজ্ঞান-তমসশ্চণ্ডভাস্করঃ॥"

অর্থাৎ আচার্য্যোপদেশলব্ধ যে, পরোক্ষ ব্রহ্মবিদ্যা, তাহার কার্য্য হইতেছে—হৃদয়গত জ্ঞানকৃত নিখিল পাপরাশি বিধ্বংস করা, আর অপরোক্ষ ব্রহ্মবিদ্যার কার্য্য হইতেছে—সংসারের মূলকারণ—যাহার অচিন্ত্য মহিমা বলে এই দুঃখময় সংসার অনাদি কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই অবিদ্যার সমূলে সমুচ্ছেদ করা।

উক্ত আচার্য্যবাক্য হইতে, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের মধ্যে যে একটা কিরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে।

উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে, বুঝা যায় যে, ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান হইতেছে উপায়, আর অপরোক্ষ জ্ঞান তাহার উপেয় বা ফল। সূর্য্যসারথি অরুণদেব অগ্রে উদিত হইয়া নৈশ তমোরাশি অপসারিত করিলে পর, যেমন স্বয়ং সূর্য্যদেব উদয় লাভ করেন, ঠিক তেমনি পরোক্ষ বিদ্যা অগ্রে উদিত হইয়া চিত্ত-দর্পণকে নিষ্পাপ ও নির্ম্মল করিলে পর, সেই চিত্ত-দর্পণেই অপরোক্ষ ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব হইয়া থাকে। পরোক্ষ ব্রহ্মবিদ্যা যে, সংসারের কারণীভূত অবিদ্যা অপনয়নে কেন সমর্থ হয় না, তদুত্তরে প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—

অবিদ্যাভেদ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ।

বিদ্যা বা জ্ঞান যেমন পরোক্ষ অপরোক্ষভেদে দুই প্রকার জীবের অজ্ঞান বা অবিদ্যাও ঠিক তেমনি পরো ও অপরোক্ষভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে পরোক্ষ অবিদ্যাই পরোক্ষ বিদ্যা দ্বারা বিনিবৃত্ত হয়, আর অপরোক্ষ অবিদ্যা কেবল অপরোক্ষ বিদ্যা দ্বারাই বিনষ্ট হয়।

যেখানে জ্ঞান পরোক্ষ, আর অজ্ঞান অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষাত্মক), সেখানে জ্ঞান যতই প্রবল হউক না কেন, সে কখনই ঐ অপরোক্ষ অজ্ঞান বিনাশে সমর্থ হয় না বা হইতে পারে না; কারণ, সেখানে জ্ঞান অপেক্ষা অজ্ঞানই সমধিক বলবান্। দুর্ব্বল কখনই প্রবলের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে না। যেখানে অজ্ঞান অপেক্ষা

জ্ঞান সমধিক বলবত্তর থাকে, সেখানেই জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান প্রতিহত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এই কারণেই শব্দজন্য বা অনুমানপ্রসূত যথার্থ জ্ঞানেও অপরোক্ষ ভ্রান্তি (অজ্ঞান) অপনীত হয় না। এবিষয়ে মহর্ষি কপিল অতি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন—

"নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ।" (১।৫৬)
"যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্‌মূঢ়বৎ, অপরোক্ষাদ্ ঋতে॥" (সাংখ্য সূত্র ১।৫৯)

অর্থাৎ নিত্য নির্ব্বিকার অসীম আত্মাতে যে সুখদুঃখাদি বিকারসম্বন্ধ ও কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি জড়ধর্ম্মের প্রতীতি হয়, ইহা ভ্রান্তিময় অসত্য হইলেও অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ আমাদের সকলেই মানস-নেত্রে উহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; সুতরাং সেই অপরোক্ষ অজ্ঞান বা অবিবেক অসত্য হইলেও, শাস্ত্রবাক্য, যুক্তি কিংবা অনুমানলব্ধ পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা বাধিত হইতে পারে না; একমাত্র আত্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানই উহার নিবারণে সমর্থ হয়; দিগ্‌ভ্রম ইহার দৃষ্টান্ত। যাহার ভাগ্যে কখনও দিগ্‌ভ্রম সংঘটিত হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, অপরের শত উপদেশে এবং দৃঢ়তর যুক্তি তর্কেও তাহার সেই দিগ্‌ভ্রম ততক্ষণ অপনীত হয় নাই, যতক্ষণ তিনি নিজে যথার্থ দিকৃতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সেখানেও দিগ্‌ভ্রম তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান; সেইহেতু তদপেক্ষা দুর্ব্বল পরোপদেশলব্ধ পরোক্ষ জ্ঞানে তাহা বাধিত হয় নাই।

এই প্রকার, আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে সাধারণের যে, জ্ঞান, তাহা ভ্রমাত্মক হইলেও অপরোক্ষ—সাক্ষাৎ অনুভবাত্মক ; সুতরাং ঔপদেশিক বা আনুমানিক পরোক্ষ জ্ঞানে তাহার বাধা হইতে পারে না ; ঐ অজ্ঞান নিবারণের নিমিত্ত আত্মবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করা আবশ্যক হয়। এখানে আত্মার সম্বন্ধে যে নিয়ম কথিত হইল, ব্রহ্মসম্বন্ধেও সেই একই নিয়ম বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্মবিষয়ে যে, 'নাস্তি' ও 'ন ভাতি' অর্থাৎ ব্রহ্ম নাই, এবং ব্রহ্ম প্রকাশ পাইতেছে না, ইত্যাকার ভ্রম, তাহা পরোক্ষ অজ্ঞান (ভ্রম), আর 'নাহং ব্রহ্ম' অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পৃথক্ বস্তু' ইত্যাকার যে জ্ঞান, তাহা অপরোক্ষ ভ্রম ; অতএব শাস্ত্র ও উপদেশাদিলব্ধ 'ব্রহ্ম অস্তি, ও 'ব্রহ্ম ভাতি' অর্থাৎ ব্রহ্ম আছেন, এবং প্রতীত হইতেছেন, ইত্যাকার জ্ঞানোদয়ে 'নাস্ত, ও ন ভাতি' এই পরোক্ষ ভ্রম বা অজ্ঞানমাত্র বিদূরিত হয়, কিন্তু 'নাহং ব্রহ্ম' এই অপরোক্ষ ভ্রম তখনও অব্যাহত অবস্থায়ই থাকিয়া যায়, পরে যখন ব্রহ্মাত্মবিষয়ে সাক্ষাৎকারাত্মক 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞান সমুদিত হয়, তখনই সেই অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা 'নাহং ব্রহ্ম' ভ্রম (জীব ব্রহ্মে ভেদবুদ্ধি) বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

জ্ঞান ও অজ্ঞানের এবংবিধ বিরোধবৈচত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বেদান্তদর্শনে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

"অবগতিপর্য্যন্তং জ্ঞানং সন্‌বাচ্যায়া ইচ্ছায়াঃ কর্ম্ম।"

এ কথার অভিপ্রায় এই যে, সচরাচর আমরা যেমন কৌতূ-

হলের বশবর্ত্তী হইয়া জাগতিক বিবিধ বস্তু বিষয়ে জিজ্ঞাসার অবতারণা করিয়া থাকি, এবং সেই জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্বন্ধে একটা মোটামোটি জ্ঞান (পরোক্ষ জ্ঞান) লাভ করিয়াই আপনাকে চরিতার্থ মনে করি, 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' কথার সেরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে চলিবে না ; পরন্তু বুঝিতে হইবে যে, উপনিষদ্ শাস্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ যে ভাবে বর্ণিত আছে, ঠিক সেইভাবেই তাহাকে আত্মাতে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে ; সেইরূপ প্রত্যক্ষী করণই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কথার যথার্থ অর্থ ; কারণ, ব্রহ্মাত্মভাববিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য এইরূপ জ্ঞানেরই প্রয়োজন। সেই প্রকার জ্ঞানই প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা, এবং তথাবিধ ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত হইলেই জীবের অনর্থনিদান অজ্ঞান সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যায় ও চিরসুপ্ত ব্রহ্মভাব জাগিয়া উঠে। জীব তখনই কৃতার্থতা লাভ করিয়া চিরশান্তি উপভোগ করে, এবং তখন তাহার সমস্ত কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হইয়া যায়।

উপনিষদ্ বলিতেছেন—

"আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু সংজ্বরেৎ॥"

উপরে যে ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ ও পরিচয় প্রদত্ত হইল, এ সম্বন্ধে কোন দর্শনের কিরূপ অভিমত, এখানে তাহারও একটুকু আলোচনা করা বোধ হয় অনুচিত হইবে না।

ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে দার্শনিক অভিমত

প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়

যে, তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মদর্শন সমস্ত দর্শনেরই অভিমত অতি প্রিয় বস্তু; কিন্তু তাহা হইলেও উল্লিখিত ব্রহ্মবিদ্যা বস্তুতঃ বেদান্তেরই নিজস্ব সম্পত্তি; কারণ, অপর কোন দর্শনেই উক্তপ্রকার ব্রহ্মবিদ্যার বিশেষ আলোচনা বা মীমাংসা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

প্রথমতঃ সংখ্যদর্শনের কথাই বলা যাউক। সংখ্যদর্শনের মতে অবাঙ্মনসগোচর সচ্চিদানন্দঘন শাশ্বত ব্রহ্ম বা নিত্য ঈশ্বর কোনও প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হন নাই; সুতরাং তদ্বিষয়ক জ্ঞান বা উপাসনার কথাও অনাবশ্যক বোধে সাংখ্যমতে স্থান লাভ করে নাই। অধিকন্তু, প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞানই বেদান্তের ব্রহ্মবিদ্যার স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে; কাজেই ব্রহ্মবিদ্যাকে সাংখ্যদর্শনের অভিমত বলিতে পারা যায় না।

তাহার পর পাতঞ্জলের কথা,—পাতঞ্জল দর্শনও প্রধানতঃ সাংখ্যসিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিয়াছে; সুতরাং সাংখ্যের উপেক্ষিত ব্রহ্মবিদ্যা যে, পাতঞ্জলে স্থান পাইবে, এরূপ আশা করা যায় না। যদিও পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, এবং তাঁহার আরাধনাও বিহিত হইয়াছে সত্য, তথাপি তাহা দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার স্থান পূরণ করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; কারণ, পাতঞ্জলের ঈশ্বর পুরুষ-বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্ম অবাঙ্মনসগোচর ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। বিশেষতঃ পাতঞ্জলেও ঈশ্বরের আরাধনা কেবল চিত্ত স্থির করিবার অন্যতম উপায় মাত্র; উহাই মুক্তিলাভের একমাত্র দ্বার নহে; কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্মবিদ্যাই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়; সুতরাং

পাতঞ্জলের মতেও মুক্তিলাভের উপায় রূপে ব্রহ্মবিদ্যার অস্তিত্ব লাভ হয় নাই।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অবস্থাও ঐ প্রকার। ঐ উভয় দর্শনের মতেই বেদান্তসম্মত ব্রহ্মবিদ্যার কোনও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না।

যদিও পরবর্ত্তী নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণের উদ্দেশ্যে, বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ বিস্তর বিচারগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মূল ন্যায় দর্শন আলোচনা করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে, ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরেরই আসন বড় ক্ষুদ্র অতীব দুর্ব্বল।

ন্যায় দর্শনে একটি মাত্র সূত্রে স্পষ্ট কথায় ঈশ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সূক্ষ্মধী ব্যাখ্যাতৃগণ তাহাও পরপক্ষীয় শঙ্কাসূচক পূর্ব্বপক্ষ সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ন্যায়মতে লৌকিকও অলৌকিক পদার্থ সমূহের তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তি লাভের উপায়; ব্রহ্মবিদ্যা তাহার উপায় নহে; সুতরাং ন্যায় দর্শনেও বেদান্তবেদ্য ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিদ্যার আদৌ উল্লেখ নাই, একথা বলিলেও বোধ হয়, সত্যের অপলাপ করা হইবে না।

বৈশেষিক দর্শন ন্যায়দর্শনেরই প্রতিচ্ছায়া; সুতরাং তাহাতেও যে ব্রহ্মবিদ্যা আদৃত বা আলোচিত হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে; সুতরাং সে সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করা অনাবশ্যক।

অতঃপর মমীাংসাদর্শনের কথা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। মীমাংসাদর্শন প্রধানতঃ বেদবিহিত ক্রিয়াকাণ্ড ও তাহার অনুষ্ঠান

পদ্ধতি এবং বিধিনিষেধ লইয়াই ব্যাপৃত। সেই সমুদয় বিষয়ই উহাতে বিশেষভাবে আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। অধিকন্তু বেদবিহিত কর্ম্মরাশিই যে, জীবকে আত্যন্তিক সুখশান্তি প্রদানে সমর্থ, তাহাই দৃঢ়তার সহিত উহাতে বর্ণিত ও সমর্থিত হইয়াছে; সুতরাং বেদান্ত-বেদ্য ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিদ্যার কথা সেখানে ত সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও অপ্রাসঙ্গিক এবং কর্ম্মকাণ্ডের পরিপন্থীও বটে; সুতরাং আলোচ্য ব্রহ্মবিদ্যা কখনই মীমাংসাদর্শনেরও অভিমত হইতে পারে না।

এস্থানে একথাও বলিয়া রাখা ভাল যে, এইপ্রকার একটা জনপ্রবাদ আছে যে, মীমাংসাদর্শনের প্রচলিত দ্বাদশ অধ্যায়ের অতিরিক্ত আরও একটা অংশ আছে, যাহার নাম 'সঙ্কর্ষণকাণ্ড'। সেই সঙ্কর্ষণকাণ্ডে নাকি ঈশ্বর সম্বন্ধেও অনেক কথা সন্নিবদ্ধ ও মীমাংসিত হইয়াছে; কিন্তু সে পুস্তক এপর্য্যন্ত সাধারণের লোচন-গোচর হয় নাই; সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোনপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করাই সঙ্গত বোধ হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শনই উক্ত ব্রহ্মবিদ্যার অবিসংবাদিত আকর বা আশ্রয়; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাকে উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শনেরই নিজস্ব সম্পত্তি বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের আলোচনা কালে, আমরা এ বিষয়ে বক্তব্য অন্যান্য বিষয় বিশদভাবে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। এখন দেখা যাউক, ব্রহ্মবিদ্যার উদ্দেশ্য বা চরম লক্ষ্য কি? এবং জীবজগতে তাহার উপযোগিতা আছে কি না?

আলোচ্য ব্রহ্মবিদ্যার চরম লক্ষ্য কি? এ প্রশ্নের উত্তরে

আমরা প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, ব্রহ্মবিদ্যার যথার্থ উদ্দেশ্য হইতেছে নিঃশ্রেয়স ও সমূলে অবিদ্যার উচ্ছেদ সাধন করা।

অবিদ্যাই সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার অনর্থের নিদান; অবিদ্যাই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্মপদার্থে আত্মবুদ্ধি সমুৎপাদন করিয়া জীবকে উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় অনন্ত অনর্থ-সাগরে নিক্ষিপ্ত করে, এবং অনাদি কাল হইতে জীবের স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক, তাহাকে যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকেই লইয়া যাইতেছে; জীবও কাঁচপোকাগৃহীত পতঙ্গের ন্যায় অবশভাবে তাহারই অনুসরণ করিতেছে! বিপুলকায় হস্তী যেরূপ আপনার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া স্বীয় কায়-গৌরব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ জীবও অবিদ্যা-নিরুদ্ধদৃষ্টি হইয়া নিজের গুরুত্ব অর্থাৎ জরামরণবর্জ্জিত অসীম অদ্বৈত ব্রহ্মভাব অনুভব করিতে পারে না এবং মায়াময় মোহনিদ্রায় বিমূঢ় হইয়া আপনাকে সসীম দেহপরিচ্ছিন্ন সামান্য প্রাণিমাত্র মনে করিয়া থাকে। ব্রহ্মবিদ্যার উদ্দেশ্য—উক্ত অবিদ্যা বিধ্বস্ত করিয়া, জীবের চিরসুপ্ত সেই ব্রহ্মভাব জাগরিত করিয়া দেওয়া। জীব একবার অবিদ্যার কবল হইতে বিমুক্ত হইলে, তাহার আর কোনও ভয় ভাবনা থাকে না; তখন সে মেঘনির্ম্মুক্ত শারদীয় শশধরের মত পূর্ণ প্রকাশে প্রকাশমান হইয়া, আপনাতে জন্ম-জরা-মরণবর্জ্জিত ও জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের অতীত ব্রহ্মভাব —"অহংব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকারে অনুভব করত শান্তিময়ী মুক্তির

ক্রোড়ে চিরদিনের তরে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। আচার্য্য গৌড়পদা বলিয়াছেন—

"অনাদি-মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥"

(মাণ্ডূক্যকারিকা)

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, প্রসিদ্ধ উপনিষদ্‌সমূহ আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, এই ব্রহ্মবিদ্যা পুরাকালে, অতি গোপনীয় রহস্যবিদ্যারূপে বিবেচিত ও সযত্নে রক্ষিত হইত; এবং যাহারা কঠোর সাধনা বলে আর্ষ বিজ্ঞান লাভ করত বিশ্ব-রহস্য প্রত্যক্ষ করিয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইতেন, কেবল সেই ঋষিসমাজের মধ্যেই ইহা নিবদ্ধ ছিল। ঋষিগণ অতুল ঐশ্বর্য্য, অপরিমেয় ভোগসম্পদ্ এবং উন্মাদনাকর প্রভুশক্তি অপেক্ষাও পরম আদরের বস্তু বিবেচনায় ইহার সেবায় নিরত থাকিতেন; এবং ইহার অনুশীলনেই জীবন অতিপাত করিতেন; এই জন্যই ব্রহ্মবিদ্যাকে একাধিক স্থানে "ঋষিসংঘজুষ্টম্" বলিয়া উল্লেখ করিতে দেখা যায়। ব্রহ্মবিদ্যা ঋষিগণের পরম প্রিয় গোপনীয় বস্তু হইলেও, উপযুক্ত শিষ্য-সম্প্রদায়ে সম্প্রদান করিতে কখনও আপত্তি ছিল না।

পুরাকালে গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে এক একটি সম্প্রদায় গঠিত হইত, এবং সেই সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্রহ্মবিদ্যার আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। গুরুশিষ্যভাবে বিদ্যাসম্প্রদানের উদ্দেশ্য দুইটী—প্রথম উদ্দেশ্য গুরুমুখীকৃত বিদ্যা যেরূপ ফলপ্রদানে সমর্থ

হয়, কেবল নিজের প্রতিভালব্ধ বিদ্যা সেরূপ ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না ; তাই উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি উপযুক্ত আচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তিই পরতত্ত্ব বুঝিতে পারে, নচেৎ পারে না। এবং—

"আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি" [ছাঃ ৪।৯।৩]

অর্থাৎ আচার্য্যের নিকট অধিগত ব্রহ্মবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ ফল সাধনে সমর্থ হয়। কাজেই গুরুমুখীকরণের প্রয়োজন আছে।

আচার্য্য রামানুজ বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যাত্মক শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন যে, মন্ত্র ও বিদ্যা গুরু-মুখলব্ধ হইলেই, তদ্দ্বারা মন্ত্রে ও বিদ্যায় একপ্রকার শক্তি সঞ্চারিত হয়। গুরুমুখীকৃত না হইলে, মন্ত্র ও বিদ্যা সেই শক্তিলাভে বঞ্চিত থাকে ; কাজেই যথাযথভাবে প্রযুক্ত হইলেও উপযুক্ত ফল প্রদানে সমর্থ হয় না ; এই কারণেই গুরুর নিকট বিদ্যা গ্রহণ করিতে হয়।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—বিদ্যার মর্য্যাদারক্ষা। উদারহৃদয় ঋষিগণ উপযুক্ত আশ্রিত শিষ্যে বিদ্যা সম্প্রদান করিতেন সত্য, কিন্তু অধিকারী ভিন্ন অনধিকারীতে কখনও উহা সম্প্রদান করিতেন না ; আর সম্প্রদান করিলেও, তাহা দ্বারা অনধিকারী শিষ্যের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইত না। (১) এ পদ্ধতির সারবত্তা বোধ হয়

---

(১) ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন—"বিদ্যয়া সার্দ্ধং ম্রিয়েত,ন বিদ্যামূষরে বপেৎ।"

সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ,
শ্রুত্বাপ্যন্যে বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা, কুশলোঽস্য লব্ধা,
আশ্চর্য্যঃ শ্রোতা কুশলানুশিষ্টঃ"॥ (কঠ ২।৭)

অর্থাৎ বহু লোকের পক্ষে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবার সুযোগ পর্য্যন্ত ঘটে না; বহুলোকে আবার ইহা শুনিয়াও বুঝিতে পারে না। ইহার বক্তা, শ্রোতা ও বোদ্ধা সকলেই আশ্চর্য্যময়।

অর্থাৎ বিদ্যা সঙ্গে করিয়া মৃত্যুও ভাল, তথাপি অনধিকারীকে বিদ্যা দান করা উচিত নহে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন—"নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ।" (শ্বেতাশ্বতর ৬।২২)। মনু আবার এ কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা।
তত্র বিদ্যা ন বক্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে॥
বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্ত্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং নত্বেনামিরিণে বপেৎ॥"
ইত্যাদি (২।১১২—১১৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও উপযুক্ত গুরুশুশ্রূষাবিহীন, ব্রহ্মবিদ্ গুরু তাহাকে বিদ্যা দান করিবেন না। কারণ, তাহাতে বিদ্যাসম্প্রদান, আর উষর ভূমিতে উত্তম বীজ বপন, দুইই বিফল। ব্রহ্মবাদী পুরুষ বিদ্যা সঙ্গে লইয়াই বরং মরিবেন, তথাপি ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইলেও অনধিকারীতে বিদ্যা দান করিবেন না॥

এই জন্যই বিচক্ষণ আচার্য্যগণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যগণের হৃদয়টী অগ্রে পরীক্ষা করেন; পরীক্ষা দ্বারা যদি বুঝিতে পারেন যে, ইহার হৃদয় বিষয়বাসনা, ভোগলিপ্সা ও কামাদি দোষে কলুষিত নহে, তবেই তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন; এবং ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন। কঠোপনিষদের যম-নচিকেতাসংবাদ ইহার একটী উত্তম উদাহরণ।

শিশু নচিকেতা যখন আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া যমরাজের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে
নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥" ১।১।২০)

এই যে বিশ্বব্যাপী একটা সংশয় আছে যে, মৃত্যুর পর আত্মার কি হয়? কেহ বলেন, মৃত্যুর পরও আত্মার অস্তিত্ব থাকে, আবার কেহ বলেন যে, না, মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না। আমি তোমার নিকট ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি।

অনন্তর যমরাজ নচিকেতার জ্ঞানাধিকার পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নচিকেতাকে নানাপ্রকার লোভনীয় বিষয়—যাহা মর্ত্ত্যলোকে অতি দুর্ল্লভ, তাহা দিতে সম্মত হইয়া আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন—

"যে যে কামা দুর্ল্লভা মর্ত্ত্যলোকে, সর্ব্বান্ কামান্
ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।" (কঠ ১।১।২৫)

হে নচিকেতঃ, মর্ত্ত্যলোকে যে সমস্ত লোভনীয় বস্তু অতি

দুর্লভ, তুমি ইচ্ছামত সে সমস্ত প্রার্থনা কর; তথাপি তুমি এবিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না।

নচিকেতা যখন সে সমুদয় লোভনীয় বিষয়েও মুগ্ধ হইলেন না, এবং আত্মবিষয়ক প্রশ্ন হইতেও কিছুতেই বিরত হইলেন না; তখন যমরাজ নচিকেতাকে পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রকৃত বিদ্যার্থী বুঝিয়া প্রসন্নচিত্তে বলিতে লাগিলেন—

"বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে, ন ত্বা কামা
বহবোঽলোলুপন্ত ॥" (কঠ ১।২।৫)

হে নচিকেতা, তোমাকে প্রকৃত বিদ্যাভিলাষী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি; কারণ, বিবিধ লোভনীয় বস্তুও তোমার চিত্তকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। যমরাজ এইরূপ পরীক্ষার পর নচিকেতাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের জন্য যে কোন লোক উপস্থিত হইলেই যে, আচার্য্যগণ ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিতেন, তাহা নহে; অগ্রে উত্তমরূপে অধিকার-পরীক্ষা দ্বারা যদি শিষ্যের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেন, তবেই তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিতেন; নচেৎ কেবল প্রিয় বচনে কিংবা অন্য কোন কারণে মুগ্ধ হইয়া অপাত্রে বিদ্যা দান করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার গৌরব হানি করিতেন না।

এইরূপ চিত্তপরীক্ষা যে, কেবল ব্রহ্মবিদ্যাদাতা আচার্য্য-সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে; পরন্তু সিদ্ধি-প্রয়াসী প্রত্যেক সাধকের সম্বন্ধেই এই প্রকার ব্যবস্থা ছিল ও আছে।

দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা যোগসাধনায় নিরত যোগী, সমাধি-সিদ্ধির পূর্ব্বে তাহাদিগকেও দেবতারা নানাপ্রকার লোভনীয় বিষয়ে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ইহার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা লোভপরতন্ত্র ভোগাভিলাষী, তাহারা অমোঘ সিদ্ধিশক্তি লাভ করিলে, তাহাদের দ্বারা জগতের প্রভূত অনিষ্ট সংঘটন হইবার সম্ভাবনা থাকে; সেই জন্য মহামহিম দেবতাবৃন্দ জগতের হিতার্থে তাহাদের চিত্তপরীক্ষায় অগ্রসর হন। এই জন্যই, প্রসিদ্ধ যোগদর্শন-প্রণেতা মহামুনি পতঞ্জলি যোগিগণকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন,—

"স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গ-স্ময়াকরণম্,
পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ॥ পাতঞ্জল সূত্র—৩।৫১)

ইহার ভাবার্থ এই যে, যোগের পর পর চারিটী ভূমি বা অবস্থা আছে,—(১) মধুপ্রতীকা, (২) মধুমতী, (৩) বিশোকা, (৪) সংস্কারশেষা। এইরূপ অবস্থাভেদে যোগীও চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন,—(১) প্রথমকল্পিক, (২) মধুভূমিক, (৩) প্রজ্ঞা-জ্যোতিঃ, (৪) অতিক্রান্তভাবনীয়। তন্মধ্যে যোগী যখন প্রথম ভূমি পার হইয়া দ্বিতীয় ভূমিতে আরোহণ করেন; তখনই বিশেষ বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত দেবতাগণ তাহার সমীপে সমাগত হইয়া নিজ নিজ অধিকারস্থিত নানাপ্রকার ভোগ্য বিষয় গ্রহণ করিবার জন্য যোগীকে সাদরে অনুরোধ করিতে থাকেন। সেই জন্য পতঞ্জলি ঋষি যোগীদিগকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন যে,

খবরদার, তোমরা কখনও দেবতাদের উপনীত সেই সমুদয় বিষয়ভোগে আসক্ত হইবে না, এবং নিজের যোগমহিমা দর্শনে গর্ব্বিত হইবে না; কারণ ঐ উভয় প্রকারেই পুনর্ব্বার অনিষ্ট: পাতের সম্ভাবনা আছে।

আমরা অনুসন্ধান করিলে প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ শিষ্যপরীক্ষার প্রমাণ প্রয়োগ ও উদাহরণ যথেষ্ট পরিমাণে পাইতে পারি। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আচার্য্যেরা শিষ্যের উপকারার্থই অধিকার-পরীক্ষা করেন, কিন্তু নিগ্রহের জন্য নহে। এই কারণেই প্রকৃত বিদ্যার্থী শিষ্যবর্গ বহুতর ক্লেশ সত্ত্বেও ব্রহ্মবিদ্যার জন্য গুরুর চরণে আত্ম সমর্পণপূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

কিন্তু এরূপ উদাহরণও বিরল নহে যে, কোন কোন মহাত্মা গুরুর কোনপ্রকার সাহায্য না লইয়াও কেবল তীব্র তপস্যা-প্রভাবেই ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরনামক উপনিষদে কথিত আছে,—

"তপঃপ্রভাবাৎ দেবপ্রসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরো হ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগ্
ঋষিসংঘজুষ্টম্॥" (৬।২১)

অর্থাৎ ঋষি শ্বেতাশ্বতর কেবল তপঃপ্রভাবে ও দেবতার অনুগ্রহে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া অত্যাশ্রমীদিগকে—যাহারা ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ, এই আশ্রমত্রয়ের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন —সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাহাদিগকে পরম পবিত্র ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন। এখানে গুরুসাহায্যের কোন কথাই নাই।

আবার এরূপও কোনস্থানে দেখা যায় যে, শিষ্য সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করিবার পরেও যদি গুরু কোন কারণে বিদ্যাদানে বিলম্ব করিতেন, তাহা হইলে দেবতাগণ করুণাপরবশ হইয়া নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিতেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে সত্যকাম জাবালের সম্বন্ধে এইরূপে বিদ্যালাভের কথা বর্ণিত আছে। সেখানে দেখা যায়, অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ হংসাদির মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক সত্যকামকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

আবার এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিষ্য গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার অভিলষিত ব্রহ্মবিদ্যা প্রদানের জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু গুরু তাহাকে কেবল ব্রহ্মের স্বরূপমাত্র নির্দ্দেশ করিয়া এবং তদ্বিষয়ে তপস্যা বা ধ্যানের উপদেশ দিয়াই নিরস্ত হইলেন। শিষ্য স্বীয় তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত হইলেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে কথিত আছে যে, বরুণতনয় ভৃগু পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিতে অনুরোধ করিলে পর, পিতা তাহাকে বলিলেন—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ; তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম ইতি"

(তৈত্তি ০ ভৃগু ০১)

অর্থাৎ দৃশ্যমান ভূতবর্গ যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপত্তির

পরেও যাহার সাহায্যে জীবিত আছে, এবং [illegible] সময়েও যাহাতে আশ্রয় লইতেছে; তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর; তাঁহাই ব্রহ্ম।”

পিতা বরুণ এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিরত হইলেন; অনন্তর, ভৃগু ব্রহ্মবিজ্ঞানমানসে তপস্যায় নিরত হইলেন; এবং তপোবলে যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইয়া কৃতার্থ হইলেন।

কোন কোন গ্রন্থে এরূপও নিদর্শন বর্ণিত আছে যে, গুরুও আছেন; শিষ্যও আছেন; অথচ গুরুর মুখে কোন কথা নাই—কোনও উপদেশ নাই—কেবলই মৌন; অথচ এমত অবস্থায়ও শিষ্যের হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকটিত হইতেছে। বোধহয়, এইরূপ বিস্ময়াবহ ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই প্রাচীনেরা বলিয়াছেন—

“গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু চ্ছিন্নসংশয়াঃ।”

অর্থাৎ ব্রহ্মোপদেশ বিষয়ে গুরুর মৌনাবলম্বনই প্রকৃত ব্রহ্ম-ব্যাখ্যান; সুচতুর বুদ্ধিমান্ শিষ্য তাহা হইতেই নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারেন যে, আমি যাহা জানিতে চাহি, সেই ব্রহ্মবস্তু অবাচ্য—বাক্য মনের অগোচর। অবাঙ্‌মনসগোচর ব্রহ্মের স্বরূপ ত কোন কথায়ই প্রকাশ করা যায় না; কাজেই গুরুর তাদৃশ মৌনব্রত অশোভন হইতেছে না। গুরুগণ কৃপাপরবশ হইয়া ব্রহ্মসম্বন্ধে যাহা উপদেশ করেন, বস্তুতঃ তাহা দিগ্‌দর্শনমাত্র। জগতে এমন কোন তাপস নাই, যিনি ‘শৃঙ্গগ্রাহী’ ন্যায়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইয়া দিতে পারেন। তাই ঋষিরা উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন—

“তদেতদিতি নির্দ্দেষ্টুং গুরুণাপি ন শক্যতে।”

সে যাহা হউক, উল্লিখিত ঘটনাসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিলে

ইহাই বুঝা যায় যে তপঃপ্রভাবেই হউক, আর দেবতানুগ্রহেই হউক, কিংবা গুরুর কৃপায়ই হউক, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই যে, উপযুক্ত অধিকার লাভ করিতে হয়, এবং সেই অধিকারই যে, দুর্গম অধ্যাত্ম-রাজ্যে প্রবেশের একমাত্র দ্বার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মলিন দর্পণে যেমন বিমল চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হয় না, তেমনি অনধিকারীর অশুদ্ধ চিত্তেও ব্রহ্মবিদ্যার বিমল আলোক প্রতিভাত হয় না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলে পর, জীবের সর্ব্ববিধ সংসার-ক্লেশ ও তাহার মূল কারণ অবিদ্যার উচ্ছেদ হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে পরমানন্দময় মোক্ষপদ অধিকৃত হয়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণের যথার্থ অধিকারী কে? কিরূপ গুণসম্পদ্ থাকিলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভে সে অধিকার জন্মে, এবং কি কারণেই বা বিশ্বজীব সেই অধিকার লাভে বঞ্চিত থাকিয়া আজীবন দুঃখধারা ভোগ করিতেছে? এখন এখানে সে কথার আলোচনা করা যাইবে।

ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী।

ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী কে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমেই বিশ্ববৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক মনে করি।

বিশ্ববৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, বৈচিত্র্যই জগতের সার সর্ব্বস্ব; যত দিন জগতের অস্তিত্ব আছে ও থাকিবে, মনে হয়, তত দিন এই বৈচিত্র্যের আধিপত্যও অব্যাহত আছে ও থাকিবে। আমাদের আলোচ্য অধিকার-ভেদও এই বিশ্ববৈচিত্র্যেরই অঙ্গভূত; সুতরাং এ সম্বন্ধে কাহারো মতভেদ না থাকাই স্বাভাবিক।

আমরা অতি অল্পমাত্র প্রণিধান করিলেই এই অধিকারভেদ সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিতে পারি। দেখিতে পাই, যে কার্য্যে আমার অধিকার আছে, তাহাতে অপরের আদৌ অধিকার নাই; আবার অপরের যে কার্য্যে সম্পূর্ণ অধিকার, তাহাতে আমার একেবারেই অধিকারের অভাব। এইরূপ যে কার্য্যে আমার ও অপরের অধিকার নাই, তৃতীয় ব্যক্তি আবার তাহাতেই স্বীয় অধিকারবলে লোকপ্রতিষ্ঠা ও বিমল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতেছে। এইরূপ ব্যবস্থাভেদ সর্ব্বত্র। এই জন্য বলিতে হয় যে, এই অধিকারভেদ

যেন বিশ্ববিধাতারই অভিপ্রেত ও জগতের চিরসহচর। যেখানে অধিকারগত এই প্রভেদ নাই, সেখানে জগতেরও অস্তিত্ব নাই; সে স্থানের নাম মহাপ্রলয় বা বিশ্ববিনাশ।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অধিকারগত প্রভেদের কারণ কি? পক্ষপাত-বিবর্জ্জিত সমদর্শী পরমেশ্বরের রাজ্যে এই বিষম বৈষম্যসৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসিগণ হয়ত বলিবেন, ইহা সয়তানের কাজ; পরমেশ্বর ইহার খোঁজ খবর রাখেন না; সুতরাং তিনি ইহার জন্য দায়ী নহেন। অতএব এরূপ প্রশ্ন আদৌ উঠিতেই পারে না। আবার যাহারা স্বভাবের সেবক—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি চিৎস্বরূপ পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকারে নিতান্ত নারাজ, তাহারা হয়ত বলিবেন—এই বিশ্ববৈচিত্র্য জড় প্রকৃতির স্বভাবসম্ভূত; অচেতনের কার্য্যে বৈচিত্র্যই শোভন হয়; কাজেই এ বিষয়ে কোন অনুযোগ করা চলে না ইত্যাদি।

প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি কিন্তু ঐরূপ অসার উত্তর শ্রবণে কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, এবং তাহাদের জিজ্ঞাসা-কৌতূহলও নিবৃত্ত হইতে পারে না; কারণ, আমরা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরের রাজ্যে বাস করি; সয়তানের কোন ধার ধারি না। উহাতে ভাল মন্দ যাহা কিছু হয়, সে সমস্ত পরমেশ্বরের অমোঘ ইচ্ছাশক্তি প্রভাবেই হয়; তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা অজ্ঞাতভাবে যে, কেহ কোনও কাজ করিতে পারে, এরূপ ধারণা ত দূরের কথা, চিন্তা করিতেও হৃদয় কাতর হয়। শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

"ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ॥" (বৃহদারণ্যক ৪।৫)

"এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।"

অর্থাৎ ইহারই শাসনের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; ইহারই ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে; অগ্নি তাপ দিতেছে, ইন্দ্র বারি বর্ষণ করিতেছে, এবং মৃত্যু স্বকার্য্যে অগ্রসর হইতেছে।

'হে গার্গি, এই অক্ষরনামক ব্রহ্মের শাসন বলেই সূর্য্য ও চন্দ্র অন্তরীক্ষে বিধৃত রহিয়াছে।'

'এই পরমেশ্বর সর্ব্ব জগতের সম্ভেদকার্য্য নিবারণার্থ সকলের মধ্যবর্ত্তী সেতুরূপে আছেন।' ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" (১৮।৬১)

অর্থাৎ 'হে অর্জ্জুন, পরমেশ্বর সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়দেশে বাস করেন; এবং যন্ত্রবদ্ধ পুতুলের ন্যায় মায়া বলে সকলকে পরিভ্রমণ করান।'

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য সমূহের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা পরমেশ্বরের রাজ্য, এখানে সয়তানের কোন আধিপত্য নাই। ইহার পর স্বভাববাদীর সম্বন্ধে কথা

এই যে, দৃশ্যমান বিশ্বযন্ত্রের পরিচালনাপদ্ধতি যেরূপ সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হইতেছে, তাহা একবার নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে,কোন মনস্বী মানব সেই করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপা-প্রার্থী না হইয়া, আত্ম-পরবোধবিহীন তুচ্ছ স্বভাব বা প্রকৃতির সেবায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? কাজেই এসমুদয় বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সমর্থন করা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। আমাদের মতে—

সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরের অমোঘ ইচ্ছাবশে গুণময়ী প্রকৃতি বা মায়াশক্তির পরিণামে এই জগতের সৃষ্টি। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ই প্রকৃতির স্বরূপ; সুতরাং গুণ-পরিণাম জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই উহা অনুস্যূত আছে,—কোথাও সত্ত্বগুণ অধিক, রজঃ ও তমঃ গুণ অল্প; আবার কোথাও রজোগুণ প্রবল,সত্ত্ব ও তমোগুণ দুর্ব্বল; কোথাও বা তমোগুণ অধিক, সত্ত্ব ও রজঃ গুণ অল্পমাত্র আছে। যেখানে যে গুণ প্রবল, সেখানে তদনুযায়ী ধর্ম্মই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন—

সত্ত্বগুণ সুখপ্রকাশশীল; এই জন্য তৎকার্য্যে—সাত্ত্বিকবস্তুতে জ্ঞান ও সুখাদি ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। যেমন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি। রজোগুণ ক্রিয়া ও দুঃখাদিস্বভাবযুক্ত; এইজন্য তৎকার্য্য রাজসিক বস্তুতেও ক্রিয়া ও দুঃখাদি ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে। আর তমোগুণ মলিন ও আবরণ-স্বভাব; এই কারণে তমোগুণসম্ভূত তামসিক বস্তুতে মালিন্য ও মোহাদি ধর্ম্মের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

জীবের অন্তঃকরণ সত্ত্বগুণের পরিণতি—সাত্ত্বিক; সুতরাং উহা স্বভাবতই প্রকাশশীল; সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই প্রকাশ করিয়া তদ্বিষয়ক অজ্ঞানান্ধকার অপনয়ন করিয়া থাকে। বিমল মণিদর্পণ যেরূপ সম্মুখস্থ সমস্ত বস্তু সমানভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, জীবের বুদ্ধি-দর্পণও তদ্রূপ সন্নিহিত সমস্ত বস্তু প্রকাশ করিতে অর্থাৎ অনুভবগোচর করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু অতি উত্তম দর্পণও যদি বাহিরের মলসংস্পর্শে কলুষিত বা মলিন থাকে, তাহা হইলে, সে যেমন সম্মুখস্থ বস্তুরও প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না; কিংবা গ্রহণ করিলেও, যথাযথভাবে গ্রহণ করে না, জীবের অন্তঃকরণও ঠিক তেমনই—যদি কামাদি মলদোষের সংস্পর্শে কলুষিত থাকে, তাহা হইলে তাহারও সন্নিহিত সমস্ত বিষয় যথাযথভাবে প্রকাশ করিবার অর্থাৎ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা থাকে না। অন্তঃকরণগত এই মালিন্যের তারতম্যানুসারেই জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে বিষম তারতম্য ঘটিয়া থাকে এবং তদনুসারে জ্ঞানাধিকারেও যথেষ্ট তারতম্য ঘটিয়া থাকে। জগতে ইহাই অধিকার ও অনধিকারের এবং তদ্গত প্রভেদের প্রধান কারণ। এইজন্যই সাংখ্যপ্রণেতা কপিলদেব বলিয়াছেন—

"অধিকারিত্রৈবিধ্যাৎ ন নিয়মঃ ॥" (সাংখ্যদঃ ১।৭০)

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সত্ত্বগুণের পরিণতি অন্তঃকরণ যখন সর্ব্বার্থগ্রহণে সমর্থ, তখন তাহাতে এমন কি দোষ সম্ভাবিত হয়

যাহার দরুণ তাহার সেই মহীয়সী প্রকাশ-শক্তিপর্য্যন্ত লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে? তদুত্তরে প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—

বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ সাধারণতঃ সত্বপ্রধান প্রকাশশক্তি-সম্পন্ন হইলেও, যে দোষে তাহার সেই শক্তি অভিভূত হয়, তাহা তিন-প্রকার—(১) মল, (২) বিক্ষেপ, (৩) আবরণ। তন্মধ্যে অনাদিকালসঞ্চিত বুদ্ধিগত কামলোভাদি ও তৎসংস্কারের নাম—'মলদোষ'। রজোগুণের প্রবলতা নিবন্ধন বুদ্ধির যে,সর্ব্বদা চাঞ্চল্য, তাহার নাম—'বিক্ষেপদোষ,আর বুদ্ধিগত স্বভাবস্বচ্ছতার আচ্ছাদক বা আবরক তামস অজ্ঞানের নাম—'আবরণ দোষ'।

উপরে, যে তিনপ্রকার দোষের উল্লেখ করা হইল, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত মলদোষটী সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল; বিক্ষেপ দোষটী তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, এবং শেষোক্ত আবরণ দোষটী তদপেক্ষাও সূক্ষ্মতর। এই কারণে উহাদের নিবারণের উপায়গুলিও ক্রমে স্থূল, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতরভাবে ব্যবস্থিত এবং ক্রিয়াযোগ, ধ্যানযোগ ও জ্ঞানযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে।

রজক যেমন বস্ত্রপরিষ্কার করিবার কালে প্রথমে ক্ষার, অগ্নিসংযোগ ও আহননাদি ক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করে এবং সেই উপায়ে বস্ত্রের স্থূল মলভাগ অপনীত করিয়া, পরে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর মলভাগ ক্ষয়ের জন্য যথাসম্ভব সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর উপায় অবলম্বন করে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মুমুক্ষু ব্যক্তিকেও তেমনি ক্রমে স্থূল, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর উপায়ের সাহায্যে বুদ্ধিগত দোষগুলি অপনয়ন করিতে হয়। তিনি প্রথমে নিত্য নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়া-

যোগের (১) সহায়তায় বুদ্ধিগত মলদোষ ক্ষালন করিবেন, পরে উপাসনার সাহায্যে বিক্ষেপ-দোষ দূর করিবেন এবং অবশেষে তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা আবরণদোষ অপনয়নপূর্ব্বক বুদ্ধির বিশুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা যথার্থ অধিকার প্রাপ্ত হন। এই জন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে সর্ব্বাদৌ শাস্ত্রোক্ত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইতে হয়।

পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মগুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

কাম্য, নিত্য ও নৈমিত্তিক। তন্মধ্যে কাম্য কর্ম্মের মুখ্য ফল—অভীষ্ট স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি, আর গৌণ ফল—চিত্তশুদ্ধি। নিত্য কর্ম্মের মুখ্য ফল চিত্তশুদ্ধি; গৌণ ফল—সত্য লোকাদি প্রাপ্তি; আর নৈমিত্তিক কর্ম্মের একমাত্র ফল—সম্ভাবিত পাপনিবৃত্তি। (২)

---

(১) পতঞ্জলি মুনি ক্রিয়াযোগের লক্ষণ করিয়াছেন "তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ॥" (পাতঞ্জলসূত্র ৩।১।)

অর্থাৎ তপস্যা, প্রণবাদি মন্ত্রের জপ এবং ঈশ্বরে প্রণিধান, এসমস্তের নাম ক্রিয়াযোগ।

(২) একঃ কাম্যঃ পরো নিত্যস্তথা নৈমিত্তিকঃ পরঃ।
প্রাধান্যেন ফলং শুদ্ধিরার্থিকী কাম্যকর্ম্মণঃ॥
প্রাধান্যেন মনঃশুদ্ধির্নিত্যস্য ফলমার্থিকম্।
কেবলং প্রত্যবায়স্য নিবৃত্তিরিতরস্য তু॥

বিদ্বন্মনোরঞ্জিনীধৃতস্মৃতসংহিতাবচনম্।

উল্লিখিত ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে কাম্যকর্ম্মমাত্রই বুদ্ধির মালিন্যবর্দ্ধক; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার অত্যন্ত প্রতিকূল; এই কারণে উহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে বুদ্ধির মল-দোষ বিনাশ করে ও বিশুদ্ধি বৃদ্ধি করে; এই কারণে ঐ দুইপ্রকার কর্ম্ম ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর অবশ্য গ্রহণীয়। নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহ অবিহিত বলিয়াই অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না; সুতরাং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষ কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, বুদ্ধিশুদ্ধির জন্য কেবল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন এবং আবশ্যকমত শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপক্ষয় করিতেও সর্ব্বদা সযত্ন থাকিবেন।

নিত্য কর্ম্ম কাহাকে বলে? শাস্ত্রবিহিত যে কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়, তাহা নিত্যকর্ম্ম। যেমন প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি। সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্মসমূহ না করিলে যে প্রত্যবায় হয়, এসম্বন্ধে সকলেই একমত হইয়াছেন, কিন্তু সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিলে যে কি হয়, তদ্বিষয়ে সকলে একমত হইতে পারেন নাই। এই কারণে নিত্যকর্ম্মের ফলসম্বন্ধে শাস্ত্রে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়।

কেহ বলিয়াছেন—সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কর্ত্তার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপরাশি বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অন্য সম্প্রদায় বলেন, সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্ম যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে, অনুষ্ঠাতার আর পাপসম্বন্ধ হইতে পারে না; অর্থাৎ প্রাতঃকালে সন্ধ্যানুষ্ঠান করিলে, সায়ংসন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত, তাহার হৃদয়ে কোনপ্রকার

পাপস্পর্শের সম্ভাবনা থাকে না।(১) ইহা ছাড়া সন্ধ্যোপাসনার প্রশংসাস্থলে কথিত আছে যে,—

"সন্ধ্যামুপাসতে যে তু নিয়তং সংশিতব্রতাঃ।
বিধৌতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥"

উল্লিখিত মতবাদ সমুদয় আলোচনা করিলে, আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে,যদিও সন্ধ্যোপাসনার উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনৈক্য পরিলক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু উহার যাহা প্রধান উদ্দেশ্য বা চরম লক্ষ্য,তদ্বিষয়ে অতিঅল্পমাত্র ও অনৈক্য বা বিরোধ-সম্বন্ধ নাই। কারণ, সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে সঞ্চিত পাপই নষ্ট হউক, আর পাপোৎপত্তির পথই রুদ্ধ হউক, অথবা বিধৌতপাপ হইয়া ব্রহ্মলোকেই যাউক, ফলতঃ চিত্তের বিশুদ্ধি-সাধন যে, উহার মুখ্য ফল বা চরম লক্ষ্য, এ সিদ্ধান্ত সকলের মতেই সমান। নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে, কিপ্রকারে চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হয়, তাহা বেদান্তের প্রসিদ্ধ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি-নামক গ্রন্থে অতি বিশদভাবে বর্ণিত আছে। যথা—

"নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পাপহানিঃ, ততশ্চিত্তশুদ্ধিঃ, ততঃ সংসারাত্ম-যাথাত্ম্যবোধঃ, ততো বৈরাগ্যম্, ততোমুমুক্ষুত্বম্, ততস্তদুপায়-পর্য্যেষণম্, ততঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ, ততো

(১) "ক্ষয়ং কেচিদুপাত্তস্য দুরিতস্য প্রচক্ষতে।
অনুৎপত্তিং তথা চান্যে প্রত্যবায়স্য মন্বতে॥"

যোগাভ্যাসঃ,ততশ্চিত্তস্য প্রত্যকৃপ্রবণতা, ততঃ তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যার্থবোধঃ, ততঃ অবিদ্যোচ্ছেদঃ, ততঃ স্বাত্মন্যবস্থানম্” ইতি।

অর্থাৎ নিয়মিতভাবে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, প্রথমে বুদ্ধির মালিন্যজনক পাপরাশি বিধ্বস্ত হয়, পাপধ্বংসের পর, চিত্তের বিশুদ্ধতা জন্মে, বিশুদ্ধ চিত্তে স্বতই সংসার ও আত্মার যথার্থ স্বরূপ, স্বভাব ও সদসদ্ভাব প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। তাহার পর ঐহিক ও পার-লৌকিক বিষয়ে ভোগস্পৃহা কমিয়া যায়, এবং বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয়; তাহার পরই মুমুক্ষুত্ব বা মুক্তি লাভের প্রবল ইচ্ছা এবং মুক্তির উপায়ান্বেষণে প্রবৃত্তি জন্মে; অনন্তর বিষয়াসক্তি-বর্দ্ধক কর্ম্মসমূহ আপনা হইতেই পরিত্যক্ত হইয়া যায়; তাহার পর যোগাভ্যাস, এবং পরমাত্মার দিকে চিত্তের উন্মুখীভাব জন্মে; পরে “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্যের প্রকৃতার্থবোধে ক্ষমতা জন্মে, অনন্তর সর্ব্বানর্থের নিদানভূত অবিদ্যার সমুচ্ছেদ বা আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলেই আত্মার স্বস্বরূপে অবস্থান অর্থাৎ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।’

এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, সমস্তই শাস্ত্রের আদেশ। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, যুক্তিও এ সব কথার অনুমোদন ও সমর্থন করিতেছে।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, কাম লোভাদি বৃত্তি ও তজ্জনিত

সংস্কারসমূহই চিত্তের প্রধানতঃ মালিন্যবর্দ্ধক; সুতরাং মল-পদবাচ্য। কাম্য কর্ম্মমাত্রেই চিত্তের আসক্তিবর্দ্ধক ও মালিন্যজনক। নিত্য কর্ম্মে সেরূপ কোনও ফলের উল্লেখ নাই; সুতরাং তাহাদ্বারা মনের মধ্যে কোনও নূতন কামনার সঞ্চার হয় না। অধিকন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে মনের কমনাপ্রবৃত্তিও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। বিশেষতঃ মানুষ যতক্ষণ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিবিষ্টচিত্ত থাকে, ততক্ষণ বাধ্য হইয়াই তাহাকে ভোগ-চিন্তা হইতে বিরত থাকিতে হয়; সুতরাং ততক্ষণ বিষয়-চিন্তাজনিত বাসনা দ্বারা কলুষিত হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। দীর্ঘকাল এইরূপে চিত্ত-পরিচালনা করিতে পারিলে, পূর্ব্বসঞ্চিত ভোগ-বাসনাসমূহ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ চিত্তপট হইতে মুছিয়া যায়। তাহার উপর, নিত্য কর্ম্মেরও এমন একটা বিশেষ শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে 'নির্ম্মলী-যুক্ত' জলের ন্যায়, তৎসংসৃষ্ট পুরুষের চিত্তগত সমস্ত পাপ-মল বিধ্বস্ত ও দূরীভূত করিয়া চিত্তের স্বচ্ছতা সমুৎপাদন করিয়া দেয়।

অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের মধ্যে নিত্যকর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম; কারণ, উহাতে কোন প্রকার কাম-গন্ধ নাই। প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, পুরাকালে অনেক মহাত্মা, যোগ, যাগ ও ধ্যান ধারণা প্রভৃতি কঠোর সাধনানুষ্ঠান না করিয়াও, কেবল নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানবলেই শুদ্ধচিত্ত ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। উদাহরণরূপে ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির নাম সর্ব্বাদৌ উল্লেখযোগ্য মনে করি।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান যেমন আবশ্যক, নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানও তেমনই একান্ত প্রয়োজনীয়। কোন প্রকার নিমিত্ত বা আগন্তুক ঘটনা উপলক্ষে যে সমুদয় কর্ম্ম কর্ত্তব্যরূপে বিহিত, সেই সমুদয় কর্ম্মের নাম নৈমিত্তিক কর্ম্ম যেমন গ্রহণ উপলক্ষে বিহিত স্নান দানাদি কর্ম্ম।

নৈমিত্তিক কর্ম্ম উপেক্ষা করিলে, বিহিতের অকরণ বা কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করা হয়। কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করা বড় অপরাধ। সেই অপরাধে তাহাকে পাপভাগী হইতে হয়। নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সেই পাপ-মলের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়; এই জন্য নৈমিত্তিক কর্ম্মকেও পরোক্ষভাবে চিত্তশুদ্ধির উপায় বলা হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের জন্য যে, নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক,তদ্বিষয়ে"কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্কে ততো জ্ঞানং প্রজায়তে।" অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত-মলরূপ দোষ পরিপক্ক—অর্থাৎ ক্ষয়োন্মুখ হইলে, তাহার পর তত্ত্ব-জ্ঞান সমুদিত হয়, নচেৎ হয় না, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রও এবিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল প্রধানতঃ চিত্ত-শুদ্ধির জন্য বিহিত ও অনুষ্ঠিত হইলেও, যেমন, ফলের জন্য রোপিত আম্র বৃক্ষ হইতেও আনুষঙ্গিকরূপে ছায়া ও গন্ধ প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম হইতেও, পিতৃলোক ও সত্যলোকাদি প্রাপ্তিরূপ আনুষঙ্গিক ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে;

কিন্তু মুমুক্ষু ব্যক্তি সে সমুদয় ফলের দিকে দৃষ্টি করিবেন না ; কারণ, তাহাতে পুনর্ব্বার চিত্ত-মালিন্যের সম্ভাবনা আছে।

উপরে যে, নিত্য কর্ম্মের কথা বলা হইল, উহা বস্তুতঃ নিষ্কাম কর্ম্মেরই রূপান্তর মাত্র। যে কর্ম্মে ভোগ বা ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির কামনা ও সম্ভাবনা না থাকে, বস্তুতঃ তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। নিত্য কর্ম্মে কোন প্রকার ভোগসম্পর্কই থাকে না ; সুতরাং তাহাও নিষ্কাম কর্ম্মমধ্যেই পরিগণনীয়।

কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগ

আরোগ্যকামী রোগীর যেরূপ ঔষধ-সেবন ও অপথ্যবর্জ্জন, উভয়ই আবশ্যক, তদ্রূপ চিত্তশুদ্ধিপ্রয়াসী ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর পক্ষেও নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা এবং সঙ্গে সঙ্গে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করাও একান্ত প্রয়োজনীয়। তাহা না করিলে, জিজ্ঞাসুর সমস্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম 'গজ-শৌচে'র ন্যায় সম্পূর্ণ বিফল হইবার সম্ভাবনাই অধিক [১]। সকাম লোকদিগের অভিলষিত ফলসিদ্ধির উদ্দেশে যে সমুদয় কর্ম্ম বিহিত সেই সমুদয় কর্ম্মকে কাম্য কর্ম্ম বলে। যেমন স্বর্গাভিলাষীর জন্য বিহিত 'অশ্বমেধ' যজ্ঞ প্রভৃতি।

কাম্য কর্ম্ম যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে, তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী।

---

(১) 'গজশৌচ'—হস্তীকে যত্নপূর্ব্বক স্নান করিয়া দিলেও, সে যেমন পুনশ্চ ধূলি দ্বারা তাহার অঙ্গ অপরিষ্কৃত করে। শুদ্ধচিত্ত লোকও তেমনি কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুনঃ মলিন হইয়া পড়ে।

কর্ম্মকর্ত্তা কেবল সেই অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল ভোগকরিয়াই নিশ্চিন্ত হয় না, পুনশ্চ তদনুরূপ বা ততোধিক ফল-কামনায় কর্ম্মান্তরে প্রবৃত্ত হয়; তাহারও ফলভোগাবসানে পুনর্ব্বার নব নব কর্ম্ম ও কামনার সৃষ্টি ও পুষ্টিসাধন করিতে থাকে। এইরূপে কামনা-চক্রের নিরন্তর নিষ্পেষনে তাহার চিত্ত আরও অধিক কাতর ও মলিন হইয়া পড়ে। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুশীলনে তাহার চিত্ত যতটুকু শুদ্ধি লাভ না করে, কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তদপেক্ষা অধিকতর মলিন হইয়া পড়ে। এই কারণে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুর পক্ষে কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই আবশ্যক।

কাম্য কর্ম্মের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, নিষিদ্ধ কর্ম্মের সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। নিষিদ্ধ কর্ম্মমাত্রই পাপজনক। পাপমাত্রই চিত্তের মালিন্যবর্দ্ধক; সুতরাং চিত্তশুদ্ধিকামী ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর পক্ষে কখনই তাহা অনুষ্ঠেয় বা অনুকূল নহে। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রথমতঃ কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জন করিয়া, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত হইবেন; এবং যতক্ষণে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে মল-শূন্য—বিশুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইবেন না।

চিত্ত মলহীন—বিশুদ্ধ হইলেও, তাহাতে 'বিক্ষেপ' দোষ থাকিয়াই যায়। বিক্ষিপ্ত চিত্তে কোন তত্ত্বই প্রকাশ পায় না। এই জন্য ব্রহ্মবিদ্যার্থীকে অতঃপর 'বিক্ষেপ' দোষ দূরীকরণ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে হয়।

প্রবল বায়ুপ্রবাহের মধ্যগত চঞ্চল দীপালোক যতই উজ্জ্বল

হউক না কেন, সে যেমন সম্মুখস্থ সমস্ত বস্তু সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না,তেমনি নির্ম্মল চিত্তও প্রবল রজোগুণে সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চলীকৃত হইলে, সে চিত্তও বিজ্ঞেয় নিখিল বিষয় নিঃসংশয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। এই কারণেই যোগসূত্রের ভাষ্যকার বেদব্যাস বিক্ষিপ্ত চিত্তকে যোগসিদ্ধির অনুপযোগী ও পরিপন্থী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)।

উক্ত 'বিক্ষেপ' দোষ দূরীকরণার্থ উপাসনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। উপাসনা অর্থ ব্রহ্মের সগুণভাব অবলম্বনপূর্ব্বক মানসিক ব্যাপার বা চিন্তা বিশেষ(২)। ধ্যানও ইহারই অন্তর্গত। নির্গুণ বিষয়ে উক্তপ্রকার উপাসনা সম্ভব হয় না; তদ্বিষয়ে একমাত্র জ্ঞানেরই অধিকার। উপাসনা স্বরূপতঃ জ্ঞানাত্মক হইলেও, ক্রিয়াস্বরূপ। উহা উপাসকের ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। অসত্য বস্তুও উপাসনার বিষয়ীভূত হইতে পারে, কিন্তু অসত্য বস্তু কখনও প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষ্য হইতে পারে না; কারণ, জ্ঞান কাহারও ইচ্ছাবৃত্তির অনুবর্ত্তী হয় না; উহা বস্তু-তন্ত্র। যে বস্তু যেরূপ, সেই বস্তুকে সেইরূপে গ্রহণ করাই

---

(১) "তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জ্জনীভূতঃ সমাধির্ন যোগপক্ষে বর্ত্ততে। ইত্যাদি (পাতঞ্জল ভাষ্য ১।১)

(২) "উপাসনং তু সগুণ-ব্রহ্মবিষয়কো মানসঃ ব্যাপারঃ" ইত্যাদি। (সদানন্দযতি)

জ্ঞানের স্বভাব। সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলেও তাহা অজ্ঞান বা ভ্রম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (৩)

আচার্য্য রামানুজ স্বামী স্বকৃত শ্রীভাষ্যমধ্যে জ্ঞান, উপাসনা ও ধ্যান, এই তিনই এক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"অতো বাক্যার্থজ্ঞানাদন্যদেব ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাচ্যং জ্ঞানং বেদান্তবাক্যৈর্বিবিধিৎসিতম্।"

---

(৩) "নন্বু জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া; ন, বৈলক্ষণ্যাৎ। ক্রিয়া হি নাম সা, যত্র বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে, পুরুষ-ব্যাপারাধীনা চ। যথা—'সন্ধ্যাং মনসা ধ্যায়েৎ' ইতি চৈবমাদিষু। ধ্যানং চিন্তনং যদ্যপি মানসং, তথাপি পুরুষেণ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুং শক্যতে, পুরুষতন্ত্রত্বাৎ। জ্ঞানং তু প্রমাণজন্যম্। প্রমাণং চ যথাভূতবস্তুবিষয়ং; অতো জ্ঞানং কর্ত্তুম-কর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুমশক্যং, কেবলং বস্তুতন্ত্রমেব তৎ। * * * তস্মান্মানসত্বেঽপি জ্ঞানস্য মহদ্বৈলক্ষণ্যম্।" (ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্য ১।১।৪)

মর্ম্মার্থ—ভাল, জ্ঞান তো মনের একপ্রকার ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে; তবে জ্ঞানের সহিত ক্রিয়ার পার্থক্য কি? না, পার্থক্য আছে। যাহা বস্তুর স্বরূপগত-তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয় না, এবং লোকের ইচ্ছাধীন ও বটে, তাহাই ক্রিয়া, যেমন 'মনে মনে সন্ধ্যার ধ্যান করিবে।' ইত্যাদি। ধ্যান অর্থ চিন্তা; উহা যদিও মনের বৃত্তিবিশেষ হউক, তথাপি উহার উপর কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য আছে। কর্ত্তা ইচ্ছানুসারে করিতে পারে, নাও করিতে পারে, অথবা অন্য প্রকারেও করিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানের উপর কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য নাই; উহা বস্তুতন্ত্র, অর্থাৎ বস্তুটি যেরূপ, জ্ঞানও সেইরূপই হইবে; নচেৎ উহা ভ্রম হইবে।

ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন-স্মৃতিসন্তানরূপম্—ধ্রুবা স্মৃতিঃ। স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ। সা চ স্মৃতির্দ্দর্শন-সমানাকারা।” (ব্রহ্মসূত্র ১।১।১)

অর্থাৎ তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবৃত্ত যে, ধ্যেয় বস্তুবিষয়ক চিন্তাপ্রবাহ, তাহার নাম ধ্যান। ইহারই নামান্তর ‘ধ্রুবাস্মৃতি’। সচরাচর আমাদের যে, স্মৃতি,(স্মরণাত্মক জ্ঞান) জন্মে, সে স্মৃতির বিষয় চিরদিনই পরোক্ষ। সে কখনও স্মর্য্যমাণ বস্তুটী প্রত্যক্ষ করিয়া দিতে পারে না; কিন্তু এই ধ্রুবা স্মৃতি তাহা পারে। ইহা স্মর্য্যমাণ বিষয়টীকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হয়; সুতরাং উপনিষদে যে, ব্রহ্মজ্ঞানের উল্লেখ আছে, বস্তুতঃ তাহা ধ্যান বা উপাসনা হইতে স্বতন্ত্র নহে ইত্যাদি। বলা আবশ্যক যে, আচার্য্য শঙ্কর ও তৎসম্প্রদায়ের কেহই একথার অনুমোদন করেন না। তাহাদের অভিমত কথা প্রথমেই বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত উপাসনা বহুভাগে বিভক্ত হইলেও, এখানে আমরা তাহার দুইটী মাত্র প্রধান বিভাগ প্রদর্শন করিতেছি—একটী প্রতীকোপাসনা, অপরটী সম্পদুপাসনা। তন্মধ্যে—প্রতীক উপাসনা অর্থ—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপাস্য বিষয়টীকে অবলম্বন না করিয়া তাহারই একদেশ বা গুণ নাম প্রভৃতিকে তৎস্বরূপে কল্পনাপূর্ব্বক উপাসনা করা। যেমন,ব্রহ্মবাচক প্রণবকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করা। আর সম্পদুপাসনা অর্থ—প্রকৃত উপাস্য পদার্থের আরাধনা না করিয়া, তদীয় বিভূতি বা গুণসম্পদ্

যুক্ত অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট বস্তুকে যথার্থ উপাস্য বস্তুর সঙ্গে অভিন্নবোধে আরাধনা করা (১)। যেমন—রাজার প্রতিনিধিকে 'রাজা' বলিয়া সেবা করা। শাস্ত্রে বহুপ্রকার উপাসনাপদ্ধতি বর্ণিত আছে, এখানে সে সমুদয়ের আলোচনা বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। অপরাপর বিদ্যাশিক্ষার ন্যায় উপাসনা গ্রহণেও স্থূল সূক্ষ্মাদি বিষয়-বিভাগের প্রয়োজন আছে।

ধনুর্বিবদ্যা-শিক্ষার্থী ব্যক্তি যেমন প্রথমে স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম লক্ষ্য বেধ করিতে অভ্যাস করে; ব্রহ্মবিদ্যার্থী পুরুষকেও তেমনই প্রথমে কোন একটী স্থূল বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়, সেই অবলম্বিত স্থূল বিষয়ে চিত্ত স্থিরীকৃত হইলে পর, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিতে হয়; তাহাতেও চিত্ত স্থিরতা লাভ করিলে ক্রমশঃ তদপেক্ষাও সূক্ষ্মতর বিষয় অবলম্বন করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

এইভাবে স্থূলসূক্ষ্মাদি ক্রমে উপাসনা দ্বারা উপাসকের চিত্ত স্থিরতা লাভ করিলে, ক্রমে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারেও যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকে।

আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—অমার্জ্জিতমতি যে সমুদয় লোক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-তত্ত্বসাক্ষাৎকারে অসমর্থ, তাহারা প্রথমে সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্ম অবলম্বনপূর্ব্বক উপাসনা করিবেন। ঐরূপ

---

(১) "অল্পালম্বনতিরস্কারেণোৎকৃষ্টবস্তুভেদজ্ঞানং সম্পদ্" ইতি।
রত্নপ্রভা)

উপাসনা প্রভাবে তাহাদের চিত্ত যখন স্থিরীকৃত ও বিশুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তখন নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব আপনা হইতেই তাহাদের চিত্ত-দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।' তাহাকে আর কিছুই করিতে হয় না।' তাঁহার সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়। (১)

অতএব ব্রহ্মবিদ্যার্থী ব্যক্তি প্রথমে ঐরূপ উপাসনা দ্বারা স্বীয় চিত্তগত বিক্ষেপ দোষ দূরীকৃত করিয়া, অনন্তর চিত্তের 'আবরণ' নামক তৃতীয় দোষ অপনয়নে যত্নপর হইবেন।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, চিত্তের প্রকাশ-শক্তিকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া অজ্ঞানকে 'আবরণ' দোষ বলা হয়। পটলাবৃত চক্ষু যেরূপ সবল থাকিয়াও সম্মুখস্থ বস্তু দর্শনে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ, মল ও বিক্ষেপ দোষ বিদূরিত হইবার পরও যদি জিজ্ঞাসুর চিত্ত অজ্ঞান-পটলে আবৃত থাকে, তাহা হইলে, সে চিত্তও জিজ্ঞাসুর বিজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয় না। এই জন্যই চিত্তগত আবরণ দোষ নিবারণের প্রয়োজন হয়। আবরণ দোষ দূরীকরণের জন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসুকে বিবেক, বৈরাগ্য ও শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি, এই ত্রিবিধ সাধন সঞ্চয় করিতে হয়। তন্মধ্যে—

১। বিবেক অর্থ—পৃথক্ করিয়া জানা—আত্মা ও অনাত্মা,

---

(১) "নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ॥
বশীকৃতে মনস্যেষাং সগুণ-ব্রহ্মশীলনাৎ।
তদেবাবির্ভবেৎ সাক্ষাদপেতোপাধিকল্পনম্" ইতি॥

এবং নিত্য ও অনিত্য পদার্থনিচয়ের পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপে জ্ঞান। তাহার ফলে, মুমুক্ষু উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন যে, আত্মা ব্রহ্ম-স্বরূপ; এবং ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য নিরাময় কূটস্থ সত্য; তদ্ভিন্ন অপর সমস্তই অনিত্য ও অসত্য।

২। বৈরাগ্য অর্থ—বৈতৃষ্ণ্য—ভোগতৃষ্ণার অভাব। বৈরাগ্য দুই প্রকার—পর বৈরাগ্য ও অপর বৈরাগ্য। তন্মধ্যে ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে তৃষ্ণানিবৃত্তির নাম অপর বৈরাগ্য। ত্রিগুণাত্মক বস্তুমাত্রেই যে তৃষ্ণার অভাব, তাহার নাম পর বৈরাগ্য। ইহাই বৈরাগ্যের চরম সীমা। পর বৈরাগ্যের উদয় হইলে ব্রহ্মলোক লাভের জন্যও চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। (১)

৩। শম দমাদি ষট্ সম্পত্তি কথার অর্থ—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি ও শ্রদ্ধা। তন্মধ্যে শম অর্থ অন্তঃকরণের সংযম, দম অর্থ বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম, অর্থাৎ বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়সমূহকে যথেষ্ট ভাবে বিষয় ক্ষেত্রে যাইতে না দিবার শক্তি সঞ্চয় করার নাম শম ও দম। বহিরিন্দ্রিয়-সংযমের পর অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম সহজ হয়; এই জন্য অগ্রে দম, পরে শম সাধনা করিতে হয়। উপরতি অর্থ ভোগ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করা। কেহ কেহ বলেন, উপরতি অর্থ সন্ন্যাস গ্রহণ। তিতিক্ষা অর্থ শীত-গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, অর্থাৎ ঐসমস্ত উপদ্রবেও কাতর বা চঞ্চল না হওয়া। সমাধি অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তিনিরোধ বা একাগ্রতা। শ্রদ্ধা

---

(১) "তৎ পরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্॥ দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।" (পাতঞ্জল ১।১)

অর্থ শাস্ত্র ও আচার্য্যবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস, অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্য যাহা উপদেশ করেন, তাহা কখনও মিথ্যা নহে, এইরূপ আস্তিক্য-বুদ্ধি স্থাপন।

উপরে যে কয়েকটী সাধনের উল্লেখ করা হইল, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সাধনগুলি পরবর্ত্তী সাধন সমূহের প্রযোজক বা সিদ্ধির উপায়। প্রথমতঃ নিত্যানিত্য বস্তু বিষয়ে বিবেক জ্ঞান জন্মিলে, সহজেই অনিত্য অসত্য ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে। বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে শম দমাদি সাধনেও প্রবৃত্তি আইসে; এবং শম দমাদি সিদ্ধ হইলে সর্ব্বসন্তাপবর্জ্জিত শান্তিময় মুক্তিলাভের ইচ্ছা বলবতী হইতে থাকে; ক্রমে সাধন-সম্পন্ন মুমুক্ষু ব্যক্তি মুক্তিময় সুধাস্বাদে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। বৃহন্নারদীয় পুরাণে এই কথাটী অতিসংক্ষেপে ও বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে—

"চতুর্ভিঃ সাধনৈরেতৈর্বিশুদ্ধমতিরচ্যুতম্।
সর্ব্বগং ভাবয়েদ্বিপ্রঃ সর্ব্বভূতদয়াপরঃ॥" (৩১।৫৪)

উক্ত সাধন আবার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভেদে দুই প্রকার। অভি-প্রেত ফলসিদ্ধির যাহা সাক্ষাৎ উপায়, যাহার অভাবে ফললাভ একেবারেই অসম্ভব, তাহা অন্তরঙ্গ সাধন। আর যাহা পরোক্ষভাবে বা পরম্পরা সম্বন্ধে ফললাভের উপায়, তাহা বহিরঙ্গ সাধন। ব্রহ্মবিদ্যার্থী পুরুষ প্রথমে বহিরঙ্গ সাধনগুলি আয়ত্ত করিয়া ক্রমে অন্তরঙ্গ সাধনের দিকে অগ্রসর হইবেন।

ব্রহ্মবিদ্যা

আমরা ব্রহ্ম-বিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার অধিকার-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া প্রস্তাবিত বিষয় হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছি; অথচ এখনও ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে; এই জন্য পুনশ্চ সেই ব্রহ্মবিদ্যারই অবতারণা করিতেছি।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই বেদচতুষ্টয়ই আলোচ্য ব্রহ্মবিদ্যার আকর স্থান। স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে জানিতে পারা যায় যে, দুগ্ধে নবনীতের ন্যায়, এবং তিলমধ্যে তৈলের ন্যায়, বেদের সর্ব্বত্রই ব্রহ্মবিদ্যার কথা বিদ্যমান রহিয়াছে।

তৃষাতুর অজ্ঞ পথিক যেরূপ জলাভিলাষী হইয়াও ফল্গুনদীর বাহ্য প্রকৃতি দর্শনে উহাকে জলহীন শুষ্ক বালুকাস্তূপমাত্র মনে করিয়া সরিয়া যায়, অথচ বিবেকী মানব ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে চেষ্টা দ্বারা উহারই অভ্যন্তরে পিপাসা-বারণক্ষম শীতল সলিল লাভে কৃতার্থ হয়; তদ্রূপ ত্রিতাপ-তাপিত মূঢ় মানব প্রচলৎ বেদরাশিকে ব্রহ্মসংস্পর্শশূন্য কেবল কঠোর কর্ম্ম-বিধায়ক মাত্র মনে করিয়া দূর হইতেই উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে উহার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক মনে করে না; অথচ যাহারা ধীরপ্রকৃতিসম্পন্ন এবং শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা সহকারে তত্ত্বানুসন্ধানে তৎপর, নিশ্চয়ই

তাহারা ঐ উপেক্ষিত সংহিতাভাগের মধ্যেই সর্ব্বদুঃখ-নিবারণক্ষম অনন্ত শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মবিদ্যার সন্ধান দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া থাকেন।

বেদেতে যাহা সূক্ষ্মরূপে—কেবল তীক্ষ্ণধী মনীষিমাত্র-সংবেদ্য বীজভাবে সন্নিবদ্ধ, তাহাই বিভিন্ন উপনিষদের মধ্যে আসিয়া শাখা, পল্লব ও সুকুমার কুসুমরাশিতে পরিশোভিত মহামহীরুহরূপে পরিণত হইয়া, জগজ্জীবের শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে অনন্ত শান্তি-চ্ছায়া প্রদানে সমর্থ হইয়াছে।

সংসারে যদি কেহ শোকতাপদগ্ধ হৃদয় জুড়াইতে এবং শান্তি-ময় সুধাস্বাদে অশান্তির তীব্র বেদনা বারণ করিতে চাহে এবং এই নরদেহেও অমরত্ব পাইতে ইচ্ছাকরে, তবে তাঁহার একমাত্র উপায় হইতেছে উপনিষদ্। উপনিষদ্ই জীবের জীবনে মরণে সহায়; হিতাহিত নির্দ্ধারণে বন্ধু এবং ভবিষ্যৎ জীবন-পথের উজ্জ্বল আলোকমালা।

বর্ত্তমান সময়ে এদেশে, কেবল এ দেশে কেন, সুদূর পাশ্চাত্য দেশেও শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু মনীষী পুরুষই ভারতীয় উপনিষদের আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন; এবং নিজ নিজ শিক্ষা সংস্কার রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে স্বাধীনভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া অনেকের নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইতেছেন। আমরা কিন্তু নানা কারণে সেরূপ স্বাধীন সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী হইতে পারিতেছি না। প্রথম কারণ, ঔপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যা অতি গোপনীয় অধ্যাত্মবিদ্যা; শুধু কথা ধরিয়া উহার প্রকৃত রহস্য নিষ্কাশন করা সম্ভব-

পর হয় না। উপনিষদের শব্দগুলি দুর্ব্বিজ্ঞেয় সেই অধ্যাত্ম-তত্ত্বের স্মারক মাত্র; প্রকৃত পক্ষে গুরুপরম্পরাক্রমে উপদেশপ্রাপ্ত আপ্ত আচার্য্যগণের শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়-কন্দরেই সেই রহস্য-রত্নরাশি চির কাল নিহিত আছে। যদি উপনিষদের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে হয়, তাহা হইলে সেই পূতচিত্ত আচার্য্যগণের প্রদর্শিত পদ্ধতিরই অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যাহারা তাহা না করিয়া কেবল শব্দ-সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া বিচার ও সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর নিকট তাহা কখনই প্রকৃত সিদ্ধান্তরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, শিক্ষা, সংস্কার, প্রবৃত্তি ও চিন্তাপদ্ধতির পার্থক্য। শিক্ষিত ব্যক্তিও যদি তত্ত্বানুসন্ধানে তৎপর হন; তথাপি তিনি পূর্ব্বসঞ্চিত শিক্ষা-সংস্কারের মোহ সহজে পরিত্যাগ করিতে পারেন না; সুতরাং তাহাদের মনোবৃত্তি যে, একই শব্দের বিভিন্নপ্রকার অর্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবে, ইহা বিচিত্র নহে, এবং ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে (১): এই জন্যই একই বুদ্ধদেবের একরূপ উপদেশ

---

(১) ভবভূতি বলিয়াছেন,—

"বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে,
নচ খলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা।
ভবতি চ তয়োর্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্‌যথা—
প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ॥"

অর্থাৎ গুরু, প্রাজ্ঞ ও মূর্খ উভয়কেই তুল্যরূপে উপদেশ করেন; তিনি তাহাদের জ্ঞানশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই করেন না। তথাপি পাত্রভেদে

হইতেও বিভিন্নপ্রকার একাধিক মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল।
উপনিষদ্ হইতেও আর একটী উদাহরণ দিতেছি। বৃহদারণ্য-
কোপনিষদে এইরূপ একটি আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে—

ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুঃ
দেবা মনুষ্যা অসুরাঃ। উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং দেবা ঊচুঃ—ব্রবীতু
নো ভবানিতি। তেভ্যো হ এতদক্ষরমুবাচ—'দ' ইতি।
ব্যজ্ঞাসিষ্টা ৩ ইতি? ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুঃ—'দাম্যত' ইতি
ন আত্থেতি ; ওমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৫।২।১)

অর্থাৎ প্রজাপতির তিন প্রকার সন্তান,—দেবতা, মনুষ্য ও
অসুর। ইহারা এক যোগে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক প্রজাপতির
সমীপে গমন করিয়াছিলেন। তথায় ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া প্রথমে
দেবতাগণ জ্ঞানোপদেশের জন্য প্রার্থনা করিলে পর, প্রজাপতি
দেবতাগণকে লক্ষ্য করিয়া 'দ' এই একটি মাত্র অক্ষর উচ্চারণ
করিলেন ; এবং দেবতাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা ইহার
অর্থ বুঝিতে পারিয়াছ ত? দেবগণ বলিলেন—হাঁ, বুঝিয়াছি ;
আপনি আমাদিগকে দান্ত বা দমগুণান্বিত হইতে আজ্ঞা করিতে-
ছেন। এইরূপে মনুষ্য ও অসুরগণ উপদেশ প্রার্থনা করিলে পর,

র্থাৎ প্রাজ্ঞ ও মূর্খভেদে উপদেশ-ফলে অত্যন্ত তারতম্য ঘটিয়া থাকে।
মন নির্ম্মল মণিখণ্ডই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু রাশীকৃত
ত্তিকাস্তূপও তাহা করিতে সমর্থ হয় না। অথচ মণিখণ্ড ও মৃত্তিকা-
পূ উভয়ই এক—পার্থিব পদার্থ।

তিনি তাহাদিগকেও সেই একই 'দ' অক্ষর উপদেশ করিলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি বুঝিয়াছ? তদুত্তরে মনুষ্যগণ বলিলেন, আমাদিগকে দানশীল হইতে বলিয়াছেন। অসুরগণ বলিলেন, আমাদিগকে দয়ালু হইতে আদেশ করিতেছেন। এস্থলে ইহার ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

"অথবা ন দেবা অসুরা বা অন্যে কেচন বিদ্যন্তে মানুষেভ্যঃ। মনুষ্যাণামেব অদান্তা যে, অন্যৈরুত্তমগুণৈঃ সম্পন্নাঃ, তে দেবাঃ; লোভপ্রধানা মনুষ্যাঃ, তথা হিংসাপরাঃ ক্রূরা অসুরাঃ। তে এব মনুষ্যা অদান্তত্বাদি-দোষত্রয়াপেক্ষয়া দেবাদিশব্দভাজো ভবন্তি।"

উক্ত উদাহরণের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণগত শক্তি ও শুদ্ধির তারতম্যভেদে একই উপদেশ বিভিন্নাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

অতএব একথা বলা বোধ হয় অনুচিত হইবে না যে, দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধনাবলে যাহারা দুর্জ্জয় মনোরাজ্য জয় করিয়া শুদ্ধি ও সিদ্ধির শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা, যে শ্রুতির যেরূপ অর্থ হৃদয়-দর্পণে উপলব্ধি করিয়া লোকহিতার্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন; তাহাই সেই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ, এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ পরিগ্রহ করাই আমাদের মত অপরিমার্জ্জিত ও অসংযতচিত্ত লোকদিগের একান্ত কল্যাণকর।

উপনিষদের ন্যায় অন্যান্য রহস্যশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দসমূহ কেবল প্রচ্ছন্ন গূঢ়ার্থের স্মারক বা স্মৃতিসংকেত মাত্র। শব্দ

উঁহাদের জীবন বা সর্ব্বস্ব নহে ; উহাদের সর্ব্বস্ব সম্পদ্ মহাপুরুষ-গণের হৃদয়ে নিহিত। উহা গ্রহণ করিতে হইলে, সর্ব্বদা তাঁহাদেরই সাহায্য লইতে হইবে, কিন্তু জড়বিজ্ঞানবিশারদ প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের পরামর্শ লইলে চলিবে না। কারণ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিক্ষা, সংস্কার ও চিন্তাপ্রবাহ সকলই সম্পূর্ণ পৃথক্ ও ভিন্ন পথে প্রবাহিত ; কাজেই তদুভয়ের সমন্বয় বা ঐকমত্য কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না।

বর্ত্তমান সভ্যতার আদর্শস্থল ও জড়বিজ্ঞানের পরমাচার্য্য প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ আলোচ্য উপনিষদ্-গ্রন্থগুলিকে সংস্কৃত ভাষা-রূপ মহাসমুদ্রের রত্নস্বরূপ উৎকৃষ্ট সাহিত্যমাত্র মনে করেন ; কিন্তু প্রাচ্য পণ্ডিতগণ উপনিষদ্ গ্রন্থকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরপ্রসূত মহাসত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করেন ; কাজেই উভয়ের চিন্তাপথ একপ্রকার হইতে পারে না।

যেমন স্থাপত্য-বিদ্যাবিশারদ কিংবা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কোন পণ্ডিত সম্মুখে যদি একটি সুন্দর মন্দির দর্শন করেন, তবে তিনি প্রথমেই সেই মন্দিরের রচনাচাতুর্য্য, চিত্রাদিগত বৈচিত্র্য, আকৃতি, অবস্থা, ও বয়স প্রভৃতি বাহ্য দৃশ্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু মন্দিরমধ্যে কোন দেবপ্রতিমা আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক মনে করেন না; কারণ, তাহাতে তাহার কোন প্রয়োজন নাই ; অথচ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি মন্দিরটী দেখিবামাত্র, তিনি বাহ্য দৃশ্যে দৃক্পাত না করিয়া প্রথমেই অনুসন্ধান করেন যে, উহার মধ্যে কোনও দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে কি না ;

কারণ, তাহার লক্ষ্য দেবমূর্ত্তিদর্শন ও পূজনাদি দ্বারা আত্মতৃপ্তি লাভ করা; কাজেই তিনি বাহ্য শোভায় আকৃষ্ট না হইয়া অভ্যন্তর দর্শনেই ব্যাপৃত হন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের চিন্তাপদ্ধতিও ঠিক তদ্রূপ। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ দেখেন, গ্রন্থের ভাষা, রীতি রচনা-পদ্ধতি ও বয়স্ প্রভৃতি, আর প্রাচ্য পণ্ডিতগণ দেখেন, গ্রন্থের ভাবগত গাম্ভীর্য্য ও আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি অলৌকিক বিষয় সমূহ।

এইরূপ বিরুদ্ধ পথগামী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাস্রোত একতা লাভ করিতে পারে না; পক্ষান্তরে, পরস্পর বিপরীত দিক্ হইতে সমাগত দুইটি মহানদীর সঙ্গমস্থলে যেরূপ বিষম জলাবর্ত্ত ও তরঙ্গমালা সমুত্থিত হয়, এবং সেই তরঙ্গাঘাতে উভয় তীরেরই অল্পাধিক পরিমাণে ক্ষতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিরুদ্ধপ্রকৃতি চিন্তার একত্র সম্মীলনে সেইরূপই একটা বিতর্কবাদের আবির্ভাব সম্ভাবিত হয় এবং উভয় পক্ষেরই অল্পাধিক পরিমাণে ক্ষতিও সাধিত হয়।

এরূপ অবস্থায় আমাদের পক্ষে কোন পথ অবলম্বনকরা শ্রেয়, তাহা সুধীগণ নিজেরাই স্থির করিয়া লইবেন।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, উপনিষদের ভাষা সরস ও সরল হইলেও সংক্ষিপ্তাক্ষরে সন্নিবিষ্ট বিধায় শ্লিষ্ট কাব্যের ন্যায় অনেকার্থ প্রকাশক। উহার ভাব হৃদয়গ্রাহী হইলেও বড়ই গম্ভীর ও দুরবগাহ; অনেকের পক্ষেই সহজে উহার মর্ম্ম গ্রহণকরা সম্ভব হয় না। এই অসুবিধা অপনয়নের জন্যই মহামুনি বেদব্যাস ব্রহ্ম-

সূত্রনামক বেদান্তদর্শন প্রণয়ন করিয়া উপনিষদের অর্থ নির্ণয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মহর্ষি জৈমিনি যেমন বৈদিক সংহিতা ভাগের তাৎপর্য্য নির্ণয়ের জন্য পূর্ব্বমীমাংসা প্রণয়ন করিয়াছেন, মহর্ষি বেদব্যাসও তেমনি উপনিষদ্ ভাগের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন রচনা করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের অপর নাম ব্রহ্মসূত্র। ইহাতে উপনিষদ্-বাক্যের অর্থনির্দ্ধারণের জন্য কোথায় কি প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, বা না হইবে, তাহা উত্তমরূপে বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, বেদব্যাসের সেই মীমাংসাগ্রন্থও সূত্রাকারে গ্রথিত থাকায় পদে পদে সংশয় সমুৎপাদন করে; সুতরাং তাহা বুঝিতেও আবার উপযুক্ত আচার্য্যের সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু যাহারা সেই সমুদয় পুণ্যতপা মহানুভব আচার্য্যদিগকে অবজ্ঞায় উপেক্ষা করিয়া, স্বাধীন চিন্তার গৌরব ঘোষণা করেন, এবং ইচ্ছানুসারে মনের মত ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পান, তাহাদের সেই চেষ্টা কেবল স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর মাত্র। প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ কখনই সেরূপ চেষ্টার অনুমোদন বা সমর্থন করিতে সম্মত হন না।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, উপনিষদ্ কাহাকে বলে? জগতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিয়া যে উপনিষদ্ শাস্ত্র অপূর্ব্ব গৌরবযুক্ত হইয়াছে, সেই 'উপনিষদ্' কথার যৌগিকার্থ কিরূপ? ব্রহ্মবিদ্যার সহিত উপনিষদের সম্বন্ধ কি প্রকার? এবং উপনিষদ্ ও বেদান্ত পৃথক্ শাস্ত্র? না একই

উপনিষদের পরিচয়।

শাস্ত্র? এই কয়েকটী বিষয় আলোচনা করিয়াই আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

উপনিষদ্ কাহাকে বলে, এ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে, উপনিষদ্ শাস্ত্রই বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ। বেদান্ত ও উপনিষদ্ একই শাস্ত্র। বেদান্তেরই অপর নাম উপনিষদ্। প্রসিদ্ধ উপনিষদের অতিরিক্ত 'বেদান্ত' বলিয়া কোন শাস্ত্র নাই; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, বেদান্তও যাহাকে বলে, উপনিষদ্ও তাহারই নাম; একই শাস্ত্রের দুইটী নাম-ভেদ মাত্র। (১)

শব্দবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, 'বেদান্ত' অর্থ বেদের অন্ত অর্থাৎ শেষ ভাগ। অসত্য হইলেও এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। তাহা এই—

প্রথমতঃ প্রত্যেক বেদশাখারই শেষ ভাগে 'ব্রাহ্মণ' ও 'আরণ্যক' ভাগ সংযোজিত আছে। 'সংযোজিত' বলাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ঐ সমুদয় ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগ বেদ রচনার বহুকাল পরে বিরচিত হইয়া কালক্রমে বেদাংশরূপে সন্নিবেশিত ও পরিগৃহীত হইয়াছে! পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এরূপ মনে করিলেও আমরা কিন্তু সেরূপ কল্পনা পোষণ করিতে কিংবা তৎপ্রদর্শিত যুক্তি সমর্থন করিতে পারি না। তাহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, সংহিতা ভাগের সহিত ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগের ভাষাগত পার্থক্য যখন যথেষ্ট রহিয়াছে, তখন ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক গ্রন্থ

---

(১) "বেদান্তো নাম উপনিষদ্ প্রমাণম্; তদুপকারীণি চ শারীরকসূত্রাদীনি। (বেদান্ত সার)।

কখনই এককর্ত্তৃক বা সমকালীন হইতে পারে না; সুতরাং তাহাদের পক্ষে ঐরূপ মনে করাও বিচিত্র নহে ; আমাদের কিন্তু মনে হয়, সংহিতার সহিত ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগের ভাষা ও বিষয়গত পার্থক্যের কারণ অন্যপ্রকার। সংহিতাভাগ কাব্য নহে ; উহা মন্ত্র ; সুতরাং 'জয়দেবের' 'ললিত-লবঙ্গলতা' প্রভৃতি ললিত মধুর শব্দ-বিন্যাস উহার লক্ষ্য নহে। সঙ্গীতের পদবিন্যাস যেরূপ তান এবং লয়াদির অনুযায়ী ; মন্ত্রের পদবিন্যাসও ঠিক সেইরূপই একজাতীয় (অন্তর্ব্বিজ্ঞানসম্মত) স্বর ও মাত্রাদি ক্রমের অনুগামী ; সুতরাং সে স্থলে শব্দ-সৌষ্ঠবের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

যে বর্ণের পর, যে বর্ণ বিন্যস্ত থাকিলে বাক্যে অলৌকিক শক্তিবিশেষ সমুদ্বোধিত হইতে পারে, ঠিক সেই বর্ণের পর সেই রূপ বর্ণই বিন্যস্ত হইয়া বিভিন্নপ্রকৃতির বিভিন্নাকার মন্ত্র প্রকটিত হইয়াছে। উহার একটি মাত্র বর্ণেরও ব্যতিক্রম বা বিকৃতি ঘটিলেই মন্ত্রের মন্ত্রত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং উহা লৌকিক বাক্যে পরিণত হয়। তাদৃশ বাক্য প্রযত্নসহকারে প্রযুক্ত হইলেও, উপযুক্ত ফল প্রসবে সমর্থ হয় না ; পক্ষান্তরে ঐরূপ বিকৃত মন্ত্র প্রয়োগে অনিষ্ট ফলেরই সম্ভাবনা অধিক। ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমেতি
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ ॥

অর্থাৎ মন্ত্র যদি স্বরহীন, বর্ণহীন অথবা অযথাভাবে প্রযুক্ত (ব্যবহৃত) হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র অভিমত ফল প্রদান করে

না; পরন্তু সেই মন্ত্র-বাক্যই বজ্ররূপী হইয়া যজমানের অনিষ্ট সাধন করে। স্বরহীনতা দোষ যে, অনিষ্ট ফলপ্রদ হয়, 'ইন্দ্রশত্রুঃ' এই মন্ত্রই তাহার উদাহরণ (১)।

ইহা হইতেও বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বৈদিক সংহিতা-ভাগের ভাষা ও পদবিন্যাসের প্রণালী হইতে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক বা উপনিষদ্ ভাগের ভাষা ও পদবিন্যাসের পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়াই স্বাভাবিক; একরূপ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যেও স্থানে স্থানে মন্ত্রবিশেষ সন্নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদয়ের ভাষা ও পদবিন্যাসক্রম ঠিক সংহিতাভাগেরই অনুরূপ। অতএব কেবল ভাষা ও পদবিন্যাস-পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়াই কোন গ্রন্থের কাল ও কর্তৃভেদ প্রভৃতি কল্পনার প্রয়াস কেবল সাময়িক কৌতূহলের ফল ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

---

(১) একদা অসুরগণ একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল দেবরাজ ইন্দ্রকে ধ্বংস করিতে পারে, এরূপ একজন বীর পুরুষ লাভ করা। তদনুসারে পুরোহিত 'ইন্দ্রশত্রুঃ বিবর্দ্ধস্ব' এইরূপ বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিলেন। কিন্তু 'ইন্দ্রশত্রু' পদে তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি, দুই প্রকার সমাসই হইতে পারে। উদাত্তাদি স্বরভেদে তাহা ঠিক করা হয়। তৎপুরুষ সমাসে অর্থ হয়, ইন্দ্রের শত্রু, আর বহুব্রীহি সমাসে অর্থ হয়, ইন্দ্র যাহার শত্রু (বিনাশক)। পুরোহিত তৎকালে যেরূপ স্বরে ঐ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা বহুব্রীহি-সমাসেরই অনুরূপ; সুতরাং সেই যজ্ঞের ফল অসুরগণের অভিপ্রায়ের প্রতিকূল হইয়াছিল। যজ্ঞফলে বৃত্রাসুরের জন্ম হইল সত্য, কিন্তু সে ইন্দ্রকে বধ না করিয়া ইন্দ্রকর্তৃকই নিহত হইল।

যাহারা ঐরূপ কল্পনা-কৌশলের নিতান্ত পক্ষপাতী ; অ[illegible] । হয়, দীর্ঘকাল পরে, তাহাদের শিষ্য প্রশিষ্যগণ সুপ্রসিদ্ধ 'দুর্গেশ-নন্দিনী' ও 'কৃষ্ণচরিত্রে'র রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রকেও বিভিন্ন-কালীন বিভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র আয়েসার রূপ-লাবণ্য বর্ণনে যেরূপ ভ[illegible] প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, 'কৃষ্ণ চরিত্রে' ত সেরূপ ভাষা ও রীতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। কাজেই তিনি এক হইয়াও অনেকাকার পরিগ্রহ করত অদ্বৈতবাদ-সম্মত বিবর্ত্তবাদের একটা উত্তম উদাহরণস্থল হইবেন, মনেকরা, বোধহয় বড় অসঙ্গত হইবে না।

যাহা হউক প্রসঙ্গক্রমে আমরা আলোচ্য বিষয় হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। এখন যাহা বলিতে ছিলাম, তাহাই বলিতেছি।

আমরা বলিতে ছিলাম যে, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকভাগ যদিও সংহিতা ভাগের শেষাংশরূপে সন্নিবিষ্ট থাকুক, তথাপি ঐ উভয় ভাগ যে, পরবর্ত্তী কালে পৃথক্‌ভাবে বিরচিত হইয়া সংহিতার সহিত সংযোজিত হইয়াছে, তাহা নহে। উহা সংহিতারই চির-সহচর অবিযুক্ত অংশবিশেষ মাত্র। "মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনাম-ধেয়ম্" এই আপস্তম্বসূত্রে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সম্মিলিত নাম বেদ; সুতরাং ব্রাহ্মণ ভাগকে বেদবহির্ভূত স্বতন্ত্র গ্রন্থ কিছুতেই বলিতে পারা যায় না।

প্রত্যেক সংহিতার শেষে যেমন ব্রাহ্মণ ভাগ সন্নিবিষ্ট আছে তেমনি প্রত্যেক ব্রাহ্মণের শেষেও এক একটি উপনিষদ্ নিবদ্ধ

আছে। এই উপনিষদ্ই যথার্থ বেদান্ত। অধিকাংশ উপনিষদ্ গ্রন্থ বেদের অন্তে—শেষভাগে সন্নিবিষ্ট; এইজন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, বেদের অন্তে সন্নিবিষ্ট বলিয়া উপনিষদ্‌ভাগ 'বেদান্ত' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহাদের ঐরূপ চিন্তা সত্য ও সমীচীন নহে।

কারণ, অধিকাংশ উপনিষদ্ বেদের অন্তে অবস্থিত হইলেও এমন কতক গুলি উপনিষদের খবর পাওয়া যায়, যেগুলি যথা-সম্ভব বেদের আদি ও মধ্যভাগ অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে। উদাহরণ স্থলে সুপ্রসিদ্ধ ঈশোপনিদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত উপনিষদ্‌খানি যে, বাজসনেয়ি সংহিতাভাগের অন্তর্গত মন্ত্রাত্মক, এ বিষয়ে কাহারও সংশয় বা আপত্তি দেখা যায় না, এবং সংহিতা ভাগ যে, ব্রাহ্মণভাগের পূর্ব্ববর্ত্তী, এ সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত কৌষীতকী উপনিষদ্ প্রভৃতিও সংহিতাভাগেরই অন্ত-র্গত; সুতরাং বেদের অন্তে অবস্থিত বলিয়াই উপনিষদ্‌কে 'বেদান্ত' বলিতে হইলে উক্ত ঈশোপনিষদ্ প্রভৃতিকে বেদান্তশ্রেণী হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতে হয়। অথচ শঙ্কর প্রভৃতি পূজ্যপাদ আচার্য্য-গণ সসম্মানে ঈশোপনিষদ্ প্রভৃতিকে অতি শ্রদ্ধেয় বেদান্তগ্রন্থ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

বিশেষতঃ বহু প্রামাণিক গ্রন্থে উপনিষদ্‌কে 'বেদশিরঃ' শ্রুতি-শিরঃ' ও 'বেদমূর্দ্ধা' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিতে দেখা যায়। অতএব 'বেদের অন্তে স্থিত' বলিয়া যে, উপনিষদের বেদান্ত নাম হইয়াছে, এরূপ যুক্তি কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না

তাহার পর, কেবল ব্যাকরণ বা অভিধানের সাহায্যেই সর্ব্বত্র শব্দার্থনিরূপণ করা চলে না। শব্দার্থনির্দ্ধারণের জন্য আরও অনেকগুলি উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। সেগুলি ত্যাগ করিলে, কোন শব্দেরই সম্যক্ ব্যবহার চলিতে পারে না।*

মনে করুন, 'গো' শব্দটি গমনার্থক 'গম্' ধাতু হইতে ডোস্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার যৌগিকার্থ হইতেছে—গমনকর্ত্তা অর্থাৎ যিনি গমন করেন। এতদনুসারে গতিশীল ব্যক্তি মাত্রকেই 'গো' বলা যাইতে পারে। কিন্তু গতিশীল কোন লোককে গো বা ঐ প্রকার কোনও মধুর শব্দে সম্বোধন করিলে বোধহয় তিনি নিশ্চয়ই পরিতুষ্ট হইবেন না।

(*) একজন প্রবীণ বৈয়াকরণ পণ্ডিত একদা একটা ভীষণ ব্যাঘ্রসংকুল প্রদেশে উপস্থিত হন। তিনি যখন মলত্যাগের জন্য বহির্গমনে উদ্যত, তখন তত্রত্য লোকেরা তাহাকে বলিয়া দিলেন যে, 'এখানে বড় ব্যাঘ্রভয়, আপনি খুব সাবধানে যাইবেন'। তিনি সে কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তিবাদ চিন্তা করিতে লাগিলেন! তিনি স্থির করিলেন, বি ও আঙ্পূর্ব্বক 'ঘ্রা' ধাতু হইতে 'ব্যাঘ্র'পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ঘ্রা' ধাতুর অর্থ গন্ধগ্রহণ বা আঘ্রাণ করা; সুতরাং ব্যাঘ্র যেরকম জন্তুই হউক না কেন, সে ত আঘ্রাণ করা ভিন্ন আর কিছুই করিবে না; তবে আর ভয়ের কারণ কি? এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যেই বনের ধারে মলত্যাগ করিতে বসিলেন, তৎক্ষণাৎ এক ভীষণাকৃতি ব্যাঘ্র আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার ব্যাকরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া দিল!

প্রকৃতপক্ষে এখানে 'অন্ত'শব্দের প্রকৃত অর্থ—সারাংশ বা চরম সিদ্ধান্ত, কিন্তু শেষভাগ নহে। উদাহরণরূপে আমরা এখানে ভগবদ্‌গীতার—

"উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।"

এই বাক্যটী উদ্ধৃত করিতে পারি। সকল ব্যাখ্যাকর্ত্তাই এখানে 'অন্ত' শব্দের 'নির্ণয় বা চরম সিদ্ধান্ত'অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এতদনুসারে 'বেদান্ত'শব্দের অর্থ হইতেছে বেদের সারভূত বা চরম সিদ্ধান্ত।

উপনিষদ্‌ই বেদান্ত। বেদের আদি, মধ্য ও অবসান সর্ব্বত্রই উহার অবস্থিতি সম্ভব; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক 'ঈশোপনিষদ্' সংহিতাভাগের অন্তর্গত হইলেও, উহাকে বেদান্ত হইতে বহিষ্কৃত করিবার কিংবা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিবার কোনও উপযুক্ত কারণ দেখা যায় না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বেদ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত—একভাগের নাম মন্ত্র ও অপর ভাগের নাম ব্রাহ্মণ। তন্মধ্যে সংহিতাভাগে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া ও তাহার বিধিবিধান প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট আছে, আর ব্রাহ্মণভাগের মধ্যে প্রধানতঃ ক্রিয়াপদ্ধতি, ইতিহাস ও উপনিষদ্‌প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞেয় বিষয় স্থান পাইয়াছে। এতদ্দর্শনে সহজেই লোকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা উপস্থিত হইতে পারে যে, সংহিতাভাগে বোধ হয়, কেবল রাশীকৃত ঘৃত, কাষ্ঠ ও মেষ মহিষাদি হিংসার কথা ভিন্ন অধ্যাত্ম-চিন্তার কোনও নাম গন্ধই নাই; সেই ভ্রান্তি নিরসনের নিমিত্তই

যেন, স্বয়ং শ্রুতিই সংহিতাভাগের মধ্যেও, উপাসনা ও অধ্যাত্ম-চিন্তাত্মক ব্রহ্মবিদ্যার সমাবেশ দ্বারা ক্রিয়াসক্ত জীবকে চরম লক্ষ্য বিষয়ে চিন্তা করিবার ঈঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং সংহিতা-ভাগের মধ্যে উপনিষদ্ বেদান্তের সন্নিবেশ থাকা অনুচিত বলিয়া মনে হয় না। অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, 'উপনিষদ্' কথার মুখ্য অর্থ কি? কেনই বা উপনিষদ্‌কে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া গৌরব করা হইয়া থাকে? আমরা 'উপনিষদ্' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করিলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে পারি। কারণ, উপ-নি-পূর্ব্বক 'সদ্' ধাতু হইতে 'ক্বিপ্' প্রত্যয়যোগে 'উপনিষদ্'পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপ অর্থ—সামীপ্য ও শীঘ্র; নি অর্থ—নিশ্চয়; সদ্‌ধাতুর অর্থ—গতি অর্থাৎ প্রাপ্তি, শীর্ণকরা ও অবসাদন (দুর্ব্বল করিয়া দেওয়া); সুতরাং 'উপনিষদ্' শব্দ হইতে আমরা তিনপ্রকার অর্থ পাইতে পারি।

(১) যে বিদ্যা অনুশীলিত হইলে সাধককে শীঘ্র নিশ্চিতরূপে ব্রহ্ম বস্তু প্রাপ্ত করাইয়া দেয়, কিংবা ব্রহ্মসমীপে লইয়া যায়; সেই বিদ্যার নাম—উপনিষদ্।

(২) যে বিদ্যা সেবিত হইলে, সংসার ও তৎকারণীভূত অবিদ্যা শীর্ণহয়—ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়; তাহার নাম—উপনিষদ্।

(৩) যাহা অধিগত হইলে পর, অবিদ্যা ও তৎকার্য্য সমস্তই অবসন্ন—দুর্ব্বল বা স্বকার্য্যকরণে অসমর্থ হইয়া পড়ে, সেই বিদ্যার নাম—উপনিষদ্।

ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতীত আর কিছুতেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না, এবং

হইতেও পারে না; এই নিমিত্ত যথোক্তপ্রকার ব্রহ্মবিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই উক্ত উপনিষদ্-পদবাচ্য হইতে পারে না। এই কারণে উপনিষদ্ বলিলেই ব্রহ্মবিদ্যা বুঝায়। ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদের সার সর্ব্বস্ব। সাক্ষাৎ উপনিষদ্ হইতেও আমরা এইরূপ অর্থই অবগত হইতে পারি। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥"
"তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত,
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্ ॥"

অর্থাৎ যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মপুরুষকে জানিতে পারা যায়, তাহাকে সেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন।' এবং 'যাহারা যথাবিধি 'শিরোব্রত' নামক ব্রত আচরণ করিয়াছেন, তাহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে, অপরকে বলিবে না।'

আচার্য্য শঙ্কর কঠোপনিষদের ভাষ্য-প্রারম্ভে বলিয়াছেন—'উপনিষদ্' শব্দেন চ ব্যাচিখ্যাসিত-গ্রন্থপ্রতিপাদ্য-বেদ্য-বস্তু-বিষয়া বিদ্যা উচ্যতে। কেন পুনরর্থযোগেনোপনিষচ্ছব্দেন বিদ্যোচ্যতে? উচ্যতে, যে মুমুক্ষবঃ দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্ত উপনিষচ্ছব্দবাচ্যাং বক্ষ্যমাণলক্ষণাং বিদ্যাম্ উপসদ্য উপাস্য তন্নিষ্ঠতয়া নিশ্চয়েন শীলয়ন্তি, তেষামবিদ্যাদেঃ সংসারবীজস্য বিশরণাৎ হিংসনাদ্বিনাশনাদ্ ইত্যনেনার্থযোগেন বিদ্যা উপনিষদিত্যুচ্যতে। + + + অবিদ্যাদেঃ সংসারহেতোর্ব্বিশরণাদেঃ

সদি-ধাত্বর্থস্য গ্রন্থমাত্রেঽসম্ভবাৎ বিদ্যায়াং চ সম্ভবাৎ, গ্রন্থস্যাপি তাদর্থ্যেন তচ্ছব্দোপপত্তেঃ, 'আয়ুর্বৈ ঘৃতম্' ইত্যাদিবৎ। তস্মাৎ বিদ্যায়াং মুখ্যয়া বৃত্ত্যা উপনিষচ্ছব্দো বর্ত্ততে, গ্রন্থে তু ভক্ত্যাইতি।"

'প্রথমে আশঙ্কা করিলেন যে, কিরূপ অর্থসম্বন্ধ নিবন্ধন উপনিষদ্‌শব্দে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থ বুঝায়? তদুত্তরে বলিলেন—যে সমুদয় মুমুক্ষু পুরুষ ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইয়া উপনিষদ্-শব্দবাচ্য বিদ্যার একনিষ্ঠভাবে অনুশীলন করেন, তাহাদের সংসারবীজ অবিদ্যাপ্রভৃতি বিনষ্ট করিয়া দেয় বলিয়া এই বিদ্যাকে 'উপনিষদ্' বলা হইয়া থাকে। সংসারবীজ বিনষ্ট করা গ্রন্থের পক্ষে সম্ভব হয় না, বিদ্যার পক্ষেই সম্ভব হয়; এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদ্ পদের মুখ্য অর্থ, গ্রন্থে তাহার গৌণ প্রয়োগ মাত্র।

অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, এইরূপ বহুস্থানে উপনিষদ্‌কে ব্রহ্মবিদ্যানামে অভিহিত করা হইয়াছে। (১) কিন্তু পুরাকালীন অধ্যাত্মশাস্ত্রে উক্ত উপনিষদ্ শব্দটী প্রায়শঃ রহস্য নামরূপেই ব্যবহৃত হইত। বৃহদারণ্যকে উল্লিখিত আছে 'তস্যোপনিষদ্ সত্যস্য সত্যম্।" অর্থাৎ ব্রহ্মের গুহ্য নাম কি? না, সত্যের সত্য।

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে, "অন্নবান্ অন্নাদো ভবতি, য এবং

---

* "সেয়ম্ ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ্‌শব্দবাচ্যা; তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্যাত্যন্তাবসাদনাৎ। উপ-নি-পূর্ব্বস্য সদেস্তদর্থত্বাৎ। তাদর্থ্যাৎ গ্রন্থোঽপি উপনিষদুচ্যতে। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-শাঙ্করভাষ্যভূমিকা)।

সাম্নামুপনিষদং বেদ।" "তেভ্যো হৈতামুপনিষদং প্রোবাচ।" ইত্যাদি।

উপনিষদ্ অতি রহস্য বিদ্যা বলিয়াই, পূর্ব্বকালে যে-সে লোক ইহা লাভ করিতে পারিত না। বিশেষ সাধন ও সংযম দ্বারা যাহাদের চিত্তবৃত্তি নিযন্ত্রিত ও পরিমার্জ্জিত হইত, কেবল তাহারাই এই উপনিষদ্ গ্রহণে অধিকারী হইতেন। আচার্য্যগণও সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কেবল উপযুক্ত শিষ্যের প্রতিই উপনিষদের উপদেশ প্রদান করিতেন। এসম্বন্ধে অন্য সমস্ত কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন উপনিষদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতেছি।

উপনিষদের লক্ষ্য।

উপনিষদের লক্ষ্য যে, কি, তাহা উপনিষদ্ হইতেই জানিতে পারা যায়।

"বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ
শুদ্ধসত্ত্বাঃ
তে ব্রহ্ম লোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ
পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥" (মুণ্ডক ৩।২।৬)

"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্॥"
(শ্বেতাশ্ব ৬।২২)

ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, জগতে

সদসৎ পদার্থনিচয়ের মধ্যে প্রকৃত সত্য বস্তু নির্দ্দেশ করাই উপ-নিষদের (বেদান্তের) চরম লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই জীব কি ? ব্রহ্ম কি ? এবং জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ ? ইত্যাদি বিষয়সমূহও আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে।

জীবগণ যাহাতে অনাদিকাল-সঞ্চিত হৃদয়গত অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ প্রতিভাস লাভ করতঃ পরম কল্যাণপদ পাইতে পারে ; উপ-নিষদ্ শাস্ত্র তাহাই শিক্ষা দিয়া থাকে। ঘনীভূত অন্ধকাররাশি অপনয়ন করিতে হইলে যেমন আলোক ভিন্ন অপর কোনও উপায় নাই, সেইরূপ মানবমণ্ডলীর হৃদয়-কন্দরে চিরসঞ্চিত অজ্ঞানরাশি অপনয়নেরও জ্ঞান ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। সেই চিরসঞ্চিত নিবিড় অজ্ঞানান্ধকার অপসারণের জন্য, হৃদয় মধ্যে বিবেকাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিতে হয়। একবার সেই বিবেকাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলেই, দেখিবে হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার (পুঞ্জীকৃত অজ্ঞানরাশি) মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। উপনিষদ্‌ই সেই বিবেক-জ্ঞান—ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা প্রদান করে। সেই অপূর্ব্ব অনন্ত আনন্দঘন ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে বা পাইতে হইলে, ইহা ভিন্ন আর উৎকৃষ্ট উপায় নাই। তাই উপনিষদ্ বলিয়া দিয়াছেন, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়," যদি তুমি এই ভীষণ সংসার-বীজ অজ্ঞানরাশি পার হইয়া সেই আনন্দধামে যাইতে চাও, তাহা হইলে উপদিষদ্ যে পথ বলিয়া দিতেছে, তাহাই অবলম্বন কর ; তদ্ভিন্ন

উপনিষদের শিক্ষা।

আর দ্বিতীয় পথ নাই। দুষ্পার ভবসাগর পার হইতে হইলে, ব্রহ্মবিদ্যাই তাহার একমাত্র ভেলা। যিনি এই ভেলার আশ্রয় না লইবেন, তাহার পক্ষে পারের আশা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। একটী সূতায় অগ্নি সংযোগ করিলে যেমন সেই সূতাটী পুড়িয়া গেলেও, তাহার আকার নষ্ট হয় না, পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া থাকে, তেমনি যাহার হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ পায়, তাহার নিকট সমস্ত জগৎ তখন দগ্ধ সূতার ন্যায় অসারভাবে বিদ্যমান থাকে মাত্র, কিন্তু তাহার সুখ দুঃখ সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না। ভোগ শেষ হইলেই তাহার সমস্ত ফুরাইয়া যায়, 'আমি আমার' ইত্যাদি ভেদবুদ্ধি চলিয়া যায়। তখন তিনি সর্ব্বত্র আত্মভাব এবং আপনাতে সর্ব্ব-ভাব উপলব্ধি করিয়া পরম নির্ব্বৃতি লাভ করেন। ইহাই সমস্ত উপনিষদের একমাত্র উপদেশ ও অভিপ্রায়।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা—উপনিষদ্ কাহাকে বলে, উপনিষদ্ কথার অর্থ কি, উপনিষদ্‌কে বেদান্ত বলে কেন? এবং বেদান্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ কিরূপ, উপনিষদের গৌণ ও মুখ্য অর্থই বা কি, ইত্যাদি বিষয়সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এখন উপনিষদের সংখ্যা, বিভাগ ও বিষয় প্রভৃতি আলোচনা করিয়াই বক্তব্য শেষ করিব।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, প্রত্যেক বেদেই বহুসংখ্যক শাখা আছে, এবং প্রত্যেক শাখাতেই আবার পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক আছে। আরুণেয়ী উপনিষদে এইরূপ একটি উপদেশ দৃষ্ট হয়—

'সর্ব্বেষু বেদেষু আরণ্যকমাবর্ত্তয়েৎ, উপনিষদ-মাবর্ত্তয়েৎ"

অর্থাৎ সন্ন্যাসী ব্যক্তি সর্ব্ব বেদের আরণ্যক ও উপনিষদ্ গ্রন্থ আবৃত্তি করিবেন।'

প্রত্যেক বেদেই যে, পৃথক্ পৃথক্ উপনিষদ্‌ও আরণ্যক ছিল, তাহা বর্ত্তমানে উপলব্ধিগোচর না হইলেও, উক্ত উপনিষদ্-বাক্য হইতে জানিতে পারাযায়। মহাকালের আমোঘ আবর্ত্তন-প্রভাবে এবং আমাদের ভাগ্যদোষে কৃষ্ণপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় উহা ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়া আসিতেছে, এখনও যাহা আছে, তাহাও চতুর্দ্দশীনিশার ক্ষীণ আলোকরেখা মাত্র। কে বলিতে পারে, অনতিবিলম্বে যে ঘোর অমানিশার আবির্ভাবে, সেটুকু পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইবে না। পুরাকালে গুরু-শিষ্যপরম্পরাক্রমে মৌখিক উপদেশেই সম্পূর্ণ বেদবিদ্যা প্রচলিত ছিল, উহা অক্ষরাঙ্কিত করিয়া পুঁথিগত করিবার প্রথা ছিল না। এই জন্য বেদের অপর নাম 'শ্রুতি। কালক্রমে যখন গুরুশিষ্য-সম্প্রদায়ের ক্রমশঃ অভাব হইতে লাগিল, তখন রক্ষকাভাবে ক্রমে ক্রমে বেদ-শাখাগুলি সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়া অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদেরও বিলোপ সংঘটিত হইল। ফলে বিশাল বেদতরু তখন শাখা-প্রশাখাহীন কাণ্ডমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। এই দুরবস্থা যে আজ ঘটিয়াছে, তাহা নহে, বহুশত বৎসর পূর্ব্বেই এইরূপ দুরবস্থার সূত্রপাত হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যকার মহামতি

বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যদর্শনের বাখ্যায় একস্থানে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,. "কাললুপ্তাপি সা শ্রুতিঃ আচার্য্যবাক্যাদনুমীয়তে" অর্থাৎ সূত্রমধ্যে যে প্রকার শ্রুতির ইঙ্গিত রহিয়াছে, এসময়ে যদিও তাদৃশ শ্রুতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তথাপি আচার্য্যের কথায় তৎকালে সেরূপ শ্রুতির অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।

খুব সম্ভব এদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের সমধিক প্রাদুর্ভাবই বেদবিদ্যা ও অপরাপর শাস্ত্রের এবংবিধ অপচয়ের প্রধান কারণ। এমত অবস্থায় মৌলিক সমস্ত উপনিষদের পূর্ণ-সংখ্যানির্দ্ধারণ করা একান্ত অসম্ভব। তাহার উপর আবার আধুনিক কতকগুলি গ্রন্থ উপনিষদ্ নামে অভিহিত হইয়া, শোথ-রোগীর অঙ্গস্ফীতির ন্যায় উপনিষদেরও কলেবর পরিবর্দ্ধিত করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ ও সংখ্যানির্ণয়ে বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছে। কথিত আছে যে, সম্রাট্ আকবর শাহ অভিজ্ঞ অধ্যাপকের সাহায্যে কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া সে গুলিকে উপনিষদ্ নামে প্রচার করিয়াছিলেন। 'প্রচলিত আল্লোপনিষদ্' তাহারই অন্যতম। আল্লোপনিষদ্খানা উপনিষদের রীতিতে রচিত হইলেও, উহাতে 'রহিম' 'করিম' প্রভৃতি কতকগুলি মুসলমানি শব্দ স্থান পাইয়াছে; এবং ভাষাবৈষম্যের দোষেও উহাকে এক প্রকার অবোধ্যই করিয়া রাখিয়াছে। এই জাতীয় উপনিষদ্ যে, আরও কত আছে, তাহাও এখন বিশ্লেষণ করা অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া পরিচিত মুক্তিকোপনিষদের,

মধ্যে তদানীন্তন উপনিষৎসমূহের নাম ও সংখ্যা উল্লিখিত আছে; তদনুসারে জানিতে পারা যায় যে, তৎকালে প্রচলিত উপনিষদের সমষ্টিসংখ্যা অষ্টোত্তর শত ছিল। সেই সমুদয়ের নাম এই—

ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ব্রহ্ম, কৈবল্য, জাবাল, শ্বেতাশ্বতর, হংস, আরুণি, গর্ভ, নারায়ণ, পরমহংস, অমৃতবিন্দু, অমৃতনাদ, অথর্ব্বশিরঃ, অথর্ব্বশিখা, মৈত্রায়ণী, কৌষীতকী, বৃহৎ-জাবাল, নৃসিংহতাপনী, কালাগ্নিরুদ্র, মৈত্রেয়ী, সুবাল, ক্ষুরিক, মন্ত্রিক, সর্ব্বসার, নিরালম্ব, শুকরহস্য, বজ্রসূচিক, তেজোবিন্দু, নাদবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, ব্রহ্মবিদ্যা, যোগতত্ত্ব, আত্মবোধ, পরিব্রাট্, ত্রিশিখী, সীতা, যোগচূড়া, নির্ব্বাণ, মণ্ডল, দক্ষিণামূর্ত্তি, শরভ, স্কন্দ, মহানারায়ণ, অদ্বয়তারক, রামরহস্য, রামতাপন, বাসুদেব, মুদ্গল, শাণ্ডিল্য, পৈঙ্গল, ভিক্ষু, মহা, শারীরক, যোগশিখা, তুরীয়াতীত, সন্ন্যাস, পরমহংস, পরিব্রাজক, অক্ষমালিকা, অব্যক্ত, একাক্ষর, অন্নপূর্ণা, সূর্য্য, অক্ষি, অধ্যাত্ম, কুণ্ডিকা, সাবিত্রী, আত্মা, পাশুপত, পরব্রহ্ম, অবধূত, ত্রিপুরাতাপনী, দেবী, ত্রিপুর, কঠরুদ্র, ভাবনা, রুদ্রহৃদয়, যোগকুণ্ডলী, ভস্ম, রুদ্রাক্ষ, গণপতি, জাবাল-দর্শন, তারসার, মহাবাক্য, পঞ্চব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, গোপালতাপনী, কৃষ্ণ, যাজ্ঞবল্ক্য, বরাহ, শাট্যায়নীয়, হয়গ্রীব, দত্তাত্রেয়, কলিসন্তরণ, জাবালি, সৌভাগ্য, সরস্বতীরহস্য, ঋচ বা বহ্বৃচ ও মুক্তিক।

মুক্তিকোপনিষদের মতে উক্ত অষ্টোত্তরশতসংখ্যক উপনিষদের মধ্যে ঐতরেয়, কৌষীতকী, নাদবিন্দু, আত্মবোধ, নির্ব্বাণ,

মুদ্গল, অক্ষমালিকা, ত্রিপুরা, সৌভাগ্য, ও বহ্বৃচ, এই দশখানি উপনিষদ্ ঋগ্বেদান্তর্গত।

ঈশ, বৃহদারণ্যক, জাবাল, হংস, পরমহংস, সুবাল, মন্ত্রিকা, নিরালম্ব, ত্রিশিখী, মণ্ডল, অদ্বয়তারক, পৈঙ্গল, ভিক্ষু, তুরীয়াতীত, অধ্যাত্ম, তারসার, যাজ্ঞবল্ক্য, শাট্যায়নীয় ও মুক্তিক, এই উনিশখানি উপনিষদ্ শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়।

কঠবল্লী, তৈত্তিরীয়, ব্রহ্ম, কৈবল্য, শ্বেতাশ্বতর, গর্ভ, নারায়ণ, অমৃতবিন্দু, অমৃতনাদ, কালাগ্নিরুদ্র, ক্ষুরিকা, সর্ব্বসার, শুকরহস্য, তেজোবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, ব্রহ্মবিদ্যা, যোগতত্ত্ব, দক্ষিণামূর্ত্তি, স্কন্দ, শারীরক, যোগশিখা, একাক্ষর, অক্ষি, অবধুত, কঠরুদ্র, হৃদয়, যোগকুণ্ডলী, পরব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, বরাহ, কলিসন্তরণ ও সরস্বতীরহস্য, এই বত্রিশখানি উপনিষদ্ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়।

কেন, ছান্দোগ্য, আরুণী, মৈত্রেয়ী, বজ্রমুষ্টিকা, যোগচূড়ামণি, বাসুদেব, মহা, সন্ন্যাস, অব্যক্ত, কুণ্ডিকা, সাবিত্রী, রুদ্রাক্ষ, জাবালদর্শন ও জাবালি, এই ষোলখানি উপনিষদ্ সামবেদান্তর্গত।

প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্যপ্রভৃতি অবশিষ্ট বত্রিশখানি উপনিষদ্ অথর্ব্ববেদীয়।

মুক্তিকোপনিষদ্ নিজেই বহুশত বেদশাখার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং—

"একৈকস্যাস্তু শাখায়া একৈকোপনিষদ্ মতা"

বলিয়া প্রত্যেক বেদশাখারই এক একটী পৃথক্ পৃথক্ উপনিষদ্ আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তদনুসারে উপনি-

ষদের সমষ্টিসংখ্যা সহস্রাধিক হওয়াই সঙ্গত হয়; কিন্তু তিনি নিজে উপনিষদের সংখ্যা ও নাম নির্দ্দেশের কালে অষ্টোত্তরশত-সংখ্যক উপনিষদেরই নাম ও সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি কেন যে, অবশিষ্ট উপনিষদ্‌সমূহের নাম নির্দ্দেশ করেন নাই, তাহারও কোন কারণ প্রদর্শন করেন নাই। অধিকন্তু, কোন উপনিষদ্ খানা যে, কোন বেদ-শাখার অন্তর্গত, তাহাও তিনি বলিতে পারেন নাই বা বলেন নাই। বিশেষতঃ এ প্রকার সংখ্যা ও নাম ভেদকল্পনা অন্য কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় না। কাজেই মুক্তিকোপনিষদের প্রদত্ত সংখ্যা সম্বন্ধে বিশেষরূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না।

বিশেষতঃ চরণব্যূহনামক গ্রন্থে উপনিষদের যেরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, মুক্তিকোপনিষদে উপনিষদের যে সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে এবং যে উপনিষদ্‌কে যে বেদের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। ঐ তালিকাতে অথর্ববেদের কয়েকখানি উপনিষদ্‌ও অপর বেদ-ত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত উপনিষদ্ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কেবল যে, এই মাত্রই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু সংখ্যাসম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। চরণব্যূহের তালিকা অনুসারে জানিতে পারা যায় যে, অথর্ববেদীয় উপনিষদের সমষ্টি-সংখ্যা আটাশখানির অধিক নহে, কিন্তু মুক্তিকোপনিষদের মতে আথর্ববণোপনিষদের সমষ্টিসংখ্যা বত্রিশ। ইহাতে মনে হয় যে চরণব্যূহে যে আটাশ সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, পরবর্ত্তী কালে পরি-

বর্দ্ধিত হইয়া সম্ভবতঃ তাহাই ৩২ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ 'দীপিকা'কার নারায়ণ উক্ত ৩২ খানি আথর্ব্বণোপনিষদেরই টীকা করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত বিরুদ্ধ প্রমাণ দর্শনে সহজেই মনে হয় যে, প্রাচীন উপনিষদের সম্পূর্ণ সংখ্যা বুঝিবার কোনও প্রকৃষ্ট উপায় নাই। এখন যাহা জানা যায়, তাহাতে প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন উভয় প্রকার উপনিষদ্ই সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে; সুতরাং উহাদের পরিশুদ্ধ সংখ্যা জানিবার প্রকৃষ্ট উপায় দৃষ্ট হয় না।

তাহার পর, এ বিষয়ে বিস্পষ্ট প্রমাণের অভাবনিবন্ধন উক্ত উপনিষদ্সমূহের মধ্যে কোনটি কোন শাখার সহিত সম্বদ্ধ, তাহা অবিসংবাদিতরূপে নিরূপণ করিবার উপায় নাই। তবে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে জানাযায় যে, এখন ঋগ্বেদের দুইখানিমাত্র উপনিষদ্ প্রচলিত আছে, একখানির নাম ঐতরেয়, অপরখানির নাম কৌষীতকী। তন্মধ্যে ঐতরেয় উপনিষদ্ ঐতরেয় শাখার, আর কৌষীতকী উপনিষদ্ কৌষীতকী শাখার অন্তর্গত।

সহস্রশাখাসম্পন্ন সামবেদের দুইখানিমাত্র উপনিষদ্ এখন প্রচলিত আছে—(১) ছান্দোগ্য, (২) কেন উপনিষদ্। তন্মধ্যে ছান্দোগ্যোপনিষদ্ তাণ্ড্যশাখার, আর কেনোপনিষদ্ তলাবকার শাখার অন্তর্গত।

কৃষ্ণ ও শুক্লভেদে যজুর্ব্বেদ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে শুক্লযজুর্ব্বেদের দুইখানিমাত্র উপনিষদ্ এখন প্রচলিত আছে,—ঈশোপনিষদ্ ও বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। তন্মধ্যে ঈশোপনিষদ্খানি বাজসনেয়ী-

শাখার অংশবিশেষ, আর বৃহদারণ্যকোপনিষদ্খানি কাণ্ব বা মাধ্যন্দিনী-শাখীয় শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের পাঁচখানি উপনিষদ্ এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। তৈত্তিরীয়, মহানারায়ণ, কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রায়ণীয়। তন্মধ্যে তৈত্তিরীয় ও মহানারায়ণ উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত; এবং কঠোপনিষদ্ কঠশাখার ও মৈত্রায়ণীয় উপনিষদ্ মৈত্রায়ণীয় শাখার অন্তর্গত। কিন্তু শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ যে, কোন শাখার অংশবিশেষে অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বর্ত্তমান সময়ে, যে সমুদয় উপনিষদ্ প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই অথর্ব্ববেদীয়। ঐ সকল উপনিষদের মধ্যে প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষদ্ ব্যতীত আর কোন উপনিষদেরই প্রকৃত শাখাসম্বন্ধ নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, মুণ্ডকোপনিষদ্ সৌনকীয়শাখার, আর প্রশ্নোপনিষদ্ পৈপ্পলাদ শাখার অন্তর্গত।

উপরে যে সমুদয় উপনিষদের নাম নির্দ্দেশ করা হইল, তন্মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌষীতকী ও জাবাল, এই কয়েকখানি উপনিষদ্ যেমন প্রাচীন, তেমনই প্রামাণিক, তেমনই আবার গভীর রহস্যনিরূপণেও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহার মধ্যেও ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের গৌরব, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কারণ, ইহাতে যাহা নাই, অন্য কোন উপনিষদেই তাহা নাই; পরন্তু অন্যান্য উপনিষদে যাহা নাই, তাহাও এতদুভয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে, বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু মুক্তিকোপনিষদে এইরূপ লিখিত আছে যে, এক মাত্র মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ জানিলেই জীব কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে। তাহাতেও যাহার কৃতার্থতা লাভ না হয়, তাহার পক্ষে ঈশাদি দশখানা উপনিষদ্ অধ্যয়ন করা উচিত। তাহাতেও যাহার অকৃতার্থতা অপনীত না হয়, তাহার পক্ষে বত্রিশখানা উপনিষদ্ পাঠ করা আবশ্যক; তাহাতেও সফলতা লাভ না করিলে, অষ্টোত্তরশত উপনিষদ্ পাঠ করিতে হইবে ইত্যাদি।

এখানে বলা আবশ্যক যে, মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ খানা সংক্ষিপ্ত-কলেবর হইলেও অতি উপাদেয়। উহাতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়াবস্থা এবং প্রণবচিন্তাবিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ রহিয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের পরম গুরু (গুরুর গুরু) গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডূক্যো-পনিষদ্ অবলম্বনে যে, শ্লোকাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ শ্রদ্ধেয়, জ্ঞানগর্ভ ও সন্ন্যাসীসমাজে সমাদৃত। আচার্য্য শঙ্কর তাহার উপর আবার বিস্তৃত ভাষ্য যোজনা করিয়া ঐ শ্লোকাবলীর সমধিক গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও মুক্তি-কোপনিষদ্ উহার উপরে যে গৌরবভার আরোপিত করিয়াছেন, তাহা ঠিক হইয়াছে কিনা বলিতে পারা যায় না।

অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক আচার্য্য শঙ্কর—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক, এই একাদশখানি উপনিষদের উপর অতি উৎকৃষ্ট ভাষ্যব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, তাহার সময়ে ঐ একাদশ খানি উপনিষদ্ ব্যতীত আর কোনও

উপনিষদ্ প্রচলিত ছিল না। কারণ, তিনি ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত-দর্শনের উপর যে, বৃহৎ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে জাবাল, কৌষীতকী ও মহানারায়ণ প্রভৃতি অন্যান্য উপনিষদের বাক্যও প্রামাণিকরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আনাবশ্যক বোধে তিনি অপর কোনও উপনিষদের ব্যাখ্যা করেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। নৃসিংহতাপনীয়ের ভাষ্যও শঙ্করাচার্য্যের নামাঙ্কিত; কিন্তু সে সম্বন্ধে সকলেরই প্রগাঢ় সন্দেহ আছে।

মহামুনি বেদব্যাস উপনিষদের সমন্বয়-সাধনের মানসে ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে, কোন কোন উপনিষদের বিশেষ বিশেষ বাক্য লক্ষ্য করিয়া সমন্বয়াত্মক মীমাংসা করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝিবার কোনও উপায় নাই। তবে অনুসন্ধানে যতটা বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে মনে হয় যে, আচার্য্য শঙ্কর সূত্রভাষ্যমধ্যে,যে সমুদয় উপনিষদের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে কয়খানি উপনিষদ্ নিশ্চয়ই তাঁহার লক্ষ্যের বাহিরে ছিল না।

আচার্য্য-শঙ্করের পর শঙ্করানন্দ ও নারায়ণনামক দুইজন পণ্ডিত অনেকগুলি উপনিষদের বৃত্তি বা টীকা রচনা করিয়াছিলেন। সেই টীকার নাম দীপিকা। এইরূপ একটা প্রবাদ আছে যে, শঙ্করানন্দ অষ্টোত্তরশত উপনিষদের উপরই 'দীপিকা' রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত 'দীপিকা' আবিষ্কৃত হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবে কি না, বলিতে পারি না।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক আচার্য্য রামানুজস্বামী নিয়মিত-রূপে কোন উপনিষদেরই টীকা বা ভাষ্য রচনা করেন নাই; কেবল

শ্রীভাষ্যমধ্যে যতটা পারিয়াছেন, উপনিষদের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। রামানুজের পরবর্ত্তী শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোন উপনিষদেরও ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ শ্লোকটীতে রামানুজের যে, গ্রন্থবিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, স্বয়ং রামানুজও কতিপয় উপনিষদের ব্যাখ্যাত্মক 'বেদার্থ-সংগ্রহ' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই 'বেদার্থ-সংগ্রহ' (বেদার্থ-প্রকাশ) গ্রন্থখানি এখনও পাওয়া যায় এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুকূলে শ্রুতিব্যাখ্যা করিবার ও বুঝিবার ইহা বিশেষ উপযোগী। রামানুজের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশক শ্লোকটী এই—

"বেদান্তসারো বেদান্তদীপো বেদার্থসংগ্রহঃ।
গদ্য-গীতাভাষ্য-সূত্রভাষ্য-নিত্যক্রমা ইতি॥"

দ্বৈতবাদের প্রধান বেদান্তাচার্য্য শ্রীমৎ আনন্দতীর্থ। ইনিই মাধ্বনামে পরিচিত ও মাধ্বসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তিনিও কতিপয় উপনিষদের উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। সে সমুদয় ভাষ্য এখনও প্রচলৎ আছে।

ইহা ছাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যা-ভূষণও স্বমত সমর্থন-ব্যপদেশে কোন কোন উপনিষদের উপর টীকা রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু যে কারণেই হউক, তাহা তেমন আদৃত ও প্রচলিত হয় নাই।

এক সময় এদেশে উপনিষদ্‌গ্রন্থ এতই আদৃত ও শ্রদ্ধেয় ছিল যে, অল্পাধিক পরিমাণে প্রায় সকলেই উহার আলোচনায়

সময়ক্ষেপ করা বিশেষ শ্লাঘনীয় মনে করিতেন। কথিত আছে যে, সম্রাট্ সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা অতিশয় বিদ্যানুরাগী ও গুণপক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজব্যয়ে অনেকগুলি উপনিষদের পারস্য ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন; এবং সেই অনুবাদের আবার ইউরোপীয় ভাষায় পর্য্যন্ত অনুবাদ হইয়াছিল। সেই অনুবাদ পাঠ করিয়াও নাকি তাৎকালিক ইউরোপীয় খ্যাতনামা কোন কোন পণ্ডিত নিতান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মনে হয়, যাহারা শুধু অনুবাদের অনুবাদমাত্র পাঠ করিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহারা মুল উপনিষদের অপূর্ব্ব আস্বাদ উপভোগ করিতে পারিলে, কতই না আনন্দিত হইতেন।

আলোচ্য উপনিষদের মধ্যে অথর্ব্ববেদীয় যে সমুদয় উপনিষদ্ এখন পর্য্যন্ত সুধীসমাজে প্রচলিত আছে, সে সমুদয় উপনিষদ্ নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, উপনিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশক হইলেও, সমস্ত উপনিষদ্ই যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে ব্যগ্র, তাহা বলা যায় না। এরূপ অনেক উপনিষদ্ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবল ব্রহ্মলাভের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন উপায়-মাত্র নির্দ্দেশেই সে সকলের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ করিলে, আথর্ব্বণ উপনিষদ্‌সমূহকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত যাইতে পারে। প্রথম—ব্রহ্মোপনিষদ্, দ্বিতীয়—যোগোপনিষদ্, তৃতীয়—সন্ন্যাসোপনিষদ্ এবং চতুর্থ—সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্।

তন্মধ্যে, বেদান্তের প্রকৃত লক্ষ্য ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদক—প্রশ্ন,

মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, গর্ভ, প্রাণাগ্নিহোত্র, পিণ্ড, আত্মা, গারুড় ও সর্ব্বোপনিষদ্‌সার, এই নয়খানিকে ব্রহ্মোপনিষদ্‌; যোগবিষয়ক বিবিধ তত্ত্ব-প্রকাশক—ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষুরিকা, চুলিকা, নাদবিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, অমৃতবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, তেজোবিন্দু, যোগশিখা, যোগতত্ত্ব ও হংস, এই একাদশ খানিকে যোগোপনিষদ্‌মধ্যে পরিগণনা করা যাইতে পারে।

চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রম সম্পর্কিত বিধিবিধান ও আচার-নিয়মাদি প্রতিপাদক—ব্রহ্ম, সন্ন্যাস, আরুণেয়, কঠশ্রুতি, পরমহংস, জাবাল ও আশ্রম, এই সাতখানি উপনিষদ্‌কে সন্ন্যাসোপনিষদ্‌ বলা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া, যে সমুদয় উপনিষদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রাম প্রভৃতি অভীষ্ট মূর্ত্তি বা দেবতাবিশেষকে ব্রহ্মস্বরূপে পরিকল্পিত করিয়া তাঁহাদেরই একনিষ্ঠ আরাধনাকে মুক্তির মুখ্য পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই সমুদয় উপনিষদ্‌কে সম্প্রদায়বিশেষের অনুমোদিত ও সংকলিত বলিয়া সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্‌রূপে পরিগণনা করা যাইতে পারে। অথর্ব্বশিরঃ, অথর্ব্বশিখা, নীলরুদ্র, বিষ্ণু, নারায়ণ, নৃসিংহতাপনী প্রভৃতি উপনিষদ্ এই শ্রেণীর অন্তর্গত হইবার যোগ্য। মনে হয়, এই শ্রেণীর উপনিষদ্‌গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক; এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মহাত্মারা নিজ নিজ আরাধ্য দেবতার অলৌকিক মহিমাময় মাহাত্ম্য খ্যাপনের উদ্দেশ্যে বিবিধ অধ্যাত্মতত্ত্বে সংপুটিত করিয়া ঐ সকল উপনিষদ্‌ প্রণয়ন করিয়াছেন; এবং নিজ নিজ ইষ্ট দেবতাকেই সৃষ্টি স্থিতি সংহারক্ষম পরব্রহ্মের স্থানে স্থাপন

করিয়াছেন। এই কারণে ঐসমস্ত উপনিষদের প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। সে যাহা হউক, ঈশ, কেন প্রভৃতি যে একাদশ খানি উপনিষদ্ আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য-ব্যাখ্যা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে, সে সমুদয়ের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ঐ সমুদয় উপনিষদে অতি উদারভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হওয়ায় সকলেরই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সমুৎপাদন করত অসঙ্কোচে আদৃত ও পরিগৃহীত হইয়াছে; সুতরাং আমরা অতঃপর যাহা বলিব, প্রধানতঃ সেই সমুদয় উপনিষদের উপর নির্ভর করিয়াই বলিব।

উপনিষদের প্রাচীনতা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন না কেন, ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশক উপনিষদ্ যে, অতি প্রাচীন—স্মরণাতীত কাল হইতে পুণ্যভূমি ভারতে প্রকটভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও সংশয় হয় না। বিশেষতঃ উপনিষদের মধ্যে আমরা ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে যেরূপ সমুন্নত চিন্তার পরিচয় প্রাপ্ত হই, তাহাতে মনে হয় যে, উহা অনাদি কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। উপনিষদ্ মানবসৃষ্ট বিদ্যাই নহে; উহা মানববুদ্ধির অগোচর। স্বয়ং ব্রহ্মা—যিনি আদি বিদ্বান্ এবং কপিল প্রভৃতিরও জ্ঞানোপদেষ্টা, সেই ব্রহ্মাই এই ব্রহ্মবিদ্যা বা উপনিষদের প্রথম প্রবর্ত্তক। মুণ্ডকোপনিষদে কথিত আছে যে,—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব,
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাম্,

অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ-পুত্ত্রায় প্রাহ ॥
অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽ-
থর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরসে ব্রহ্মবিদ্যাম্,
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ,
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥”

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই ব্রহ্মবিদ্যাত্মক উপনিষদ্ মানববিশেষেয় আবিষ্কৃত নহে। ইহা সেই ব্রহ্মা হইতে শিষ্য-প্রশিষ্যপরম্পরাক্রমে প্রচলিত রহিয়াছে; পরবর্ত্তী ঋষিগণ ভূমণ্ডলে সেই সনাতন ব্রহ্মবিদ্যাত্মক উপনিষদের বিস্তৃতি বিধান করিয়াছেন মাত্র। এইরূপ শিষ্য-পারম্পর্য্যক্রম উপনিষদের অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ ব্রাহ্মণের শেষে যে, ‘বংশব্রাহ্মণ’ বা গুরুপারম্পর্য্যের তালিকা প্রদত্ত আছে, তাহা দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা ব্যক্তিবিশেষের কল্পনা-প্রসূত নহে ; উহা অতি প্রাচীন।

উপনিষদ্ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অনেক স্থলে উপনিষদুক্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যা-সমর্থনের জন্য স্থানে স্থানে পুরাতন শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। যেমন—“তদেতৎ ঋচাভ্যুক্তম্” “তদেষাঽভ্যুক্তা” ইত্যাদি। কোন কোন স্থলে বা ‘নিবিদ্’ প্রভৃতি সুপ্রাচীন সাংকেতিক শব্দও উদ্ধৃত হইয়াছে, দৃষ্ট হয়। তাহার পর, উপনিষদের মধ্যে কতকগুলি কথা সূত্রাকারেও গ্রথিত আছে।

যেমন, "তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত," "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ইত্যাদি। সুধীসমাজে বিশেষ পরিচিত ও লোকবুদ্ধির আয়ত্ত না হইলে এইরূপ সূত্রাকারে গ্রথিত কথার অর্থ ত কেহই বুঝিতে সমর্থ হয় না।

অতএব ঐরূপ সূত্রাকারে নিবদ্ধ উপনিষদ্বাক্য দর্শনে মনেহয় যে, দেশে যে সময় ব্রহ্মবিদ্যার বহুল পরিমাণে প্রচার ঘটিয়াছিল, সুধীমাত্রই উপনিষদের তত্ত্ব অবগত ছিলেন, সেই সময়েই ঐ সমস্ত দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব অনায়াসে স্মরণ রাখিবার নিমিত্ত উক্ত সূত্র-সমূহের সৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব এরূপ সিদ্ধান্ত বোধহয়, অসঙ্গত হইবে না যে, উপনিষদ্ বা ব্রহ্মবিদ্যা এদেশের অতি প্রাচীনতম বিদ্যা। আর্য্য ঋষিগণ গোপনীয় রহস্যবিদ্যারূপে অতি সযত্নে ইহা রক্ষা করিতেন; যা'কে তা'কে এ বিদ্যা প্রদান করিতেন না। কেবল উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র বা গুণাধিক শিষ্যকে মাত্র ইহা প্রদান করিতেন। কিরূপ শিষ্যকে এই বিদ্যা প্রদান করিতে হয়, স্বয়ং উপনিষদ্ই তাহা বলিয়া দিয়াছেন—

"প্রশান্তচিত্তায় জিতেন্দ্রিয়ায় প্রক্ষীণদোষায় যথোক্তকারিণে
গুণান্বিতায়ানুগতায় সর্ব্বদা প্রদেয়মেতৎ সকলং মুমুক্ষবে ॥"

অর্থাৎ যাহার চিত্ত প্রশান্ত, ইন্দ্রিয়নিচয় বিজিত অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত, এবং রাগ দ্বেষাদি দোষরাশিও বিনষ্ট হইয়াছে; সর্ব্বদা সদ্‌গুণান্বিত এবং গুরুর অনুগত ও মুমুক্ষ, সেইরূপ শিষ্য-কেই এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিবে।

উপনিষদ্ আরো বলিয়াছেন—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ, সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সমিৎপাণি হইয়া, যিনি শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাদৃশ উপযুক্ত গুরুর নিকট উপস্থিত হইবে। অনন্তর গুরু দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষা দ্বারা যদি শিষ্যের উপযুক্ততায় নিঃসংশয় হইতেন, তবেই তিনি উপাগত বিনীত শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা নিবদ্ধ আছে যে,—

দেবরাজ ইন্দ্র ও দৈত্যরাজ বিরোচন এক সময়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসামানসে প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আদেশক্রমে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিরোচন একবার মাত্র ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত প্রাথমিক উপদেশেই সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; আর দেবরাজ একাধিকবার ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে যখন শুদ্ধসত্ত্ব হইলেন, তখনই ব্রহ্মা তাঁহাকে বিদ্যাধিকারী বিবেচনা করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। এইরূপ কঠোপনিষদের শুদ্ধমতি নচিকেতাও যখন যমরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া পরলোকবার্ত্তাচ্ছলে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক প্রশ্ন করিলেন, তখন যমরাজও অধিকার পরীক্ষার জন্য প্রথমতঃ নানা প্রকার লোভনীয় বিষয় দ্বারা নচিকেতাকে প্রলুব্ধ করিতে প্রয়াস পাইলেন। নচিকেতা যখন কিছুতেই প্রলুব্ধ হইল না,

অর্থাৎ বিদ্যার্থী বলিয়া নিশ্চিত হইল, তখনই যমরাজ নচিকেতার প্রতি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে প্রবৃত্ত হইলেন।

কোন কোন বিশেষ ধর্ম্ম থাকিলে যে, ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণে অধিকারী হওয়া যায়, বেদান্তাচার্য্যগণ তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, শমদমাদিসাধনসম্পত্তি ও মুমুক্ষা (১)। এই চারি প্রকার বিশেষ গুণ লাভ করিলেই ব্রহ্মবিদ্যা হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকার জন্মে, নচেৎ জন্মে না। এ বিষয়ে উপনিষদ্ বলিতেছেন—

"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ।" ইত্যাদি।

বৃহদারণ্যক (৪।৪।২৩)

শান্ত অর্থ অন্তরিন্দ্রিয়সংযমী, দান্ত অর্থ বহিরিন্দ্রিয়সংযমী, উপরত অর্থ—বিষয় হইতে প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়, তিতিক্ষু অর্থ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, সমাহিত অর্থ একাগ্রচিত্ত, শ্রদ্ধাবিত্ত অর্থ—অতিশয়

(১)। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ=ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু, তদন্যদ্ অখিলমনিত্যমিতি বিবেচনম্। অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যবস্তু, তদ্ভিন্ন সকলই অনিত্য, এইরূপ বিবেক জ্ঞান। ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ—ঐহিকানাং স্রক্‌চন্দনাদিবিষয়ভোগানাং কর্ম্মজন্যতয়া অনিত্যত্ববৎ আমুষ্মিকানামপি স্বর্গাদি বিষয়ভোগানামনিত্যত্বমিতি তেভ্যো বিরতিঃ। শমদমাদিসাধনসম্পদ্=শমদমোপরতিতিতিক্ষা সমাধানশ্রদ্ধাঃ। মুমুক্ষুত্বং=মোক্ষেচ্ছা।

(সদানন্দ যতিঃ)।

শ্রদ্ধাবান্। এবংবিধ ব্যক্তিই ব্রহ্মদর্শনে অধিকারী; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে,ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যগণ উক্ত প্রকার গুণসম্পন্ন শিষ্যকেই ব্রহ্মবিদ্যাত্মক উপনিষদের রহস্য বলিতেন; যা'কে'তা'কে বলিতেন না। অতঃপর উপনিষদ্ আমাদিগকে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

[উপনিষদের উপদেশ]

ইতঃপূর্ব্বে উপনিষদের পরিচয়, প্রতিপাদ্য, লক্ষ্য ও বিভাগ সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত কথাই বলা হইয়াছে, এবং উপনিষদ্ই যে, যথার্থ বেদান্ত, এ কথাও বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা উপনিষদের উপদেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

উপনিষদ্ আমাদিগকে কি উপদেশ দেয়, অথবা উপনিষদ্ শাস্ত্র হইতে আমরা কিরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকি? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় যে, আমরা যাহা চাই, যাহা পাইবার আশায় আকুল প্রাণে দিগ্দিগন্ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকি, এবং যাহা পাইলে জগতে আর কিছুই অপ্রাপ্ত বা পাইবার যোগ্য থাকে না; আশা আকাঙ্ক্ষা সকলই থামিয়া যায়। উপনিষদ্ শাস্ত্র আমাদিগকে সেই তত্ত্বের উপদেশ দেয়; এবং যে পথ অবলম্বন করিলে আমরা সেই দুরধিগম উপদেশের সারমর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইতে পারি, তাহারও বিধিব্যবস্থা জানাইয়া দেয়।

অপার বারিধিবক্ষে পতিত দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিক যেরূপ আপনার গন্তব্য পথ নিরূপণে অসমর্থ হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং সূক্ষ্ম দিগ্‌নিরূপণ যন্ত্রের সাহায্যে অবলম্বনীয় পথ অবধারণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দচিত্তে নিজের গন্তব্য দেশে যাইতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ এই দুস্তর সংসার-সাগরে নিমগ্ন লক্ষ্যভ্রষ্ট মানবগণও সাধারণতঃ আপনার অভীষ্ট বস্তু পাইবার উপযুক্ত সাধনমার্গ নিরূপণে অক্ষম হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটোছুটী করিয়া থাকে। পরম সৌভাগ্যশালী কোন কোন লোকই জন্ম-জন্মান্তর-সঞ্চিত মহা পুণ্য বলে এই অত্যুদার উপনিষদের আশ্রয় গ্রহণে প্রবৃত্ত হন, এবং তদনুসারে আপনার অভীষ্ট লাভের উপযুক্ত সাধনমার্গ নিরূপণপূর্ব্বক সেই অভীষ্ট বস্তু জানিতে ও পাইতে সমর্থ হন।

কিন্তু প্রকৃতির পরবশ সাধারণ মানব জানে না যে, সে কিসের অভিলাষী, কাহার উদ্দেশ্যে—কোন হারানিধি পাইবার জন্য তাহার মন এত ব্যাকুল ও অশান্তি ভোগ করিতেছে। মানব নিজে নিজের প্রিয়তত্ত্ব বুঝিতে পারে না বলিয়াই, তাহা প্রকাশ করিয়াও বলিতে জানে না; নিজের হিতপ্রার্থনায়ও অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য হয়। এ কথা উপনিষদ্‌ হইতেই আমরা জানিতে পারি। কৌষীতকী উপনিষদের একটী আখ্যায়িকায় বর্ণিত আছে,—

একদা দিবোদাস-নন্দন প্রতর্দ্দন স্বীয় প্রভাববলে দেবরাজ ইন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ইচ্ছামত বর গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু

প্রতর্দ্দন ঠিকই করিতে পারিলেন না যে, কিরূপ বর-গ্রহণ তাহার পক্ষে যথার্থ হিতকর! তখন তিনি অগত্যা বরদাতা ইন্দ্রের উপরই হিততম বর-প্রদানের ভার ন্যস্ত করিতে বাধ্য হইয়া বলিলেন—

"ত্বমেব মে বৃণীষ্ব, যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে" অর্থাৎ তুমিই আমার হইয়া সেইরূপ বর বরণ কর, যাহা তুমি মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর বলিয়া মনে কর। এখানে দেখা যায়, প্রতর্দ্দন হিততম বরগ্রহণে অভিলাষী, কিন্তু কিপ্রকার বর যে, তাহার পক্ষে সমধিক কল্যাণকর, তাহা তিনি নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না! ইহা দ্বারা কৌষীতকী উপনিষদ্ মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক চরিত্রেরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কঠোপনিষদে স্বয়ং যমরাজ নচিকেতার প্রতি যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও আমরা এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারি। সন্তানবৎসলা জননীর ন্যায় জন-হিতৈষিণী শ্রুতিও শুদ্ধসত্ত্ব শিশু নচিকেতাকে উপলক্ষ্য করিয়া যমরাজের মুখে এইরূপই উপদেশ দিয়াছিলেন,—

"অন্যৎ শ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়ঃ,
তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি,
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥
"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ,
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে,
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥" (কঠ ১।২।১-২)

অর্থাৎ জগতে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ নামে দুইপ্রকার প্রার্থনীয় বিষয় আছে। উক্ত উভয়বিধ বিষয় পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব হইলেও, তুল্যরূপে মানবকে আবদ্ধ করে। যিনি প্রেয়ঃ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তাঁহার কল্যাণ হয়, আর যিনি শ্রেয়ঃ উপেক্ষা করিয়া প্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তিনি কল্যাণ-পথ হইতে ভ্রষ্ট হন। এবং এই যে, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, উভয়ই একসঙ্গে মনুষ্যের সম্মুখে উপস্থিত হয়। ধীরব্যক্তি সম্মুখাগত সেই উভয়ের কার্য্য ও পরিণাম বিচার করেন এবং বিচারান্তে শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন; আর বিচারবিমুখ মন্দমতি মানব যোগক্ষেম-লোভে—অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি ও প্রাপ্তের সংরক্ষণার্থে শ্রেয়ঃ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রেয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। [১]

অভিপ্রায় এই যে, জগতে দুই শ্রেণীর লোক আছে। এক শ্রেণীর লোক ধীর প্রকৃতি। তাহারা যাহা করেন, বিচারপূর্ব্বক করেন। অপর শ্রেণীর লোক অধীর; সম্মুখে যাহা পায়, এবং আপাতদৃষ্টিতে রমণীয় মনে করে, তাহাই সমাদরে গ্রহণ করে; পরিণাম-চিন্তার আবশ্যকতা মনে করে না।

লোক যেমন দুই প্রকার, তেমনি তাহাদের প্রার্থনীয় পদার্থও

---

(১) 'যোগ' অর্থ—অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি; আর 'ক্ষেম' অর্থ—প্রাপ্তবস্তুর সংরক্ষণ।

দুই প্রকার—এক শ্রেয়ঃ, অপর প্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃ অর্থ—সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তিময় পরমানন্দাত্মক ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মুক্তি। আর প্রেয়ঃ অর্থ—অভ্যুদয়—ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ-সম্পদ্‌ভোগ। উভয়ই সর্ব্বমানবের সম্মুখে অবলম্বনীয়রূপে উপস্থিত থাকে; এবং সকলের নিকটই আত্ম-সমর্পণের নিমিত্ত প্রস্তুত হয়। উক্ত উভয়বিধ লোকের মধ্যে যাহারা ধীর উত্তমাধম-বিচারপটু বিবেকী, কেবল তাহারাই পরিণাম-বিরস আপাতমধুর 'প্রেয়ঃ' পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য নিরাময় 'শ্রেয়ঃ' গ্রহণে সমর্থ হন; আর যাহারা মলিনচিত্ত সদসৎ-বিচারবিমুখ, সেই সমুদয় অবিবেকী লোকই আপাতরমণীয় ঐহিক বা পারলৌকিক ভোগসম্পদ্ বিষয়ে সমাকৃষ্ট হইয়া শ্রেয়ঃপথ পরিত্যাগ করে এবং নিরন্তর বাসনারাশি সম্পোষণ করতঃ—

"ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥"

ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে দুর্লভ মানবজীবনের অন্তিম অবস্থায় উপস্থিত হয়।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, অধিকারগত প্রভেদানুসারে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই মানবের প্রার্থনীয় ও প্রিয় হইতে পারে, কিন্তু বিবেক-বিজ্ঞান যাহার প্রবল ও পরিপক্ক হয় নাই, তাহার পক্ষে উভয়ের তারতম্য বিচারপূর্ব্বক কর্ত্তব্যাবধারণ করা একান্ত অসম্ভব হয়।

একান্ত অসম্ভব হয় বলিয়াই আলোচ্য উপনিষদ্‌শাস্ত্র কখনও গুরুশিষ্যভাবে, কখনও পিতাপুত্ররূপে, কখনও বা পতি-পত্নীরূপে উপদেশের আদান-প্রদানচ্ছলে মানবের হিততম পথ নির্দ্দেশপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের স্বরূপ, স্বভাব, ফল ও প্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তই সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞেয় বিষয়ের সুন্দর সমন্বয় ও মীমাংসা সম্পাদন করিয়াছেন, এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তই জ্ঞান কর্ম্ম ও উপাসনা প্রভৃতি সাধন-রহস্য বিস্তৃতভাবে উপদেশ করিয়াছেন।

বিশেষ মনঃসংযোগপূর্ব্বক উপনিষদ্ গ্রন্থ আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে,—পুরাকালে মহামুনি মার্কণ্ডেয় যেমন ভগবান্ নারায়ণের উদরমধ্যে যাইয়া, একত্র নিখিল বিশ্ব-বৈচিত্র্য সন্দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, তেমনই যাহারা বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে উপনিষদের গভীর রহস্য-রাজ্যে প্রবেশ করিবার অবসর ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, নিশ্চয়, তাহারাও বিশ্ববিজ্ঞেয় নিখিল বস্তুতত্ত্ব দর্শন করিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে বিমোহিত হইয়াছেন।

শ্রোতৃবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এখানে উপনিষদের কয়েকটী মাত্র বিষয় উল্লেখ করিব। আশা করি, তাহা দ্বারাই সকলে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রথমতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া পরে অপরাপর অংশের আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব।

[সৃষ্টিচিন্তা]

প্রায় অধিকাংশ প্রামাণিক উপনিষদেই অল্পাধিক পরিমাণে সৃষ্টিতত্ত্ব স্থান পাইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টি-চিন্তা উপনিষদের মধ্যে স্থান পাইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, দ্বৈতবাদ-সম্মত বিবেক-প্রধান সাংখ্যপ্রভৃতি শাস্ত্রের মধ্যে উহা যেরূপ প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, উপনিষদের মধ্যেও উহা সেই রূপেই সন্নিবেশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কেহ সেরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উপনিষদ্-পাঠে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি নিশ্চয়ই উহার রহস্য-রসাস্বাদে বঞ্চিত হইবেন। কারণ, সৃষ্টিতত্ত্ব উপনিষদের প্রধান লক্ষ্য নহে, উহা গৌণ,—অপ্রধান। একথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে,—

সাংখ্যাদি দর্শনের মতে জীব ও জগৎ উভয়ই সত্য! বিশেষ এই যে, জীব চেতন ও নির্ব্বিকার পদার্থ, আর জগৎ বা জগৎপ্রকৃতি অচেতন ও পরিণামশীল; কিন্তু মিথ্যা নহে। দৃশ্যমান জগতের কখনও আমূলতঃ ধ্বংস হয় নাই, হইবে না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। প্রলয় কালেও এই জগৎ প্রকৃতিতে বীজভাবে বিদ্যমান থাকে। উহাই জীবের একমাত্র দুঃখহেতু অবিবেকের নিদান। বিবেকজ্ঞান ব্যতীত সে দুঃখের অবসান বা অত্যন্ত নিবৃত্তি কখনই সম্ভাবিত হয় না; এবং বিবেচ্য পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব— জন্ম স্থিতি প্রভৃতির প্রকৃষ্ট পরিচয় ব্যতীত বিবেকজ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হয় না; এই জন্য বিবেকজ্ঞানের উপযোগী বলিয়াই আত্ম-চিন্তার ন্যায় জড়-চিন্তাও একান্ত আবশ্যক

রূপে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাত্মক উপনিষদে জড়-চিন্তার সেরূপ কোনও আবশ্যক ঘটে নাই। ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব ও জীবের ব্রহ্মভাব প্রতিপাদনই উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য বা একমাত্র লক্ষ্য। এই কারণেই সৃষ্টিচিন্তা সমস্ত উপনিষদে সমভাবে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। উপনিষদের সৃষ্টিচিন্তা যে, প্রসঙ্গাগত অপ্রধান, তাহা আমরা উনিষদ্ হইতেই জানিতে পারি। উদাহরণস্বরূপে ছান্দোগ্যোপনিষদের শ্বেতকেতুর আখ্যায়িকা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বালক শ্বেতকেতু পিতার উপদেশে গুরুগৃহে গমন করত দীর্ঘ কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং বিদ্যাভিমানে স্ফীত হইয়া অবিনীতভাবের পরিচয় পদেপদে প্রদান করিতে লাগিলেন। পুত্রের তাদৃশ গর্ব্বিত ব্যবহার দর্শনে পিতা দুঃখিত হইলেন, এবং বুঝিতে পারিলেন যে, আমার পুত্র বহু শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে এবং জাগতিক বহু তত্ত্ব অবগত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাহা শিক্ষা করিলে বা অবগত হইলে, মানুষের সমস্ত গর্ব্ব ও আত্মাভিমান চূর্ণ হইয়া যায়, সর্ব্বত্র সমদর্শন ফুটিয়া উঠে এবং আপনা হইতেই প্রশান্ত-মধুর ভাবনিচয় আসিয়া মানবের প্রকৃতিকে এক অলৌকিক শোভায় বিভূষিত করিয়া তোলে, নিশ্চয়ই সেই ভূম ব্রহ্মের তত্ত্ব অধিগত হয় নাই। তখন তিনি পুত্রকে, তদীয় শিক্ষার অপূর্ণতা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম-তত্ত্বের অবতারণা করিলেন, এবং ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে সমুৎসুক করিবার মানসে প্রিয় সম্বোধনে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"উত তমাদেশমপ্রাক্ষঃ যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি,
অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" ইত্যাদি।

অর্থাৎ হে সোম্য, তুমি কি তোমার গুরুর নিকট এমন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহা শ্রবণ করিলে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, এবং যাহা জানিলে বা চিন্তা করিলে অবিজ্ঞাত সমস্ত বিষয়ও বিজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ যাহা জানিলে জগতে আর কোন বিষয়ই অবিজ্ঞাত থাকে না, সেরূপ কোন বিষয়ে তুমি তোমার গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি?

পুত্র শ্বেতকেতু পিতার এবংবিধ বিস্ময়কর কথা শ্রবণ করিয়া চমকিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতি?"

সেরূপ উপদেশ কিরূপে সম্ভব হয়? অর্থাৎ একটী বস্তু জানিলে বা শুনিলেই যে, অপর সমস্ত বিষয় জানা শুনা হইয়া যায়, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?

পুত্রের এবম্বিধ বিস্ময় ও আগ্রহ দর্শনে পিতা প্রথমেই পুত্রকে 'শ্রদ্ধৎস্ব' বলিয়া বক্তব্য বিষয়ে শ্রদ্ধালু হইতে আজ্ঞা করিলেন, এবং—

"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ,
বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"

হে সোম্য, যেমন একটি মৃৎপিণ্ড বিজ্ঞাত হইলেই তদ্দারা জানিতে পারা যায় যে, মৃণ্ময় বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত বস্তু মৃত্তিকা ভিন্ন আর

কিছুই নহে, কেবল নাম ও আকৃতিমাত্র বিশেষ, ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের অসম্ভাবনাবুদ্ধি অপনীত করিয়া (*) আপনার অভিমত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া বলিলেন,—

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্।
তদ্ধৈক আহুঃ অসদেবেদমগ্র আসীৎ; তস্মাদসতঃ সৎ জায়তে।
কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাৎ ; * * * * কথমসতঃ
সৎ জায়েত ইতি ; সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ—
একমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥"

"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি ; তৎ তেজোঽসৃজত। তৎ তেজ ঐক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি ; তদ্ আপোঽসৃজত। তা আপ ঐক্ষন্ত, বহ্ব্যঃ স্যাম, প্রজায়েমহি ইতি ; তা অন্নমসৃজন্ত।"
(ছান্দোগ্য ৬।২।১—৪)

'হে সোম্য, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, না, সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা অসৎই ছিল ; সেই অসৎ হইতে সৎ জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। হে সোম্য, ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? অসৎ হইতে সতের জন্ম হইবে কিরূপে ? অতএব অগ্রে যে এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ছিল, ইহাই ঠিক।

(*) অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা, এই দুইটীকে সাধনপথের কণ্টক বলা হয়। গুরু সদুপদেশ দ্বারা সেই দ্বিবিধ কণ্টক দূর করিয়া সাধন-পথ নিষ্কণ্টক করিবেন।

সেই সৎ বস্তু (ব্রহ্ম) ঈক্ষণ করিলেন (মনে করিলেন), আমি বহু হইব—জন্মিব। অনন্তর তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন। পুনশ্চ তদধিষ্ঠিত তেজ ঈক্ষণ করিল—বহু হইব ; জন্মিব। অনন্তর তিনি জল সৃষ্টি করিলেন। আবার জলাধিষ্ঠিত হইয়া ঈক্ষণ করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব। অতঃপর তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।

উল্লিখিত বাক্যগুলি পর্য্যালোচনা করিলে, বোধহয়, কাহারও বুঝিতে বাকী থাকে না যে, ঐ যে একটি বস্তুকে জানিলে বা শুনিলেই অপর সমস্ত বস্তু জানা শুনা হইয়া যায়, সেই বস্তুটি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। একমাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই অপর সমস্ত বস্তু যে, কিরূপে বিজ্ঞাত হইতে পারে, তাহা উপপাদনার্থ ব্রহ্মের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপাদন করা আবশ্যক হইয়াছে। সেই এক অদ্বিতীয়ভাব সমর্থনের জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সেই এক অদ্বিতীয় সৎ ব্রহ্ম স্বরূপেই বর্ত্তমান ছিল। উৎপত্তির পূর্ব্বে বৃক্ষ যেরূপ বীজে, ঘৃত যেরূপ নবনীতে, ঘট যেরূপ মৃত্তিকাতে সূক্ষ্ম বীজভাবে বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ এই বিশাল জগৎও সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই সত্য ব্রহ্মস্বরূপে বর্ত্তমান ছিল ; ব্রহ্ম স্বীয় অমোঘ সংকল্পপ্রভাবে—মাকড়্সা যেমন স্বীয় শরীর হইতে সূত্র নিষ্কাশনপূর্ব্বক বিচিত্র তন্তুজাল নির্ম্মাণ করে, তেমনি তিনিও এই বিশাল বিশ্বজাল সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে; ফেন, তরঙ্গ ও বুদ্বুদ্ প্রভৃতি জলীয় বিকারসমূহ যেমন সমুদ্র হইতে

পৃথক্ পদার্থ নহে, পরন্তু সমুদ্রেরই স্বরূপ, তেমনি জগৎও ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে, পরন্তু তৎস্বরূপই বটে।

মৃত্তিকা জানিলে যেমন নিখিল মৃণ্ময় পদার্থ পরিজ্ঞাত হয়, সূত্র জানিলে যেরূপ সূত্রনির্ম্মিত সমস্ত বস্ত্র বিজ্ঞাত হয়; অর্থাৎ মৃণ্ময় পদার্থমাত্রই মৃত্তিকাস্বরূপ, কেবল নাম ও আকৃতি মাত্র উহাদের পার্থক্য সম্পাদন করে; বস্তুতঃ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়ে মৃত্তিকা ব্যতিরেকে উহাদের কোন সত্তাই নাই। জগতের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ; কেবল নাম ও আকৃতি ভিন্ন জগতের নিজস্ব কোন সত্তাই নাই। অতএব জগৎ যখন ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোনও বস্তু সৎ পদার্থই নহে, এবং ব্রহ্মই যখন উহার প্রকৃত স্বরূপ, তখন একমাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই যে, সমস্ত জগৎ পরিজ্ঞাত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

এখানে আরও একটা সংশয় আসিতে পারে। তাহা এই, ব্রহ্ম যদি এক অদ্বিতীয়ই হন, তাহা হইলে ত এই দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্বই থাকে না; পক্ষান্তরে, জগৎ যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মের এক অদ্বিতীয়ভাব রক্ষা পায় না; সুতরাং 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' শ্রুতিটী ত 'উভয়তঃপাশা রজ্জু' নিয়মে অবরুদ্ধ হইতেছে। তন্নিবারণার্থ উপনিষদ্ জগতের প্রকৃত স্বরূপ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টিক্রম বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিলেন—

'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইত্যাদি।

অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব—জন্মিব ইত্যাদি।

অভিপ্রায় এই যে, এই যে, বিশাল জগৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে; বস্তুতঃ ইহা দৃশ্য হইলেও সত্য নহে; স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর ন্যায় শুদ্ধ সংকল্পপ্রসূত। স্বপ্ন-দৃশ্য পদার্থ জীবের সংকল্প-প্রসূত, আর দৃশ্যমান জগৎ পরমেশ্বরের সংকল্প-প্রসূত। সংকল্প-প্রসূত বস্তুমাত্রই অসত্য; স্বপ্নদৃশ্যই ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল; অতএব পরমেশ্বরের সংকল্প-সম্ভূত এই জগৎও সত্য নহে—অবস্তু। অসত্য পদার্থ দ্বারা কখনও কাহারও দ্বৈতভাব বা সবিশেষত্বাবধারণ সম্ভব হয় না। অতএব দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ দ্বারাও ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব নিরুদ্ধ করিতে পারা যায় না।

বিশেষতঃ ব্যবহারজগতে অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, উৎপত্তিশীল বস্তুমাত্রই নিজ নিজ উপাদান-কারণে বিদ্যমান থাকে। উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়াদি কোন অবস্থাতেই সে উপাদান কারণের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। ইহাই কার্য্য-কারণভাবের অব্যভিচারী নিয়ম।

আলোচ্য উপনিষদ্ কিন্তু বিশেষ আড়ম্বর সহকারে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি প্রক্রিয়া প্রতিপাদন করিয়া পরিশেষে পূর্ব্বোক্ত নিয়মও লঙ্ঘন করিলেন,—ব্রহ্মসৃষ্ট জগৎকে ব্রহ্মেতেও আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন না; বরং "নেতি নেতি" করিয়া ব্রহ্ম হইতে জগৎকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অবশ্য ইহা যে, উপ-নিষদের প্রমাদ বা অজ্ঞতার ফল, তাহা নহে; পরন্তু উপনিষদ্ ইহা দ্বারাই কৌশল ক্রমে দৃশ্যমান জগতের অসত্যতা প্রতিপাদন করিলেন। কারণ, যাহা অভিব্যক্ত বা লোকদৃশ্য হইয়াও,

স্বীয় উপাদানে অবস্থান করে না, তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না ; ইহা অসত্য পদার্থের অব্যভিচারী স্বভাব। 'রজ্জু-সর্প'ই ইহার অতি উত্তম উদাহরণ স্থল।

সে স্থলে ভ্রান্ত সর্প রজ্জুকে অবলম্বন করিয়াই অভিব্যক্ত হয়, রজ্জুতেই অবস্থান করে ; অথচ স্বীয় গুণ-দোষে রজ্জুকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভ্রম অপনীত হইলে দেখা যায়, ঐ রজ্জু যেরূপ ছিল, সেইরূপই আছে, কিছুমাত্র তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কিন্তু রজ্জু ঐ সর্পের যথার্থ আশ্রয় হইলে, কখনই সেরূপ অক্ষত অবস্থায় থাকিতে পারিত না।

অতএব শ্রুতির উপদেশে বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগৎ যখন ব্রহ্মেতেও অবিদ্যমান, তখন নিশ্চয়ই উহা মিথ্যা—অসৎ। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট সর্পের দংশনে কাহারও কোন প্রকার ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, তেমনি দৃশ্যমান মিথ্যা প্রপঞ্চ দ্বারাও জগৎকারণ ব্রহ্মের কোন প্রকার ক্ষতিবৃদ্ধি বা অদ্বৈতভাবের হানি ঘটিতে পারে না।

অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ বলেন—

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপমতো দ্বয়ম্॥"

অভিপ্রায় এই যে, জগতে সচরাচর আমরা পাঁচ প্রকার বিষয় উপলব্ধি করিয়া থাকি—অস্তি (সত্তা), ভাতি (জ্ঞান বা প্রকাশ) প্রিয় (আনন্দ), রূপ (আকৃতি) ও নাম (সংজ্ঞা)। তন্মধ্যে

প্রথমোক্ত সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ এই তিনটি অংশ ব্রহ্মের স্বরূপ, আর অবশিষ্ট দুইটি—নাম ও রূপ জগতের স্বরূপ।

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, সত্তা বস্তুতঃ জগতের স্বভাব বা স্বরূপ নহে, উহা ব্রহ্মেরই শাশ্বত স্বরূপ। তথাপি 'যাচিত মণ্ডন' ন্যায়ে সেই ব্রহ্ম সত্তাই জগতের সত্তা বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। তাহার ফলে অসত্য জগৎও সত্যের ন্যায় লোক-বুদ্ধির গোচর হইয়া থাকে। যিনি এই সত্যাসত্যের ভেজাল বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ—বিবেকী, তিনি জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে বিরাট্ ব্রহ্মসত্তা অনুভব করিয়া আনন্দিত হন, আর অবিবেকী পুরুষ উহার বিশ্লেষণ করিতে না পারিয়া অসত্য জগৎকেও সত্য জ্ঞানে আদর করিয়া থাকে।

এইরূপ জগতের অসত্যতা ও ব্রহ্মের সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্যই উপনিষদ্ শাস্ত্র অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন প্রসঙ্গে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের সম্বন্ধে—

"যতো বা ইমা ন ভূতা ন জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি"

ইত্যাদি কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাই যে, উপনিষদের গূঢ় তাৎপর্য্য, তাহা আচার্য্য গৌড়পাদ মাণ্ডুক্যোপনিষদের একটি-মাত্র শ্লোকে অতি বিশদভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। শ্লোকটী এই,—

"মৃল্লোহ-বিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতান্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন॥"

অর্থাৎ উপনিষদের মধ্যে যে, মৃত্তিকা, লৌহ ও স্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা সৃষ্টির কথা উপদেশ করা হইয়াছে; বুঝিতে হইবে, তাহা কেবল সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত ব্রহ্মবিষয়ে বুদ্ধিপ্রবেশের দ্বার মাত্র; প্রকৃত পক্ষে জগতে ব্রহ্মাতিরিক্ত ঐরূপ কোনও পদার্থের সত্তা নাই।

মহর্ষি বেদব্যাসও উক্তপ্রকার উপনিষদ্‌পদ্ধতি অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মনিরূপণের অন্য কোনও সমীচীন পথ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাই তিনি ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ-পরিচয় দিতে যাইয়া "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। কার্য্য দ্বারা যে, এইরূপ পরিচয় প্রদান করা হয়, ইহাকে 'তটস্থ লক্ষণ' বলে। বস্তুতই যিনি "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ," তাঁহার পরিচয় 'তটস্থ লক্ষণ' ভিন্ন দিতে পারাযায় কিরূপে? এই প্রসঙ্গেই উপনিষদ্‌ সৃষ্টিতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু সৃষ্টির সত্যতা জ্ঞাপনের জন্য নহে; কারণ, সৃষ্টি উহার তাৎপর্য্য-বিষয়ই নয়। আচার্য্য শঙ্করও একথা অতি দৃঢ়তার সহিত প্রতিপাদন করিয়াছেন। (১)

---

(১) "ভবেদপি কার্য্যস্য বিগীতত্বম্, অপ্রতিপাদ্যত্বাৎ। নহ্যয়ং সৃষ্ট্যাদি-প্রপঞ্চঃ প্রতিপিপাদয়িষিতঃ। নহি তৎপ্রতিবদ্ধঃ কশ্চিৎ পুরুষার্থো দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা; নচ কল্পয়িতুং শক্যতে; উপক্রমোপসংহারাভ্যাং তত্রতত্র ব্রহ্মবিষয়ৈর্ব্বাক্যৈঃ সাকমেকবাক্যতায়া গম্যমানত্বাৎ। দর্শয়তি চ সৃষ্ট্যা-দি প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থতাং—"অন্নেন সোম্য শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছ, অদ্ভিঃ

এইপ্রকারে জীবচিন্তাও অদ্বৈতভাব-সংস্থাপনের জন্যই উপনিষদে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব প্রতিপাদনই যখন উপনিষদের অবিসংবাদিত লক্ষ্য, তখন জীবের স্বরূপ-পরিচয়াদির চিন্তাও উপনিষদের অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে।

জগতের ন্যায় জীবকেও অসত্য বা অবস্তু বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। কেবল বৌদ্ধ ও নাস্তিকসম্প্রদায় ভিন্ন আর কেহই জীবের নিত্য-সত্য-কূটস্থরূপতা স্বীকার করিতে

সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ—"+ + + ইতি। মৃদাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ কার্য্যস্য কারণাভেদং বদিতুং সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চঃ শ্রাব্যত ইতি গম্যতে।"

(বেদান্তদর্শন—১।৪।১৪ সূত্র, শাঙ্করভাষ্য)।

ভাবার্থ:—সৃষ্টিকার্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য থাকিলেও দোষ নাই; কারণ, উহা উপনিষদের প্রতিপাদ্য (মুখ্য বিষয়) নহে। উপনিষদের মধ্যে সৃষ্টিবিজ্ঞানের কোনপ্রকার ফলসম্বন্ধ দেখায়ায় না, শোনাও যায় না; আর সেরূপ ফলসম্বন্ধ কল্পনাও করিতে পারা যায় না। কেন না, ঐ প্রকরণের আরম্ভ ও উপক্রমের বিচার করিলে ব্রহ্মবিষয়েই সৃষ্টি-বাক্যের তাৎপর্য্য প্রতীত হয়। যেমন—'হে সোম্য, তুমি পৃথিবীরূপ কার্য্য পদার্থ দ্বারা তৎকারণীভূত জলের অনুসন্ধান কর। আবার জলরূপ কার্য্য দ্বারা তৎকারণ তেজের অনুসন্ধান কর, ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝাযায় যে, কারণানুসন্ধানার্থই সৃষ্টিপ্রকরণের অবতারণা। বিশেষতঃ মৃত্তিকা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা কার্য্যজগতের কারণাভিন্নত্ব প্রতিপাদনার্থই সৃষ্টিপ্রপঞ্চের অবতারণা করা হইয়াছে, বুঝাযাইতেছে।

অনুমত করেন নাই ; সুতরাং জীবের অস্তিত্ব সাধনে অধিক প্রয়াস আবশ্যক হয় না সত্য, কিন্তু জীবের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিলে, তদ্দারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা ব্যাহত হইতে পারে ; এই কারণে উপনিষদ্‌শাস্ত্র জীবেরও স্বরূপ-চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; এবং উত্তমরূপে বুঝাইয়াছেন যে, জীব যদিও আপাতজ্ঞানে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ পদার্থ বলিয়াই প্রতীত হয় সত্য, যদিও জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে আকাশ-পাতাল-প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় সত্য, এবং যদিও ব্রহ্ম হইতে জীবের স্বতন্ত্রতা স্বীকার না করিলে জীবের একান্ত কল্যাণকর কর্ম্মকাণ্ড ও উপাস্যোপাসকভাবও রক্ষা পাইতে পারে না সত্য, তথাপি কোন জীবই যখন ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা পৃথক্ পদার্থ নহে, তখন জীবের দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হইতে পারে না। কারণ, জীবের জীবভাব অবিদ্যাকল্পিত ; উহা ব্রহ্ম-চৈতন্যেরই নামান্তর মাত্র। ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্যপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলিতেছেন—

"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়"
"অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে
ব্যাকরবাণি" ইত্যাদি।

অর্থাৎ ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব জন্মিব, এবং এই জীবাত্মারূপে ভূতত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক নাম ও রূপ (আকৃতি) ব্যক্ত করিব ইত্যাদি।

এখানে 'জীবেন আত্মনা' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ একই পদার্থ, কেবল উপাধিসংপর্ক বশতঃ উপাধির ভেদানুসারে ভিন্ন প্রতীতি হয় মাত্র। উপনিষদ্‌ই অন্যত্র একথা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—

"যথাগ্নের্জ্জ্বলতো বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি, এবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি" ইত্যাদি।

এখানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সহিত জীবকে তুলিত করা হইয়াছে। অন্যত্র কোথাও—

"এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল-চন্দ্রবৎ॥"

কোথাও বা—

'বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"

কোথাও আবার—

"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্,
অপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো
দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা॥"

ইত্যাদি প্রকারে ব্রহ্মেরই জীবভাবে প্রকটনের কথা বিশদ ভাবে বলিয়াছেন। উপনিষদ্ যে কথা বিভিন্ন ভঙ্গীক্রমে বলিয়াছেন; বিদ্যারণ্যমুনি তাহাই আরও অল্প কথায় স্পষ্ট ও নিঃসংশয়িতরূপে বলিয়া দিয়াছেন—

"মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ।
যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং, তত্ত্বন্ত্বদ্বৈতমেব হি॥"

এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, জীবভাব ও ঈশ্বরভাব উভয়ই মায়াকল্পিত; অদ্বৈতই প্রকৃত তত্ত্ব। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের সহিত জীবের যে ভেদ, তাহাও মায়া-পরিকল্পিত—মিথ্যা; সুতরাং মিথ্যা বা অসত্য জীবভাব দ্বারা ব্রহ্মের তাত্ত্বিক অদ্বৈতভাব বাধিত হইতে পারে না।

এই কারণেই অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—জীবের ব্রহ্মভাব প্রতিপাদনেই বেদান্তের—সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য; উহাই প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যার লক্ষ্য; ব্রহ্মের কেবল স্বরূপপ্রতিপাদন উহার লক্ষ্য নহে। যদিও এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ দৃষ্ট হয় সত্য; তথাপি এখানে সে সকল কথার উত্থাপন করা আবশ্যক মনে করি না। কারণ, এ সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও যে, নিজের ব্রহ্মভাব বুঝিতে পারে না, অজ্ঞানই তাহার মূল কারণ। জ্ঞানোদয়ে যখন জীবের সেই অজ্ঞান (মায়া) তিরোহিত হইয়া যায়, তখনই

সে নিজের যথার্থ স্বরূপ—অদ্বৈত ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। তাই আচার্য্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

"অনাদি-মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥"

অর্থাৎ প্রাকৃত জীবমাত্রই অনাদি কাল হইতে গভীর মায়া-নিদ্রায় বিমোহিত হইয়া রহিয়াছে; সেই কারণে সুপ্ত ব্যক্তি যেমন আপনার জাগ্রদবস্থাগত বিষয়বিভব কিছুই অনুভব করিতে পারে না এই জীবও তেমনি আপনার ব্রহ্মভাব অনুভব করিতে পারে না। যখন সৌভাগ্য-সূর্য্যোদয়ে ইহার সেই চিরন্তন মায়া-নিদ্রার অবসান হইবে, যখন উপযুক্ত আচার্য্যের কৃপায় সম্যক্ প্রবোধ-লাভ ঘটিবে, তখনই সে নিজের নিজস্ব রূপ—'আমি জন্ম-জরামরণ-রহিত, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিবর্জ্জিত, সুখদুঃখাদ্যতীত অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ, এই ভাব, উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে। জীবের এই চিরসুপ্ত ব্রহ্মভাব উদ্বোধিত করিবার জন্যই উপনিষদে, জ্ঞান, কর্ম্ম ও উপাসনা এই ত্রিবিধ সাধনের কথা উত্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে। জ্ঞানের কথা পরে বলিব, এখন কর্ম্ম ও উপাসনার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াই বক্তব্য শেষ করিব।

ব্রহ্মের স্বরূপ-নিরূপণে বা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদনে পনিষদের মুখ্য তাৎপর্য্য হইলেও, কর্ম্মকাণ্ড ইহার উপেক্ষণীয় নহে; কারণ, কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে উহা সম্পন্নই হইতে পারে না। মলিন

দর্পণে যেরূপ মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে না ; উষর ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজে যেমন অঙ্কুরোদ্গম করে না, তদ্রূপ মলিন ও বিক্ষিপ্ত চিত্তে উপদিষ্ট তত্ত্ববিদ্যাও প্রকৃত আত্মজ্ঞান বিকাশ করে না ; এই জন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষকে প্রথমেই চিত্তটি স্থির ও নির্ম্মল করিতে যত্নপর হইতে হয়।

বস্ত্র পরিষ্কার করিবার কালে রজকগণ যেমন প্রথমে ক্ষার-সংযোগ, অগ্নি-সংস্তাপন ও আহনন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা বস্ত্রের নির্ম্মলতা সাধন করে, তেমনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষকেও তীব্র তপস্যা ও কর্ম্মানুষ্ঠানের সাহায্যে চিত্তকে নির্ম্মল করিতে হয়; পরে উপাসনার সাহায্যে সেই নির্ম্মল চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন করিতে হয়। চিত্তের স্থিরতা ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারই জন্মে না। ব্রহ্মবিদ্যার সহিত কর্ম্মকাণ্ডের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সংবন্ধ সূচনার অভিপ্রায়েই উপনিষদ্ শাস্ত্র কর্ম্মাঙ্গ উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দেখিতে পাই, এরূপ উপনিষদ্ অতি অল্পই আছে, যাহাতে কোন প্রকার উপাসনারই ব্যবস্থা নাই। বস্তুতঃ প্রসিদ্ধ সমস্ত উপনিষদেই অল্পাধিক পরিমাণে উপাসনার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ছান্দোগ্য ও বৃদারণ্যকে অন্যান্য উপাসনার সঙ্গে কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা সম্বন্ধেও অনেক কথা রহিয়াছে।

কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা অর্থ—প্রসিদ্ধ অশ্বমেধ প্রভৃতি বৈধ যজ্ঞাঙ্গে দৈবত-চিন্তা। সাধারণ যজ্ঞ ঋত্বিক্, দ্রব্য ও মন্ত্রাদি দ্বারা সম্পাদিত হয়, কিন্তু ঐ সমুদয় যজ্ঞ শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা সম্পাদিত হয় ; তাহাতে

আর ঋত্বিক্ প্রভৃতির অপেক্ষা থাকে না। আবার ঐপ্রকার বৈধ যজ্ঞের অঙ্গভূত দ্রব্যাদি অবলম্বনেও উপনিষদুক্ত প্রণালী-ক্রমে উপাসনার ব্যবস্থা আছে। এই প্রণালীর উপাসনাকে কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা কহে। এই জাতীয় উপাসনার প্রভাবে কর্ম্মাসক্ত মানবগণেরও মনোমধ্যে চিন্তাশক্তি সংধুক্ষিত হইয়া মনকে স্থির ও নির্ম্মল করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার দিকে অগ্রসর করিয়া থাকে। ক্রমে ঐরূপ কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা করিতে করিতে জ্ঞানাঙ্গ উপাসনাতেও অধিকার জন্মে। এই প্রসঙ্গে এখানে উপাসনার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা বোধ হয় অনাবশ্যক হইবে না।

উপাসনা অর্থ—মানসিক ব্যাপার বা চিন্তাবিশেষ। বিনা আলম্বনে চিন্তা আসিতে পারে না; এই জন্য উপাসনাতেও কোন একটা আলম্বন থাকা আবশ্যক হয়। তাহার পর, নাম-রূপসম্বন্ধশূন্য কোন বস্তুই যখন আমাদের চিন্তা-পথে বা ধারণায় আসে না, বা আসিতে পারে না, তখন সেই উপাস্য বস্তুটীরও যে, নাম রূপাদি গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক, তাহা না বলিলেও হয়। এই জন্যই ভারতীয় আচার্য্যগণ উপাসনার পরিচয় প্রদান স্থলে বলিয়াছেন—

উপাসনা।

"উপাসনং নাম সগুণ-ব্রহ্মবিষয়কো মানসো ব্যাপারঃ।"

অর্থাৎ ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণাত্মক যে দুইটি ভাব আছে, তন্মধ্যে সগুণ ভাবই মানস ব্যাপাররূপী উপাসনার বিষয়ীভূত হয়, আর নির্গুণ ভাবটি কেবল জ্ঞানমাত্রের বিষয় হয়। নির্গুণভাব যে, কেন উপাসনার বিষয় হয় না ও হইতে পারে না, তাহা আমরা ইতঃ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সুতরাং সে কথার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। উপাসনা ও ধ্যান একই বস্তু; কেবল নাম মাত্রেভেদ। মহামুনি পতঞ্জলি যোগদর্শনে বলিয়াছেন—

"যথাভিমতধ্যানা দ্বা ॥"

অর্থাৎ অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগতে ভগবানের যে রূপটি তোমার ভাল লাগে—মনোরম বোধ হয়, যাহা দেখিলে তোমার মন স্বতই আকৃষ্ট হয়; সেইরূপ রূপবিশেষ অবলম্বন করিয়া উপাসনা করাই প্রশস্ত এবং তাহা দ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা সম্পন্ন হয়।

উপনিষদ্ আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, উপাসনা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা ও জ্ঞানাঙ্গ উপাসনা। কর্ম্মাঙ্গ উপাসনাসমূহ কর্ম্মের সহিত অনুষ্ঠেয়, এবং স্বতন্ত্রভাবেও অনুষ্ঠেয় হইতে পারে। যেমন বৃহদারণ্যকোপনিষদে অশ্বমেধযাগের অঙ্গরূপে বিহিত—

"ঊষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ, সূর্য্যশ্চক্ষুঃ, বাতঃ প্রাণঃ, ব্যাত্তমগ্নির্বৈশ্বানরঃ, সংবৎসর আত্মা অশ্বস্য মেধ্যস্য ॥"

ইত্যাদি উপাসনা। যাহাদের অশ্বমেধ যজ্ঞে অধিকার আছে, তাহারা যজ্ঞানুষ্ঠানকালেই এইরূপ উপাসনা করিবেন; আর যাহাদের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকার নাই, যেমন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি; তাহারা স্বতন্ত্রভাবেই ঐরূপ উপাসনা দ্বারা অশ্বমেধানুষ্ঠানের কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন, এবং উপাসনার প্রকৃত ফললাভেও পরিতুষ্ট হইবেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদে কথিত 'উদ্‌গীথ' উপাসনাও কর্ম্মাঙ্গ উপাসনারই অন্তর্গত। এইরূপ আরও অনেকপ্রকার উপাসনা আছে; উপনিষদের পাঠক নিজেই তাহা দেখিয়া সুখী হইতে পারিবেন।

বলা আবশ্যক যে, উপনিষদে কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা অপেক্ষা জ্ঞানাঙ্গ উপাসনার সংখ্যাই অধিক। সে সমুদয় উপাসনা সাধারণতঃ বিদ্যা নামে অভিহিত; যেমন 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা' 'শাণ্ডিল্য-বিদ্যা' 'সংবর্গবিদ্যা' প্রভৃতি। এখানে একটীমাত্র বিদ্যার (পঞ্চাগ্নিবিদ্যার) কথা বলিয়াই এখানকার বক্তব্য শেষ করিব।

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে যে, অরুণতনয় শ্বেতকেতু একদা পঞ্চালপতি প্রবাহণনামক রাজার সভায় গমন করেন। রাজা তাহাকে পাঁচটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল—

"বেত্থ পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি? ইতি"

অর্থাৎ তুমি জান কি, কর্ম্মানুষ্ঠাতার মৃত্যুর পর তাহার হবিঃসম্ভূত সূক্ষ্ম বাষ্পরাশি কিরূপে পঞ্চমী আহুতিতে আহুত হইয়া পুরুষপদবাচ্য হয়? অর্থাৎ অভিনব মানবরূপে জন্ম লাভ করে? তদুত্তরে শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন—

"নৈব ভগব ইতি" (ছান্দোগ্য ৫।৩)

অর্থাৎ মহাশয়, আমি নিশ্চয়ই জানি না। ইহার পর শ্বেতকেতু নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পিতার সমীপে উপস্থিত

হইলেন, এবং সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। অনন্তর পিতা ও পুত্র উভয়ে মিলিত হইয়া ঐ বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে রাজা প্রবাহণের নিকট গমন করিলেন; এবং তাহাকে উক্ত বিদ্যা উপদেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর রাজা প্রবাহণ দ্যুলোক, পর্জ্জন্য (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, এই পাঁচ-প্রকার অগ্নিনির্দ্দেশপূর্ব্বক মানবোৎপত্তির বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়া বলিলেন—উল্লিখিত দ্যুলোক, পর্জ্জন্য (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ ও গর্ভধারিণী পত্নী, এই পাঁচটি পদার্থকে অগ্নিরূপে ভাবনা করিবে। দ্যুলোক প্রভৃতিতে এই পাঁচ প্রকার ভাবনাকে 'পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা' কহে।

এই জাতীয় উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও উহাদের প্রধান ফল চিত্তশুদ্ধি—চিত্তের বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য দোষের নিবৃত্তি। অচঞ্চল ও নির্ম্মল চিত্তে স্বতই ব্রহ্মজ্ঞানের দিব্যালোক ফুটিয়া উঠে। তখন তাহার হৃদয় হইতে সমস্ত সংশয়, অহঙ্কার ও ব্রহ্মের সহিত আপনার ভেদভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া যায়, এবং ব্রহ্ম-সাগরে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া পরম শান্তিলাভে চির-কৃতার্থ হয়। তাই উপনিষদ্ বলিতেছেন—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

ইতঃপূর্ব্বে আমরা উপনিদ্ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলিবার বলিয়াছি। এখন উপনিষদের উপদেশ সম্বন্ধে অনেক কথা

বলিবার আছে ; সংক্ষেপতঃ সে সমুদয় বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। ব্রহ্মই উপনিষদ্‌শাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয় ; সুতরাং তাহাই আমাদের বক্তব্য বিষয় বুঝিতে হইবে।

আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, উপনিষদ্‌শাস্ত্র আপনার বক্তব্য বিষয় সমূহ অতি উদারভাবে বিশ্বজনের সম্মুখে উপস্থাপনমাত্র করিয়াছেন, কিন্তু কোনও ধর্ম্ম কিংবা সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি উপেক্ষা বা কটাক্ষপাতের লক্ষণ অতি অল্পমাত্রও দেখান নাই।

উপনিষদের এই মহনীয় উদারতাই কালক্রমে বিষম অনর্থসৃষ্টির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনুদারস্বভাব পরবর্ত্তী লোকেরা নিজ নিজ অভিপ্রায়ানুসারে উপনিষদের সেই সরল উপদেশাবলীকেই কুটিলপথে পরিচালিত করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এমন কোনও প্রাচীন ধর্ম্মসম্প্রদায় দৃষ্ট হয় না, যাহারা উপনিষদ্‌শাস্ত্রকে আপনাদের দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই।

উপনিষদের প্রতি এবম্বিধ লোকানুরাগদর্শনে মহাকবি কালিদাসের—

"অহমেব মতো মহীপতেরিতি সর্ব্বা প্রকৃতিস্বচিন্তয়ৎ।"

এই শ্লোকটী মনে পড়ে। মহারাজ রঘুর প্রকৃতিবর্গ সকলেই মনে করিত, যেন আমিই মহারাজ রঘুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। মহারাজ রঘুর সম্বন্ধে যাহা কল্পিত, উপনিষদ্ সম্বন্ধে তাহাই বাস্তবিক।

কারণ, ভারতীয় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক আচার্য্যই মনে করিয়া থাকেন যে, তাহাদের অভিমত সিদ্ধান্তসমূহই উপনিষদেরও অভিমত ও অনুমোদিত। এরূপ মনে করিবার প্রধান কারণ এই যে, উপনিষদের অতিমাত্র উদারতা। তাহার উপর আবার অবাঙ্‌-মনসগোচর গুহ্য বিষয়ের উপদেশ।

অনুসন্ধান করিলে, বুঝিতে পারা যায় যে, আলোচ্য উপনিষদ্ শাস্ত্রসমূহ যেন কোন এক অনির্ব্বচনীয় পরম গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশনে ব্যাপৃত আছে; কিন্তু সেই তত্ত্বটা যে, কি, এবং কি প্রকার, তাহা কোথাও খোলসা করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছে না; কেবল আকারে ঈঙ্গিতে যেন বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে। অথচ উপনিষদের প্রায় সর্ব্বত্রই কেবল 'পরম গুহ্য' কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিতেছেন—

"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ॥"
এবং—"এষা বেদগুহ্যোপনিষদ্" (৫।৬)

অর্থাৎ পুরাকালে বেদান্তে যে, পরম গুহ্যতত্ত্ব নিহিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ শান্তচিত্ত পুত্র বা শিষ্য ভিন্ন অপর কাহাকেও উপদেশ করিবে না। 'ইহাই বেদের নিগূঢ়তম উপনিষদ্ (রহস্যবিদ্যা)।' কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন—

"য ইদং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।" (১।৩।২৫)

'যিনি এই পরম গুহ্যতত্ত্ব ব্রহ্মসভায় শ্রবণ করান।'

ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

"তে বা এতে গুহ্যা আদেশাঃ।" (৩।৫।২)

এ সমস্তই সেই গুহ্য উপদেশ।

মহানারায়ণ উপনিষদে আছে—

"এতদ্বৈ মহোপনিষদং দেবানাং গুহ্যম্।" (২৪।২)

'এই যে মহোপনিষদ্, ইহা দেবগণের নিকটও গোপনীয়।' এই রহস্যবাহুল্যই উপনিষদ্ শাস্ত্রকে সাধারণ বুদ্ধির অগম্য করিয়া রাখিয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, উপনিষদ্‌শাস্ত্র, যে পরম গুহ্য তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার সংরক্ষণের নিমিত্ত এত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন এবং উপদেশেও এত কঠোরতার আদেশ করিয়াছেন, সেই পরম গুহ্য তত্ত্বটা কি? এবং তাহা জানিলে ও পাইলেই বা বিশেষ ফললাভ কি হয়? জানিবার জন্য মনোমধ্যে যে কৌতূহলের উদ্রেক হইয়া থাকে, তাহা নিবারণ করিবারইবা উপায় কি?

আচার্য্যগণ বলেন, সে কৌতূহল নিবারণ করিতে হইলে 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্' এই মহাজন-বাক্যের অনুসরণ করিতে হয়, অর্থাৎ উপনিষদের সাহায্যেই উপনিষদের মর্ম্ম জানিতে ও বুঝিতে হয়, এবং তদ্বিষয়ক সংশয় ছেদন করিতে হয়।

প্রসিদ্ধ উপনিষদ্-গ্রন্থসমূহ উত্তমরূপে আলোচনা করিলে

দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপনিষদ্‌সমূহের মধ্যে ভাষা ও বাক্য-বিন্যাসের বৈষম্য এবং বাচ্যার্থগত যথেষ্ট অনৈক্য আছে, কিন্তু তৎসত্বেও একটা বিষয়ে সকলেরই ঐক্য আছে; এবং সকলেই সে বিষয়ে সমস্বরে সমাদর, সমর্থন ও অনুমোদন করিয়াছেন; সেই বিষয়টি হইতেছে—ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মসম্বন্ধ থাকাতেই উপনিষদ্ শাস্ত্র 'ব্রহ্মবিদ্যা' নামে পরিচিত হইয়াছে।

এই ব্রহ্মই বিভিন্ন উপনিষদের মধ্যে কোথাও আত্মা, কোথাও 'অক্ষর', কোথাও 'আকাশ', কোথাও বা প্রাণ ও পুরুষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। উপনিষদ্ হইতেই কয়েকটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া এ কথার যথার্থতা প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

ঈশোপনিষদ্ প্রথমেই "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বম্" বলিয়া 'ঈশা' শব্দদ্বারা ব্রহ্মনিরূপণের সূচনা করিয়াছেন।

কেনোপনিষদ্‌ও—

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে॥" (১।৪)

অর্থাৎ মনের দ্বারা যাহাকে মনন করা যায় না, বরং মনই যাহার সাহায্যে মননের বিষয়ীভূত হয়; তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; কিন্তু লোকে যাহাকে 'ইদং' বলিয়া জড়-পদার্থ-জ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকে, তাহা প্রকৃত ব্রহ্ম নহে, ইত্যাদি বাক্যপরম্পরা দ্বারা ব্রহ্ম-প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য জ্ঞাপন করিতেছেন।

তাহার পর কঠোপনিষদে দেখিতে পাই—যমরাজ নচিকেতাকে বরপ্রদানে উদ্যত হইলে পর, নচিকেতা যমরাজকে বলিতেছেন—

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ।"

অর্থাৎ যাহা ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত, কার্য্য-কারণভাব-বিবর্জ্জিত, এবং ভূত ভবিষ্যতেরও বহির্ভূত, এরূপ যাহা আপনি জানেন, তাহা আমাকে বলুন। তদুত্তরে যমরাজ বলিলেন—

"পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।"

অর্থাৎ পুরুষের পরে আর কিছু নাই; পুরুষই সকলের শেষ সীমা, এবং পুরুষই পরমা গতি।' ইহা হইতেও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মই উপনিষদের পরম গুহ্য তত্ত্ব; তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। একথা স্বয়ং কঠোপনিষদ্ই—

"হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।"

এই বাক্যে ব্রহ্মকে 'সনাতন গুহ্য' শব্দে বিশেষিত করিয়া বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, উপনিষদের 'পরম গুহ্য তত্ত্বটা' ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

এইরূপে সমস্ত উপনিষদ্ই সমস্বরে ব্রহ্মনিরূপণের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলিতেছেন—

"তমেবৈকং জানথ আত্মানম্, অন্যা বাচো
বিমুঞ্চথ।" (২।৫)

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিতেছেন—

"ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্। + + + সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" (ব্রহ্মানন্দবল্লী-১)

ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মের লক্ষণ—সত্য জ্ঞান ও অনন্ত, এবং—

"অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥"

[ব্রহ্মানন্দবল্লী]

ঐতরেয় উপনিষদে আছে—

কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে। কতরঃ স আত্মা?" ইত্যাদি। (৩।১)

আমরা যাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি, সেই আত্মা কোনটী?

উপরে যে সমুদয় উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত হইল, তাহার সর্ব্বত্রই প্রধানতঃ ব্রহ্মবিষয়েই প্রশ্ন,এবং উত্তর কিংবা মীমাংসাও তদ্বিষয়েই পরিলক্ষিত হয়। মীমাংসাগ্রন্থের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে, আত্মা, আকাশ, অক্ষর ও পুরুষ প্রভৃতি শব্দগুলি ব্রহ্মেরই বিভিন্নপ্রকার মহিমাব্যঞ্জক বিভিন্নপ্রকার নাম মাত্র; বস্তুভেদের দ্যোতক নহে। ছান্দোগ্যোপনিষদে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে, তাহা হইতেও আমরা এবিষয়ের মীমাংসা পাইতে পারি। আখ্যায়িকাটী এই—

একদা মহর্ষি নারদ বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে ভগবান্ সনৎ-কুমারের সমীপে গমন করেন, এবং 'অধীহি ভগবঃ' বলিয়া তাঁহার নিকট নিজের মনোগত ভাব জ্ঞাপন করেন। নারদের প্রার্থনা শুনিয়া ভগবান্ সনৎকুমার নারদকে বলিলেন—'তুমি যে পর্য্যন্ত অবগত আছ, অগ্রে তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর, পরে তোমার অনধিগত বিষয়ে আমি উপদেশ করিব।' তখন নারদ নিজের অধিগত বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়া নির্ব্বেদপ্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—

"সোঽহং ভগবঃ, মন্ত্রবিদেবাস্মি, নাত্মবিৎ; শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ—তরতি শোকমাত্মবিদ্। সোঽহং ভগবঃ শোচামি, তং মা ভগবান্ শোকস্য পরং পারং তারয়তু ইতি।" (৫।৩।১-)

ভগবন্ আমি এত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াও কেবল মন্ত্রার্থমাত্রই অধিগত হইয়াছি; কিন্তু আত্মবিদ্ হইতে পারি নাই। হে ভগবন্, আপনাদের ন্যায় মহাত্মাদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, আত্মজ্ঞানই শোক-নির্ব্বাপণের একমাত্র উপায়। ভগবন্, আমিও বড় শোকান্বিত; আপনি আমাকে শোক-সাগরের পরপারে উত্তীর্ণ করুন ইত্যাদি।

অনন্তর সনৎকুমার নারদের শোকশান্তির নিমিত্ত ভূমা ব্রহ্মের উপদেশ প্রদান করেন।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, নারদ ঋষি বহুতর বিদ্যা অবগত

হইয়াও, একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞানের অভাবে আপনাকে অকৃতার্থ মনে করিয়া শোকানুভব করিতেছেন; এবং তন্নিবারণার্থ আচার্য্য সনৎকুমারের শরণাপন্ন হইতেছেন। সনৎকুমারও ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাহার শোক-নির্ব্বাপণ করতঃ শান্তিপ্রদান করিলেন। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মই উপনি-ষদের সেই 'পরম গুহ্য তত্ত্ব'।

ঐ ছান্দোগ্যোপনিষদেরই অন্যত্র কথিত আছে যে, প্রাচীনশাল প্রভৃতি কতিপয় ঋষি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও আত্মতত্ত্ব নিরূপণে অসামর্থ্য প্রযুক্ত সকলে সমবেতভাবে চিন্তা করিতে-ছিলেন যে, "কো ন আত্মা, কিং তৎ ব্রহ্ম?"

অর্থাৎ আমাদের আত্মা কি? এবং সেই ব্রহ্মই বা কি? সেখানেও আত্মা ও ব্রহ্ম চিন্তারই সর্ব্বতোভাবে প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্ম বা আত্মা যদিও সাধারণের সম্পত্তি হউক, যদিও সে সম্বন্ধে অনেকেই অনেকপ্রকার কথা বলিয়াছেন সত্য, তথাপি একথা সাহসের সহিত বলিতে পারা যায় যে, উপনিষদ্ সে সম্বন্ধে যেরূপ দিব্যালোক প্রদান করিয়াছে, তাহা জগতে অতি দুর্লভ; অন্যত্র কোথাও তাহা নাই। নাই বলিয়াই একাধিক স্থানে ব্রহ্মকে 'ঔপনিষদ' ও 'বেদান্তবেদ্য' প্রভৃতি অসাধারণ বিশেষণে বিশেষিত করিতে দেখা যায়। যেমন—

"তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"। (বৃহ০৩।৯।২৬)

"ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রম্" (মুণ্ডক ২।২।৩)

"অমায়মপ্যৌপনিষদমেব" (নৃসিংহ ৯)

উপনিষদ্‌ভিন্ন অন্যত্রও যদি ব্রহ্মতত্ত্ব যথাযথভাবে নির্ণীত থাকিত, তাহা হইলে কখনই ঐরূপ অনন্যসাধারণ 'ঔপনিষদ' বিশেষণ যোজনা করা সমীচীন হইত না।

এই সমুদয় প্রমাণ দৃষ্টে মনে হয়, পৃথিবী যেরূপ সূর্য্যকে কেন্দ্রস্থল করিয়া তাহারই চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, আলোচ্য উপনিষদ্ শাস্ত্রও তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্মকেই কেন্দ্রস্বরূপে রাখিয়া তাঁহারই স্বরূপ, বিভাগ, বিভূতি ও উপাসনা প্রভৃতি নিরূপণ প্রসঙ্গে আবর্ত্তিত হইতেছে।

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারাযায় যে, এরূপ দেশ বা সমাজ অতি অল্পই আছে, যেখানে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনপ্রকার চিন্তা আদৌ স্থান পায় নাই। প্রত্যেক সভ্যদেশে ও প্রত্যেক সভ্যসমাজে জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেই ঈশ্বর বিষয়ে কোন না কোন রকম একটা ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে, এবং তদনুসারে তাহার স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ ও মহিমা প্রভৃতিও বিভিন্নাকারে কল্পনা করিয়া, তদনুযায়ী আরাধনা বা উপাসনাকেই জীবনিস্তারের অমোঘ উপায়রূপে অবলম্বন করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদের কেহই মনে করে না যে, 'আমরা সকলে একই পথের পথিক, এবং একই উদ্দেশ্যের বশে একই পরমাত্মার অন্বেষণে এত কঠোর ক্লেশ স্বীকার করিতেছি।'

অন্যদেশের কথা দূরে থাকুক, এই ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় যে, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেও

স্মরণাতীত কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, সমুদ্রোত্থিত জল-বুদ্বুদের ন্যায়, কত শত ধর্ম্মমত ও উপাসক-সম্প্রদায় যে আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব।

ঐ সমুদয় সম্প্রদায় একই উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত হইলেও উহাদের মধ্যে এমন দুইটী সম্প্রদায় দৃষ্ট হয় না, যাহাদের মধ্যে সর্ব্বাংশে মতের মিল আছে। সাধারণতঃ অধিকাংশ সম্প্রদায়ই বাহ্য নাম ও রূপাদিব্যামোহে পতিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বিষ উদ্গীরণ করিতে পশ্চাৎপদ বা কুণ্ঠিত হন নাই। প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য মহামতি উদয়নাচার্য্য স্বপ্রণীত ঈশ্বরনিরূপক কুসুমাঞ্জলি নামক গ্রন্থে কতকগুলি উপাসকসম্প্রদায় বা ঈশ্বরবাদীর তালিকা প্রদান করিয়াছেন; এখানে তাহা উদ্ধৃত করা গেল; তদ্দৃষ্টে একথার যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে।

"ইহ যদ্যপি যং কমপি পুরুষার্থমর্থয়মানাঃ—শুদ্ধবুদ্ধ-স্বভাব ইতি ঔপনিষদাঃ, আদিবিদ্বান্ সিদ্ধইতি কাপিলাঃ, ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টো নির্ম্মাণকায়মধিষ্ঠায় সম্প্রদায়-প্রদ্যোতকোঽনুগ্রাহকশ্চেতি পাতঞ্জলাঃ, শিব ইতি শৈবাঃ, পুরুষোত্তম ইতি বৈষ্ণবাঃ, পিতামহ ইতি পৌরাণিকাঃ; যজ্ঞপুরুষ ইতি যাজ্ঞিকাঃ, সর্ব্বজ্ঞ ইতি সৌগতাঃ, নিরাবরণ ইতি দিগম্বরাঃ; উপাস্যত্বেন দেশিত

ইতি মীমাংসকাঃ; লোকব্যবহারসিদ্ধ ইতি চার্ব্বাকাঃ; যাবদুক্তোপপন্ন ইতি নৈয়ায়িকাঃ; কিং বহুনা, যং কারবোঽপি বিশ্বকর্ম্মেতি উপাসতে' ইতি। (স্তবক)।

মর্ম্মার্থ এই যে,—

জগতে সকল লোকই অভিমত পুরুষার্থ প্রাপ্তির আশায় ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের উপাস্য এক হইলেও তদ্বিষয়ে ধারণা একপ্রকার নহে। যেমন উপনিষদ্‌-মতাবলম্বীদের ধারণা—তিনি শুদ্ধ বুদ্ধস্বভাব অর্থাৎ পাপাদিদোষে অসংস্পৃষ্ট ও জ্ঞানস্বরূপ; কপিলমতানুযায়ীদের ধারণা—তিনি আদিবিদ্বান্ জ্ঞানসিদ্ধ; পাতঞ্জলেরা মনে করেন, তিনি অবিদ্যাদি—ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল ও কর্ম্মসংস্কারে কখনও সংবদ্ধ নহেন, এবং তিনি ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণপূর্ব্বক সম্প্রদায়প্রবর্ত্তন ও লোকানু-গ্রহ করিয়া থাকেন। শৈবগণ বলেন, তিনি শিব; বৈষ্ণবগণ বলেন, তিনি পুরুষোত্তম (বিষ্ণু), পৌরাণিকগণের মতে, তিনি পিতামহ (ব্রহ্মা); যাজ্ঞিকগণ বলেন যজ্ঞপুরুষ; বৌদ্ধগণ বলেন, সৌগত (শাক্য সিংহ); দিগম্বর বৌদ্ধগণ বলেন, তিনি আবরণশূন্য; মীমাংসকগণ বলেন, তিনি উপাস্যরূপে উপদিষ্ট; চা[illegible]কগণ বলেন, তিনি ব্যবহারসিদ্ধ অর্থাৎ ব্যবহার জগতে তিনিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রখ্যাত; নৈয়ায়িকগণ বলেন, যাহা যুক্তিসঙ্গত, তাহাই তাঁহার স্বরূপ; অধিক কি, কারিকর লোকেরা তাহাকে বিশ্বকর্ম্মা ঠাকুর বলিয়াও উপসনা করে।

পুরাণ ও ইতিহাসগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে, ঈশ্বর সম্বন্ধে আরও অনেক প্রকার উত্তমাধম মতবাদ পাওয়া যাইতে পারে; এখানে আর সে সমুদয় মতের অবতারণা করিব না। কারণ, উপনিষদের কথা বলিতেছি; সুতরাং ব্রহ্মসম্বন্ধে উপনিষদে যেরূপ উপদেশ আছে, কেবল তাহারই আলোচনা করিব। ব্রহ্মই উপনিষদের মুখ্য বিষয় নিজস্ব সম্পত্তি; সুতরাং অভিমত ব্রহ্মই এখানে আলোচ্য হওয়া উচিত।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ"

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ।"

"সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।"

ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্য হইতে জানা যায় যে, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎস্বরূপ ছিল। সেই সৎ-পদার্থ ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় এবং সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ।

এখানে যেমন ব্রহ্মকে এক অদ্বিতীয়রূপে বিশেষিত করা হইয়াছে, অন্যত্র আবার তেমনই পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব দুই দুইটি বিশেষভাবেও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা—

'এতদ্বৈ সত্যকাম, পরং চাপরং চ ব্রহ্ম'। হে সত্যকাম, ইহাই সেই পর ও অপর ব্রহ্ম।' 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং চ, মর্ত্ত্যং চামৃতং চ।' অর্থাৎ ব্রহ্মের দুইটি রূপ—একটি মূর্ত্ত,

অপরটী অমূর্ত্ত; একটি মর্ত্ত্য, অপরটি অমৃত; এবং "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরমেব চ।"

অর্থাৎ পর ও অপর ভেদে দুই প্রকার ব্রহ্মকেই জানিতে হইবে, ইত্যাদি।

এই সমুদয় উপনিষদ্বাক্য হইতে ব্রহ্মের দুইটী ভাব অবগত হওয়া যায়,—পর ও অপর; সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, সগুণ ও নির্গুণ; সোপাধিক ও নিরুপাধিক; মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত; মর্ত্ত্য ও অমৃত ইত্যাদি।

একই দীপালোক যেমন বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত কাঁচের ভিতর দিয়া নানাবর্ণবিশিষ্ট দেখায়; অথবা একই রমণীমূর্ত্তি যেমন তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পতি ও পুত্র প্রভৃতি বিভিন্ন-প্রকৃতিক লোকের মানসিক ভাবনার প্রভেদে প্রিয় অপ্রিয় ও উপেক্ষণীয়রূপে প্রকটিত হয়, ব্রহ্মও তেমনি এক অদ্বিতীয় অখণ্ড চিৎস্বরূপ হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন উপাধিযোগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। বাহ্য পদার্থের উপরঞ্জন বশতঃ শুভ্র দর্পণ নানারূপে প্রতিভাত হইলেও, সে যেমন স্বরূপতঃ কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত হয় না, তেমনি ব্রহ্মও নানাবিধ উপাধি-সহযোগে নানাকারে পরিলক্ষিত হইলেও, বুঝিতে হইবে, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্ব্বিকারই থাকেন, সেই সমুদয় আকার নাম-রূপাত্মক উপাধির ধর্ম্ম,উহারা ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না। এইজন্যই আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন—

"ঘনৈরূপেতৈর্বিগতৈর্নভঃ কিম্?"

আকাশে মেঘের উদয়ে বা অপগমে আকাশের কি হয়? কিছুই হয় না; ব্রহ্মের সম্বন্ধেও সেই কথা। নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি নিষেধবোধক শব্দগুলি পরব্রহ্মের, আর সগুণ ও সবিশেষ প্রভৃতি শব্দগুলি অপরব্রহ্মের অভিধায়ক। এখন দেখা যাউক, 'ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ' এ কথার প্রকৃত অর্থ কি।

'ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ' একথার যথার্থ অর্থ এই যে, ব্রহ্মের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহা বুঝিতে বা বুঝাইতে কিংবা মনোমধ্যে ধারণা করিতে হইলে, তাঁহার যেরূপ লক্ষণ, চিহ্ন বা পরিচয় নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয়, বস্তুতঃ ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। কেন পারা যায় না? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে,নাম, রূপ, কর্ম্ম কিংবা গুণই সাধারণতঃ বস্তুবিশেষের পরিচয়-প্রদানক্ষম লক্ষণরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে; কিন্তু সেরূপ পরিচয়-প্রদানোপযোগী নামরূপাদি ধর্ম্ম ব্রহ্মের নাই। নামরূপাদি-বিবর্জ্জিত যে ভাব, তাহাই ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাব; সুতরাং সে ভাব নির্দ্দেশের অযোগ্য—অনির্দ্দেশ্য। নির্ব্বিশেষ নির্গুণ বা নির্ব্বিকল্প প্রভৃতি কথাগুলি একই ভাবের অভিব্যঞ্জক।

আর বিশেষ বিশেষ গুণনামাদি ধর্ম্ম বা বিশেষণযোগে যাহার পরিচয় প্রদান করিতে কিংবা স্বরূপ হৃদয়ে ধারণা করিতে পারা যায়, তাহাই ব্রহ্মের সবিশেষ ভাব; সুতরাং সবিশেষ সগুণ ও সোপাধি প্রভৃতি নামসমূহ একই জাতীয়ভাবের, অভিব্যঞ্জক। অতএব একই বস্তু নির্ব্বিশেষভাবে পরব্রহ্ম, আর সবিশেষ বা

সোপাধিকভাবে অপর ব্রহ্ম নামে অভিহিত হন মাত্র, কিন্তু বস্তুগত্যা উভয়ের মধ্যে স্বল্পমাত্রও প্রভেদ নাই। এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের নিমিত্তই কোন কোন স্থানে একই শ্রুতিতে ব্রহ্মের উক্ত উভয়বিধ ভাবই নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ উভয়বিধ ভাবাপন্ন ব্রহ্ম যদি বাস্তবিকই ভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ হইতেন, তাহা হইলে একই শ্রুতিতে অপর্য্যায়ক্রমে ঐরূপ বিরুদ্ধভাব নির্দ্দেশ করা কখনই সমীচীন হইত না।

ব্রহ্মের উক্ত প্রকার সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভাবের মধ্যে কোনটী সত্য, আর কোনটী অসত্য, কিংবা উভয়ই সত্য, অথবা উভয়ই অসত্য, ইহা নির্দ্ধারণ করিয় বলা বড়ই সমস্যার বিষয়। কারণ, প্রাচীন আচার্য্যগণও এসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ বা একমত হইতে পারেন নাই। কেহ সবিশেষ ভাবের সত্যতা রক্ষা করিতে যাইয়া নির্ব্বিশেষ ভাবের কাল্পনিকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন; কেহ কেহ আবার উভয় ভাব রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য প্রকার পন্থাও অবলম্বন করিয়াছেন।

উপনিষদ্‌বাক্য লইয়া যাহারা বিশেষভাবে আলোচনা ও মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তন্মধ্যে আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের নাম সর্ব্বাদৌ উল্লেখযোগ্য। কারণ, তাঁহারা দুই জন ভিন্ন আর কেহই এত অধিক পরিমাণে উপনিষদের আলোচনা করেন নাই। তন্মধ্যে আচার্য্য শঙ্কর নির্ব্বিশেষ ভাবপ্রকাশক উপনিষদ্‌বাক্যের উপরই সমধিক নির্ভর করিয়াছেন, এবং তদনুসারে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষভাবেরই পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার ও

সংস্থাপন করিয়াছেন, আর সবিশেষ ভাব অপারমার্থিক হইলেও উপাসনার জন্য উহার নিতান্ত আবশ্যকতা স্বীকার ও উপপাদন করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য রামানুজ সে মত সমর্থন করেন নাই বা অনুমোদন করিতেও সম্মত হন নাই; পরন্তু তিনি ব্রহ্মের সগুণ, ভাবই শ্রুতিসম্মত পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অপকৃষ্ট গুণসম্বন্ধরাহিত্য অর্থে নির্গুণবাদের উপপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রামানুজের মতে ব্রহ্ম মঙ্গলময় নিখিল সদ্‌গুণের আলয়। তাঁহাতে রাগদ্বেষাদি অপকৃষ্ট কোন গুণই নাই এইজন্য শ্রুতি তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র; বস্তুতঃ ব্রহ্মে কোন প্রকার গুণ সম্বন্ধ নাই—এরূপ অর্থ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। ঐরূপ অর্থ অভিপ্রেত হইলে শ্রুতি কখনই ব্রহ্মের সগুণত্ব ও সবিশেষভাব প্রতিপাদনে এত বাক্যব্যয় করিতেন না। পক্ষান্তরে ঐরূপ অসত্য উপদেশ প্রদান করায় শ্রুতির প্রতি লোকের শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধার সঞ্চারই সমধিক সম্ভব হইত। অতএব সগুণবাদই শ্রুতির অভিমত পরম সত্য; নির্গুণবাদ নহে।

আচার্য্য শঙ্করের কথা অন্যপ্রকার। তিনি বলেন, অসত্য হইলেও, সগুণবাদ উপেক্ষণীয় নহে; বরং উপাসনার পক্ষে উহা নিতান্ত উপযোগী অত্যাবশ্যক। সগুণ ভিন্ন নির্গুণের যখন উপাসনাই হইতে পারে না, এবং উপাসনা ব্যতীতও যখন চিত্তের স্থিরতা ব নির্ম্মলতা হইতেই পারে না, তখন উপনিষদে ব্রহ্মের সগুণভাব বর্ণনাকরা কখনই নিরর্থক বা উন্মত্ত-প্রলাপ হইতে পারে না।

অধিকন্তু "প্রাপ্তং হি প্রতিষিধ্যতে" অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তি-সম্ভাবনা থাকে, তাহারই নিষেধ করা চলে ; অপ্রাপ্তের নিষেধ উন্মত্ত ভিন্ন কেহ করে না। এই নিয়মানুসারে নিষেধ্য গুণসম্বন্ধে প্রাপ্তির সম্ভাবনা অগ্রে প্রদর্শন করা একান্ত আবশ্যক,নচেৎ নিষেধ করিবে কাহার ? এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি প্রথমতঃ ব্রহ্মের সগুণভাববোধক "সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা" ইত্যাদি বাক্য নির্দ্দেশ করিয়া পরিশেষে "অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘং" "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" "নেতি নেতি" ইত্যাদি বাক্য পূর্ব্বোল্লিখিত গুণসম্বন্ধেরই প্রতিষেধ করিয়াছেন।

আরও এক সম্প্রদায় আছেন, তাহারা বলেন, ব্রহ্মের সবিশেষ নির্ব্বিশেষ উভয় ভাবই সত্য। তিনি স্বরূপতঃ নির্ব্বিশেষ হইয়াও বিচিত্র মায়া-শক্তিযোগে সবিশেষভাব প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য। একই বৃক্ষ যেরূপ বৃক্ষরূপে এক; আবার শাখাপল্লবাদি অবয়বভেদে অনেক; তদ্রূপ ব্রহ্মও স্বরূপতঃ এক,এবং তদবয়বস্থানীয় প্রপঞ্চভেদে অনেক; সুতরাং তিনি একও বটে, অনেকও বটে। এইরূপ আরও বহুতর আচার্য্য আছেন, যাহারা ব্রহ্মের সগুণবাদ ও নির্গুণবাদ লইয়া স্বস্ব রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে বিভিন্নপ্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

উপরে যাহাদের মতবাদ বা অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইল, তাহারা সকলেই শ্রুতিবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী, ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আস্থাবান্, এবং সাধন-সম্পদেও সমধিক বলীয়ান্। অসার প্রভুত্ব বা

প্রতিষ্ঠালাভের প্রত্যাশায় ঐরূপ বিবাদ-সৃষ্টির কল্পনা তাহাদের উপর আরোপকরা সঙ্গত মনে হয় না; কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে যে, তাহাদের মনোগত ধারণা কিরূপছিল, তাহা তাহারাই জানেন। এখন কেবল তাহাদের সিদ্ধান্তগত পার্থক্যদর্শনে মনে করিতে পারাযায় যে, তাহারা সকলেই লোকহিতৈষণা প্রযুক্ত—

"দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়-বশানুগা"

এই চিরন্তন শিষ্টাচার-পদ্ধতিরই সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়াছেন। তাহারা দেশ,কাল ও সমাজের তাৎকালিক অবস্থা অনুসারে যখন যেখানে যেরূপ মতবিশেষের উপদেশ ও প্রচার করা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিতেন, তখন সেখানে সেইরূপেই সমুচিত উপদেশ প্রচার করিয়া তাৎকালিক লোকদিগকে ঈশ্বরাভিমুখে অগ্রসর করিতেন; কিন্তু তাঁহারা যে, মনোমধ্যেও ঐ প্রকার বিরুদ্ধ ভাবই পোষণ করিতেন, তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের মনে হয়,যদিও সগুণ নির্গুণ উভয় ভাবেরই সমর্থক প্রচুর পরিমাণে শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণাদির বচন দৃষ্টিগোচর হয় সত্য, তথাপি নির্গুণবাদ যেরূপ বিচারসহ ও শ্রুতির দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সগুণবাদ সেরূপ বিচারসহ বা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ নহে। পরে আমরা এ বিষয়ে স্বতন্ত্র-ভাবে সমালোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, নির্গুণবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও আমাদের ন্যায় অধম অধিকারীর পক্ষে উহা—বালকের ভূগোল-পরিচয়ের মত কেবল কথার কথা মাত্র; উহা অনুভবারূঢ়

করিয়া সেই পথে চলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। অতএব যাহাদের হৃদয়ে সাধনার অভিলাষ আছে, এবং স্বহৃদয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া পরিতুষ্ট ও কৃতার্থ হইতে প্রবল ইচ্ছা আছে, তাহাদের পক্ষে প্রথমতঃ সগুণবাদের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন আর উৎকৃষ্ট কোন পথই নাই। আচার্য্য শঙ্কর—যিনি নির্গুণবাদের প্রবর্ত্তক, ব্যবস্থাপক ও পরমানুরাগী, তিনি নিজেও সগুণভাবে ঈশ্বরচিন্তাকেই উপাসকের পরম কল্যাণকর উত্তম সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অতঃপর আমরা সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াই বক্তব্য শেষ করিব।

[পর ব্রহ্ম]

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, পর ও অপর ভেদে ব্রহ্মের দুইটী ভাব। নাম রূপ ও গুণদ্বারা কিংবা কোনরূপ ক্রিয়া বা বিশেষণ দ্বারা যনি অসংস্পৃষ্ট, সর্ববিশেষরহিত ও স্ব-মহিমপ্রতিষ্ঠ, তিনিই পরব্রহ্ম। গুণরূপাদি কোনও বিশেষ ধর্ম্ম না থাকায় তিনিই নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ও শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। কঠশ্রুতি তাহার স্বরূপ বর্ণনাস্থলে বলিয়াছেন—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্,
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃপরং ধ্রুবম্,
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

তিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধরহিত, অনাদি অনন্ত কূটস্থ নিত্য; সুতরাং চক্ষুঃকর্ণাদি কোন ইন্দ্রিয় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। সেই কারণেই—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

বাক্য ও মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আইসে।

"নৈব বাচা ন মনসা দ্রষ্টুং শক্যং ন চক্ষুষা।"

তাঁহাকে বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায় না, এবং মনের দ্বারাও ধারণা করিতে পারা যায় না।

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।"

অর্থাৎ যেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য বা মনও যায় না।

এই কারণে ব্রহ্মকে অদৃশ্য, অনিরুক্ত, অবাচ্য ও অনির্দ্দেশ্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—

"এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তে" ইত্যাদি।

কঠোপনিষদ্ একথাটী আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।"

পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই কারণে তাহারা বাহ্য বিষয়ই দেখে, কিন্তু অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না।

কেবল ইহাই নহে; তিনি—
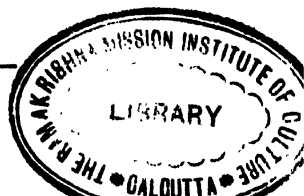
"অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘম্।

স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব বা দীর্ঘও নহেন।

"তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্।"

সেই ব্রহ্ম পূর্ব্ব, পর ও অন্তর বাহির রহিত। অথচ—

"স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-

মস্নাবিরংশুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।"

তিনি সর্ব্বব্যাপী, শুভ্র, স্থূল সূক্ষ্ম দেহরহিত এবং মল ও পাপবর্জ্জিত।

শ্রুতি কিন্তু এত বলিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই; পাছে কেহ মনে করে যে, যে সকল ধর্ম্ম শ্রুতিতে প্রতিষিদ্ধ হয় নাই, ব্রহ্মে সম্ভবতঃ সেই সমুদয় বিশেষ ধর্ম্ম থাকিলেও থাকিতে পারে। সেই সম্ভাবনাপরিহারার্থ শ্রুতি নিজেই সর্ব্বনিষেধের অবধিভূত ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া কেবল "নেতি নেতি" ও "অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে" ইত্যাদি কতিপয় 'নঞ্' ঘটিত বাক্য দ্বারা ব্রহ্মে সর্ব্বপ্রকার বিশেষণসম্বন্ধ বা বিশেষ-ধর্ম্মযোগ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; এবং এই জন্যই যে, ব্রহ্মকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারা যায় না, ও ব্রহ্মেতে হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি সম্ভাবিত হয় না, তাহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই প্রকার নিষেধমুখে যে, বস্তু-নির্দ্দেশ, ইহাকেই শাস্ত্রে 'অতদ্ব্যাবৃত্তি' বলে। যেমন পুষ্পদন্তকৃত শিব-মহিম্নঃস্তোত্রে কথিত হইয়াছে—

"অতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি" ইতি।

এই প্রকার নিষেধের ঘটা দেখিয়া যাহারা সর্ব্বশূন্যভাব আশঙ্কা করিয়া আকুল হন, তাহাদের শান্তির জন্য মহামতি বিদ্যারণ্য স্বামী বলিয়াছেন—

"যন্ন কিঞ্চিৎ তদেব তৎ।"

তোমরা যাহাকে কিছু বলিয়া ধরিতে পারিতেছ না, প্রকৃত পক্ষে তাহাই ত পরব্রহ্ম।

মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ এ কথাটী আরও বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। ব্রহ্ম কেমন? না—

"নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং, ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং, অদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যং, অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণমচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্, একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমম্, শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে, স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ঃ।"

অর্থাৎ যাহার প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান বহির্মুখ বা অন্তর্মুখ নহে, উভয়মুখও নহে; যিনি প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ বা অপ্রজ্ঞও নহেন। যিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, সুতরাং চিন্তার অবিষয়ীভূত ও অনির্দ্দেশ্য; অথচ আত্মপ্রত্যয়মাত্রগম্য, প্রপঞ্চোপশম (নিরুপাধি), শান্ত শিব অদ্বিতীয় চতুর্থ (তুরীয়,) তাহাই আত্মা, তাহাকে জানিতে হইবে।'

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ॥"

পরব্রহ্মকে বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলে, বিধিমুখে বুঝান যায় না,—

"তদেতদিতি নির্দ্দেষ্টুং গুরুণাপি ন শক্যতে॥"

অতএব নিষেধমুখেই তাঁহাকে বুঝিতে ও বুঝাইতে হয়।

তাহাকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে মন। কিন্তু ক্ষুদ্র মন সেই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না।

মন কেবল সেই ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানমাত্র নিবৃত্তি করিয়া ব্রহ্ম-দর্শনের অন্তরায় অপনয়ন করে মাত্র; স্বয়ং প্রকাশমান ব্রহ্মকে আর প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় না। তিনি নিজেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

[অপর ব্রহ্ম]

উপরে যে পরব্রহ্মের কথা বলা হইল, তাঁহার একটী কার্য্যকরী শক্তি আছে। সেই শক্তির নাম মায়া, প্রকৃতি, অব্যক্ত অবিদ্যা ও অজ্ঞান ইত্যাদি (১)। সেই মায়া-শক্তি সংযোগে পরব্রহ্মই অপর ব্রহ্ম ও ঈশ্বরাদি নামে পরিচিত হন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে—

(১) ঋষিগণ মায়াপর্য্যায়ে নিম্নলিখিত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন—

"ব্রাহ্মীতি বিদ্যাবিদ্যেতি মায়েতি চ তথাপরে।
প্রকৃতিশ্চ পরা চেতি বদন্তি পরমর্ষয়ঃ॥"

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্।"

আকাশে উদ্ভূত মেঘ যেরূপ অখণ্ড আকাশেরও খণ্ডভাব আনয়ন করে, তদ্রূপ উক্ত মায়াশক্তিও অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নতা কল্পনা করে। বলা অনাবশ্যক যে, এই পরিচ্ছিন্নতা জগতের তুলনায় নহে ব্রহ্মের তুলনায়। কারণ, স্বয়ং শ্রুতিই বলিয়াছেন—

"এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তি স্বয়ংপ্রভঃ॥"

এই মায়া প্রতিবিম্ব অথবা মায়ার অধীশ্বর ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম বা অপর ব্রহ্ম।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—

ইত্যাদি শ্রুতি, এবং "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রও এই মায়াধীশ্বর পরমেশ্বরেরই স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছে। জগতের কারণরূপে ইহাকেই অনুসন্ধান করিতে উপদেশ করা হইয়াছে। যোগদর্শনোক্ত ঈশ্বরও এই অপর ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। উক্ত মায়ার অবস্থাভেদে এই চৈতন্য হইতেই কার্য্য-ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডাদির বিস্তার হইয়া থাকে।

জীব ইহাঁকে আরাধনা করিলে বা মনন করিলে তাঁহার অধীন মায়াপাশ-ছিন্ন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে। তনি উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্নিবেশিতে।
যোগী মায়াম্, অমেয়ায় তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ॥"
ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি॥

উপসংহার।

এখন উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বিভিন্ন প্রস্থানে বিভক্ত সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত সমস্ত হিন্দুধর্ম্ম যে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচারে ও সংসাধনে প্রবৃত্ত; বেদ বা উপনিষদ্ শাস্ত্রই তাহার আকর বা প্রসবভূমি। উক্ত উপনিষদ্ শাস্ত্র যে, কেবল ব্রহ্ম, জীব, জগৎ প্রভৃতি চেতনাচেতনবিভাগ ও বন্ধমোক্ষ প্রভৃতি অধ্যাত্মতত্ত্ব নিরূপণেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে। পরন্তু জীবগণের ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনে এবং ধর্ম্ম ও নীতি বিজ্ঞান বিষয়েও বহু উপাদেয় উপদেশ করিয়াছেন। ভোগপ্রবণ মানবগণ যাহাতে পদেপদে সংযম-ধ্বংসকারী উন্মাদনাকর মোহময় সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াও আত্মসংযম সাধিতে এবং প্রবল প্রলোভনের মধ্যে বাস করিয়াও তৃষ্ণা-রাক্ষসীর ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে সমর্থ হয়, তাহার উপযুক্ত উপায় ও উপদেশ-পদ্ধতি অতিউত্তমরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ মানবগণ যাহাতে শারীরিক ও মানসিক বলে বলীয়ান্ হইয়া জগতে আদর্শ জীবন লাভ করিতে সমর্থ হয়, সে জন্যও সদাচার ও উদার নিয়মনিষ্ঠার সুব্যবস্থা-করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। আমাদের কথার সত্যতা প্রদর্শনের জন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ হইতে কয়েকটী উপদেশবাণী উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিবেন যে,

সংসারে প্রবেশার্থী বা সংসারী লোকের পক্ষে তদপেক্ষা আর উত্তম উপদেশ হইতে পারে না। সেই উপদেশাবলী এইরূপ—

"বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি—সত্যং বদ; ধর্ম্মং চর; স্বাধ্যায়াৎ মা প্রমদঃ; আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যম্; ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্; কুশলাৎ ন প্রমদিতব্যম্; স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্; দেব-পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্; মাতৃদেবো ভব; পিতৃদেবো ভব; আচার্য্যদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি; নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি, তানি ত্বয়োপাস্যানি। যে কেচাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ, তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্; শ্রিয়া দেয়ম্; হ্রিয়া দেয়ম্; ভিয়া দেয়ম্; সংবিদা দেয়ম্" ইত্যাদি। (১।১।১০)

মর্ম্মানুবাদ—গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমনাভিলাষী শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের উপদেশ—

তুমি সত্যবাদী হইবে; ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর থাকিবে, বেদাধ্যয়নে অমনোযোগী হইবে না; এবং গুরুদক্ষিণার জন্য আচার্য্যকে (অধ্যাপককে) প্রিয় ধন উপহার প্রদানপূর্ব্বক বংশরক্ষার জন্য দারপরিগ্রহ করিবে। সত্য প্রতিপালনে প্রমত্ত হইবে না; ধর্ম্মানুষ্ঠানে অমনোযোগী হইবে না। সৎকর্ম্মে প্রমাদগ্রস্ত হইবে

না; ভূতিসম্পাদনে মনোযোগরহিত হইবে না; বেদপাঠ ও তাহার প্রচারকার্য্যে প্রমাদযুক্ত হইবে না, এবং দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে অবহেলা করিবে না। মাতাকে দেবতা জ্ঞান করিবে; পিতাকে দেবতা জ্ঞান করিবে, এবং আচার্য্য ও অতিথিকে দেবতাবৎ পূজা করিবে। যে সমুদয় কর্ম্ম অনিন্দিত, কেবল সেই সমদয় কর্ম্মই করিবে, কিন্তু নিন্দিত কর্ম্ম করিবে না; এবং আমাদের যে সমুদয় আচরণ(ব্যবহার) নির্দ্দোষ, কেবল সে সমুদয়েরই অনুকরণ করিবে, নিন্দিত আচরণের নহে। আমাদের মধ্যে যে সকল ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সম্মানপ্রদর্শন করিয়া তবে নিঃশ্বাস ছাড়িবে। শ্রদ্ধাসহকারে দান করিবে, অশ্রদ্ধায় দান করিবে না। সম্পদনুযায়ী দান করিবে; লজ্জার সহিত দান করিবে; ভয়ে ভয়ে দান করিবে, অর্থাৎ দান করিয়া গর্ব্বিত হইবে না, কিংবা কাহাকেও তাহা বলিবে না; এবং যাহাই দান কর, প্রণয়পূর্ব্বক দান করিবে, ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য যে, উল্লিখিত উপদেশাবলী যে, জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল দেশের সকল সমাজের, বিশেষতঃ গার্হস্থ্য জীবনের পক্ষে পরম কল্যাণকর ও শান্তি-পথের প্রদীপ, তদ্বিষয়ে কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যে দেশে বা যে সমাজে এবম্বিধ অমূল্য উপদেশ-রত্নের আদানপ্রদানের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে, বুঝিতে হইবে, সে দেশ বা সে সমাজ অধঃপতিত হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, নিতান্ত দুর্গত হইলেও সমধিক গৌরবান্বিত এবং দুঃখবহুল হইলেও শান্তি-সুধাস্বাদে পরিতৃপ্ত।

প্রাচীন ভারত এই ঔপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যার একনিষ্ঠ সেবায় প্রভাবেই জগতে আদর্শ পদবী লাভ করিয়াছিল; ধর্ম্মজগতে সংযমের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল, এবং পরম পুরুষার্থ লাভেও সমর্থ হইয়াছিল, আজ আমরাও যদি সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে মনোনিবেশ করিতে পারি, এবং তাহারই সাধনায় জীবনাতিপাত করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়, আমরাও পরমেশ্বরের কৃপায় চিরদিনের জন্য এই জীবন ব্রতের উদ্‌যাপনপূর্ব্বক ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া শান্তিসুধাস্বাদে পরিতৃপ্ত হইব। ইতি—

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।